॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

রবীন্দ্রোত্তর পর্ব : আধুনিক গীতিকাব্য

'কবিতা,' কবির আন্তরিক অনুভূতির রূপ। যুগমানস সেখানে চিত্রকল্পে প্রতিবিম্বিত। 'প্রথম ও দ্বিতীয়—' এই দুই বিস্ময়কর মহা সমরের কালসীমায় ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে আধুনিক কবিতা আপন গতি পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট। ইউরোপ, আমেরিকা এবং আমাদের দেশে অনিবার্য সামাজিক রূপান্তরের কারণগুলো স্বাভাবিক পথ বেয়েই সাহিত্য মানসিকতার অগ্রগমনকে ত্বরান্বিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে অনেকেই পারেননি। তবু এঁদের ভাবনা এবং বাস্তবনিষ্ঠ কর্মোদ্যোগ জন-মনকে নানা দিক থেকে স্পর্শ করেছিল। আলোচনার সুবিধার জন্য সৃষ্টি প্রয়াসী সেই কবিকুলের মধ্যে অবশ্য স্মরণীয় কয়েকজনের রচনা দুটি পর্বে সাজিয়ে উপস্থাপিত করছি :

॥ এক ॥ গৌণকবিরদল

ক) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (ইং জন্ম ১৮৮২—মৃত্যু ১৯২২)
খ) যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (ইং ,, ১৮৮৭—,, ১৯৫৪)
গ) জীবনানন্দ দাশ (ইং ,, ১৮৯৯—,, ১৯৫৪)
ঘ) অমিয় চক্রবর্ত্তী (ইং ,, ১৯০১—,, ১৯৮৬)
ঙ) বিষ্ণু দে (ইং ,, ১৯০৯—,, ১৯৮২)

॥ এক ॥ সাধারণ মানব দরদ থেকে এঁদের কাব্যে জনগণের ব্যথা বেদনার সুর সাময়িক ভাবে এসেছে। সেইহেতু তাঁরা গণদরদী কবি। জনতার কবি না হয়েও তাঁরা গণজীবনকে ভুলে থাকেননি। তারই অল্প-বিস্তর দৃষ্টান্ত তাঁদের কবিতায় উজ্জ্বল।

॥ দুই ॥ মুখ্য কবির দল

ক) নজরুল ইসলাম (ইং জন্ম ১৮৯৯ — মৃত্যু ১৯৭৬)
খ) প্রেমেন্দ্র মিত্র (ইং ,, ১৯০৪ — ,, ----)
গ) সমর সেন (ইং ,, ১৯১৬ — ,, ১৯৮৭)
ঘ) সুভাষ মুখোপাধ্যায় (ইং ,, ১৯২০ — ,, ——)
ঙ) বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ইং ,, ১৯২০ — ,, ১৯৮৫)
চ) সোমেন চন্দ (ইং ,, ১৯২০ — ,, ১৯৪২)
ছ) সুকান্ত ভট্টাচার্য (ইং ,, ১৯২৬ — ,, ১৯৪৭)

॥ দুই ॥ এঁরা কান পেতে শুনেছেন গণ-হৃদয়ের হাহাকার, কম-বেশী সামিল হয়েছেন সেই জীবনের, দেখেছেন বিরাট দুর্দশা-ক্লিষ্ট অর্থনৈতিক-সামাজিক চেহারা। এই কারণেই গণজীবনের কবি হবার মতো অজস্র সজ্ঞান মমত্বের প্রকাশ এঁদের কাব্যসত্যকে জীবনসত্যে পৌঁছে দেয়। কেউ কেউ রাজনীতি থেকে দূরে থেকেও অখণ্ড জীবনের সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন তাঁদের রচনায়।

জন্ম সূত্রে প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের বনেদিয়ানা তাঁকে বারংবার চিরাচরিত প্রথা ভাঙতে নিরুৎসাহ করেছে। তবু গণপ্রবাহে মিশবার প্রবল বাসনা তাঁর অন্তর্দেশে তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। লোক সমাজের মানুষ নন বলে কবির স্বীকারোক্তি :

মানুষের অসম্মান দুর্বিষহ দুখে
উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে
ছুটিনি করিতে প্রতিকার—
চিরলগ্ন আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার।
(জয়ধ্বনি : নবজাতক)

এই গণজীবন থেকে দূরে কবির অবস্থান। সেই দূরত্ব ঘুচাবার জন্য যোগ্য কবির আগমনই রবীন্দ্রনাথের কাম্য। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় যে ধর্মান্ধতার ক্লেদ জমে রয়েছে এ সবের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি লোকমানসের গোচর করাই হবে কবি-কর্ম। ঝড়ের ঝাপটার মতো প্রগতির বেগ আগামী দিনে সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টির সার্থক প্রয়াস তাঁদের সাহিত্যে আশাতীত পরিণতি আনবে, এরূপ এক কবিকে রবীন্দ্রনাথ ডাক দিলেন। ' **Humanism**—এর পূর্বতন প্রায় সমস্ত **Ideology**— গুলোই (মতাদর্শগুলো) **spiritual** (ঐশ্বরিক) বা **religious values**—এর (ধর্মীয় মূল্য বোধের) উপরই প্রতিষ্ঠিত।" কারণ তাঁর মানবতাবাদ ঈশ্বরকেন্দ্রিক অর্থাৎ ধর্মীয়

শিবদাস ঘোষ। মার্ক্সবাদ ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন।পৃঃ ৯৮। মে, ১৯৭০ প্রকাশক : সুধীর বসুরায় পথিকৃৎ, ৮৮ বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্র—পরবর্ত্তীকালে মানুষ কেন্দ্রিক মতাদর্শ সামাজিক প্রয়োজনে গড়ে উঠে। কবি তারই ডাক দিয়েছেন

কৃষ্ণাণের জীবনের শরীক যে জন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন
যে আছে মাটির কাছাকাছি - - - - -

(ঐকতান: পত্রপুট (রবীন্দ্র রচনাবলী। ২৬খণ্ড)

সম্ভবত: সুকান্ত সেই জনকুলের প্রতিনিধি-কবি। বামপন্থী আন্দোলনের পথে লোক সাধারণের হিত সাধনের এষণা সুকান্তকে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ করে। ফলে স্বেচ্ছাগৃহীত কর্মের সঙ্গে কবি, কবিতাকেও সজ্ঞানে সাথী করে নেন।

"মুকুন্দরামের সময় থেকে আমাদের এই সুদীর্ঘ চার-শ' বছরের ব্যবধানেও মাটির দাবি অনুমাত্র কমেনি। রবন্দ্রি-যুগের মধ্যে সে-দাবি যে হঠাৎ ভাওয়ালের স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস বা হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল বা দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অথবা 'প্রথমা'-র প্রেমেন্দ্রমিত্র - কিংবা আরো সাম্প্রতিক কালে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি তথাকথিত 'সমাজ - চৈতন্যময়' কবিরাই বিশেষভাবে মেনেছেন —।'১

গণ-প্রেমী সত্যেন্দ্রনাথের সাম্যবাদী চেতনার গভীরে উন্মাদনা ছিল না। তবে নবীন বীর্যের উদ্দামতা, মানসিক বেদনা, তাঁর কাব্যে বৈচিত্রের সমন্বয়ে উল্লেখযোগ্য। অতীন্দ্রিয় স্বপ্নে বিভোর হয়ে কল্প জগতে ভ্রমণের নেশা ক্ষীণ মাত্রায় সত্যেন্দ্রনাথের। বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতার গুণে চিত্র - স্থাপত্য - ধর্মী বিশুদ্ধ ভাবনার প্রতিলিখন তাঁর কাব্য-ধারাকে তাই সত্যের মোহনায় পৌছে দিতে সক্ষম হয়েছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড আকর্ষণ।

১, হরপ্রসাদ মিত্র। কবিতার বিচিত্র কথা। পৃঃ ১৬৩। ২য় সংস্করণ নভেম্বর ১৯৬৪ প্রকাশক: শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ১৫।২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

তবে সমসাময়িক ঘটনার ঘনঘটা তাঁর কাব্যে ভাবের প্লাবন আনলেও কিন্তু স্বদেশ প্রেম, দেশানুবোধের উত্তেজনা ভিন্ন সেখানে স্থির অনুভবের আবেদন সেই পরিমাণে নেই।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে বিপুল সহানুভূতির স্পর্শে উচ্চতর মর্যাদা দিয়েছেন। দুঃখবাদী কবিতায় তার ছায়াপাত ঃ

শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠা আছে বা নাই।

কবি হয়তো মনে করতেন, সর্বজনের দুঃখের হিসেব নিতে সংসার-ভূমিতে নেমে এলেও কবিতার জাত যায় না, কবিতা মরে না। তাই অনুকরণে গা ভাসিয়ে না দিয়ে প্রাণের তাগিদে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আশ্রয়ে দৃষ্টিভঙ্গিকে কঠোর করেছেন। কবিতার রাজ্যে তাঁর জীবনবেদ দুঃখের। জনজীবনের কবি না হয়েও দুঃখের অশান্তরূপ বর্ণনায় দুখী মানুষদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন তিনি।

জীবনানন্দের জীবনযন্ত্রণা রোম্যান্টিকতার পত্র-পুষ্প- কণ্টকের শয্যায়-শায়িত। বাক্যোত্তীর্ণ ক্রন্দন সেখানে ধূসরতার আড়ালে বন্দী। স্বপ্নমেদুর ভাবনাগুলো কখনো সংঘবদ্ধ, কখনো নিঃসঙ্গ শূন্যতায় ভাসমান।

'সুরঞ্জনা'য় তাই সবেগ আকূতি ঃ

'আরো আলো ঃ মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়'।—

কবি বলেছেন তাঁর 'বনলতা সেন কবিতায় ঃ

'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক'—। 'পৃথিবীর পথ হেঁটে হেঁটে' তাঁর জীবনে নেমেছে ক্লান্তি। তবে প্রশ্ন, তিনি প্রেম পেতে, বা বিলাতে যে ক্লান্তিভারে অবসন্ন উপলক্ষ কে ? তারা কোন্ মানুষ? সর্বস্তর থেকে এসে এই মানুষ কবির মনের জগতে জমায়েত। 'লাশ-কাটা ঘরে' যে লোকটি রয়েছে সে-ও বাদ যায়নি তাঁর অন্তর থেকে। আত্ম হননকারীর প্রতি জীবনানন্দের বেদনার গুঞ্জন। ইতিহাস সচেতক কবি আবিষ্কৃত, অনাবিষ্কৃত সব কিছু নিয়েই ভাবেন। তাই তাঁর চোখে ভেসে ওঠে 'মহাপৃথিবীর' সবকিছু। প্রকৃতি যেমন তাঁর দৃষ্টি

এড়ায়নি, বাস্তব মানুষও তেমনি কবি-প্রাণে নিবিড় অনুরাগে রূপবন্ধ।

চোখে দেখা দৃশ্যপুঞ্জ থেকেই কবি অমিয় চক্রবর্ত্তী তাঁর কাব্যের রসদ সংগ্রহ করেছিলেন। প্রজ্ঞানিয়ন্ত্রিত মানসিক গঠন তাঁর চিন্তা ভাবনার রাজ্যটাকে সুস্থতায় সমৃদ্ধ করেছে। **'Humble insects'** অমিয় চক্রবর্ত্তীর আন্তরিকতার স্পর্শে জীবনের গভীর অর্থের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। শ্রেণী বৈষম্য এবং শোষণের মতো নির্মমতাকে তিনি ঘৃণা করেছেন। তাই নিরন্ন মানুষ থেকে কীট পতঙ্গ পর্যন্ত তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে। ব্যক্তি চেতনার জাগরণকে আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন। অন্নার্থীর সমস্যা পৃথিবীর সর্ব-প্রান্তেই সমান। এই আধুনিকতম উপলব্ধি চলতি শব্দ-চিত্র আশ্চর্য সেই মানুষকে চেনায়। তাই তাঁর ন্যায় প্রাণ-প্রিয় কথিই শোনাতে পারেন 'সত্যাগ্রহ' কবিতায় ঃ

বস্তির বস্তিত্ব
ঘুচিয়ে মানুষকে দেওয়া অস্তিত্ব ;

সাধারণের জীবন থেকে ব্যবধান রেখেও বুদ্ধদেব বসু[১] 'মানুষ' কবিতায় আত্মানুরাগে বলে বসেন ঃ

তবু কাব্য রচিলাম ; এই গর্ব বিদ্রোহ আমার।

ব্যক্তি জীবন বিশ্বাসী কবি বলেই বিরাট সামাজিক জীবন—ক্ষেত্রে তাঁর অন্তর্দ্ধান। অধ্যবসায়ী কবি শিথিল-রন্ধ্রে নতুন জগতের কিছু বাঞ্ছনীয় কথা মাত্র বলেছেন। হৃদয় বোধ টুকুই তাঁর কবিতা ধরে ধরে আন্তরিকতার দু'-চারটি ফুল ফুটিয়েছিল ঃ

'প্রতিদিন পিঠে পড়ে জীবিকার হাতুড়ি'
('এক পয়সায় একটি কবিতা/১৯৪১)

কিংবা জীবনের কানে কানে,
কঙ্কালেরা চুপি চুপি কথা কয় ;
(বিরহ ঃ দময়ন্তী)

১, খ্যাত কবি, তবু গণভাবনায় নিঃসম্পর্ক ব'লে বুদ্ধদেব বসুর কবিতার আলাদা করে আলোচনা আমরা পরিহার করলাম। গবেষক।

কিংবা আর
কত বুভুক্ষার
ভাঙ্গা হাড়

(হে কাল : দময়ন্তী)

কিংবা তুমি জেনেছো, মানুষ মাত্রেই অমৃতের পুত্র, শুধু একজন নয়, প্রত্যেকে।

(শীতের প্রার্থনা:বেসন্তের উত্তর)

"বুদ্ধদেববাবু সম্বন্ধে বরঞ্চ এই কথা বলা চলে যে উনি জনৈক অতি-সাবধানী ক্রিশ্চান পাদরির মতন পণ করেছেন: **I Will tread the narrow path betwixt vice and virtue.** প্রগতিকে উনি খুব উৎসাহের সঙ্গে বরণ করতে পারেননি কিন্তু প্রতিক্রিয়াকেও উনি কখনো আমল দেননি। এইজন্য বুদ্ধদেব বাবুর কাছে আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমাদের কৃতজ্ঞতার এমন কি শক্তি আছে যে বুদ্ধদেববাবুকে বাংলা সাহিত্যে সম্মানের আসন দিতে পারি? ইতিহাসকে যারা উপেক্ষা করে ইতিহাস তাদের মনে রাখে না।--আরো মনে হলো, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তী সংকীর্ণ পথে বুদ্ধদেব বসুর স্বচ্ছন্দ বিহার বোধ হয় আর বেশিদিন সম্ভব হবে না, তাঁর পদ স্খলন আরম্ভ হয়েছে, অতঃপর বিশেষ সাবধান না হলে নিজেকে সামলানো দায় হবে। কেন না—

হে পশ্চিম, তোমার সভ্যতা
দু'চারি শতাব্দীমাত্র খেলা করে কালের পাঙ্গণে-
হলো দেউলিয়া।

চিন্তা সম্পদে একবারে দেউলিয়া না হলে ভাবী যুগের প্রাক্কালে এই মত নির্দ্বিবাদে ব্যক্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না।"১

বিষ্ণু দে-র পাঠলব্ধ অভিজ্ঞতা এবং জীবন সম্পর্কে সত্যের বোধ তাঁর বিদগ্ধ জ্ঞান- ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিল। ধনতন্ত্রের পেষণ-মুক্ত

১। ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত। মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক-৩ পৃঃ। ২০৪-২০৫ প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৫ এপ্রিল ১৯৭৮ প্রকাশক - গীতা দাস নতুন পরিবেশ প্রকাশনী ৩০, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, ব্লক ঈ, ফ্লাট-১৮-কলি-৫৪।

সমাজ ভাবনা তাঁর কবি-চৈতন্যে। তাই বিপ্লবোত্তর মনুষ্য সমাজ চিন্তা কল্যাণ স্পর্শে মূর্ত। কবিতায় স্বরাট-- তৃষ্ণা তাঁর জীবন বোধে আলুলায়িত। দেশী, বিদেশী সাহিত্য থেকে কবি যে রস পান করছেন তার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন 'ক্রেসিডা'--য় ঃ

'সময়ের থলি শতচ্ছিদ্র বিস্মৃতি--কীট কাটে।'

তাঁর প্রচুর অধ্যয়ন-প্রসূত কবিমন গণ জীবনের দিকে চোখ রাখে। মননশীল কবির 'প্রতিরোধ'- এ সেই সমর্থন ঃ

'তবু জানি এই দধীচির হাড়ে এই ভাঙ্গা হাতিয়ারে
ইতিহাসে আজ পাতা কেটে দেব, লিখব প্রাণের ভাষ্য।'

কষ্ট ভেদ্য শব্দ-শিলায় গড়া তাঁর কবিতার পাষাণ গাত্র, এর গভীরে প্রবেশে বিরাট বাধা। তবু একটু আগ্রহ নিয়ে যদি কবিকে বোঝার চেষ্টা করা যায়, মনে হয় সেই মনোযোগ ব্যর্থ হবে না। তেমন একটি সমাদরনীয় কবিতা '২২শে শ্রাবণ' ঃ

'নেকড়ের হন্যেয় দেশ ছিন্ন ভিন্ন সন্দেহ ও ভয়
কলুষ ছড়ায় দুই হাতে গায় শৃগালে বাহবা!
তবুও আকাশ ছায়, আমাদের মুক্তি উচ্চৈঃশ্রবা
মানুষ দুর্জয়॥,

কবির অভিপ্রায়ের দিকে অগ্রসর হলে কাব্যসাহিত্যের দুর্লভ বস্তু যে সমানুরাগ বা গণমমত্ব, তার অমোঘ প্রকাশ ২২ শে শ্রাবণ'-এ। ধণতন্ত্র বিরোধী মনোভাব 'সন্দ্বীপের চর,' 'পূর্বলেখ'-এ স্পষ্ট।

মুখ্যগণ- কবিরা গতানুগতিক ধারা ভেঙ্গে কাব্যে জনসাধারণকে প্রবেশের ছাড়পত্র দেন। সামাজিক, রাজনৈতিক কৌশলে বন্দী জীবন যে বিপুল বঞ্চনার শিকার, তাদের সেই ক্ষুধাজীর্ণরূপ এঁরা দর্শন করেছেন।

নজরুল গণ-গায়ক কবি। বিপ্লবের আবেগে তাঁর কবি চেতনার কম্পমান, দেশাত্মবোধ এবং মনুষ্য প্রীতিতে উচ্চ কণ্ঠ। তাঁর কাব্য শব্দ আরবি - ফারসী - তুর্কীর তূর্যধ্বনিতে শ্রুতি বিচলিত করেনি বরং তার অনাবিল স্রোতেই নিপীড়িত গণমুখ ভেসে উঠেছে। জনপ্রিয়

কবির চড়াগলার ভাষা সবার পরিচিত। তাই অহিংস সহিংস স্বাধীনতাকামী যুবচিত্ত কবির কাছে পেয়েছে দেশাত্মবোধের প্রেরণা, বিবেকবান মানুষ লাভ করেছে মানবতাবাদ ও সাম্যবাদের দীক্ষা। ছন্দের নিপুণ চালে মনের অভিসন্ধিকে পৌঁছে দিতে পেরেছেন নজরুল, জাত পাতের উর্দ্ধে বসবাসকারী এক শ্রেণীর সত্যাশ্রয়ী মানুষের কাছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিস্ময়ে, আবেগে, কুণ্ঠায়, প্রেমে, আদর্শে, অত্যাচারিত মানুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। কবিতা শক্তিহীন হাতিয়ার নয়। তার গর্জনে শাসকের হৃদকম্প ওঠে, সাম্রাজ্য ভাঙে, সমাজ পাল্টায়।

গণজীবনের এই কবিকুলের রচনায় সমাজের, মানুষের সমাবেশ। এঁরা জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন না থেকে সোজা চলে আসেন সমতার দরজায়। যেখানে প্রতীক্ষমাণ শ্রমার্ত, নিপীড়িত জনগণ। কারো কারো ক্ষেত্রে পালা বদল ঘটেছে, তবে সে পর্ব নিতান্তই নগণ্য। তবে এঁরা প্রায় সবাই সুবোধ্য কাব্য-শব্দের ভক্ত।

তরুণ কবি সোমেন ও সুকান্ত। বয়োবৃদ্ধির আগেই অস্তমিত। এঁরা উভয়েই রাজনীতি এবং সাহিত্যে জুড়ি চেপে, জয়-পরাজয়ের ভাবনা না ভেবে সৃষ্টিসুখে দৌড় দিয়েছেন। মানব দরদ এঁদের উভয়ের কবি-অন্তঃপুরে উৎসারিত। কর্মী ও কবির যুগ্ম প্রতিজ্ঞায় এঁদের শিল্প জীবন্ত। উভয়ের বিদ্রোহ এবং চাওয়ার লক্ষ্য সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা। আত্ম সচেতনার বৈশিষ্ট্যে গনজীবনের মুখ্য প্রেমিকরূপে এঁরা সাহিত্যে চিহ্নিত।

এঁদের সংগ্রামের হাতিয়ার, তীর-ধনুক, বুলেট-বন্দুক নয়। জীবন বোধ আদর্শবোধের সমীকরণে মালিক, মজুতদারের শোষণের বিরুদ্ধে লেখনী-বিদ্রোহ। উভয়ই স্পষ্ট ও ঋজু বক্তব্যকে কবিতা গদ্যে তুলে ধরেন। সোমেন—সুকান্ত বিষাণ-শ্রমিকের কবি, গণজীবনের রূপকার।

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

ক. গৌণ কবি-সংঘ ঃ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ছন্দের শিল্পী সত্যেন্দ্রনাথ। তবু তাঁর কবিতায় বক্তব্যের প্রাধান্যও কিছু কম নয়। বিষয়বস্তু থেকেই কবিকে ভাল করে চেনা যায়। সত্যেন্দ্রনাথের আদর্শ-বাদী মনুষ্যপ্রীতি তাঁর কাব্য ধারায়। সমাজ জীবনের দুষ্ট ক্ষত নিরাময়ের কামনায় তিনি সচেতন। সে পরিচয় রয়েছে 'মহামতি গোখলে' – র * (১৯১৬) উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতায় ঃ

এক · নিরক্ষরের দুঃখ কি যে ভুল্‌ছ কি তা ভুল্‌ছ তবে
সবাই ওদের দাবিয়ে রাখে, নাবিয়ে রাখে অগৌরবে,
ঠকিয়ে ওদের খায় পুরুতে, ডুবিয়ে রাখে কুসংস্কারে
(রাজা ও ভূত ঘাড় ভাঙে হায়, মারী প্রথম ওদের মারে।)
অন্নাভাবে শুকায় ওরা, জমিদারের গোষ্ঠী পুষে
সাত পসরী ধার নিয়ে হায়, শুধতে নারে সাত পুরুষে।
হিসাব কিতাব বুঝতে নারে, মহাজনের মিথ্যা খতে
নিত্য টেরা- সই দিয়ে যে বিকিয়ে গেল, বস্‌ল পথে।

---

* ১৯১০ সালে মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে ভারতবর্ষে অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষা (Free And Compulsory) ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে দেশমধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবার আন্দোলন উপস্থিত করেন। দেশের প্রায় সর্বত্রই উচ্চবর্ণের ধনী হিন্দুরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। গোখলে এই বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাতেও পাশ করাইতে পারেন নাই।

– – দক্ষিন আফ্রিকায় মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী প্রবর্ত্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অবস্থা সরজমিন দেখিবার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও কনগ্রেসের বিশিষ্ট কর্মী (মডারেট বা নরমপন্থী) মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে তথায় যান।

– – গোখলেকে গান্ধী গুরুর ন্যায় ভক্তি করতেন; দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় এই মহামতি নেতাই সর্বপ্রথম স্বচক্ষে বিদেশে ভারতীয়দের দুরবস্থা দেখিবার জন্য গিয়াছিলেন।

ঃ রবীন্দ্র জীবনী (দ্বিতীয়খণ্ড) } ১৩০৮—১৩২৫ ॥ ১৯০১-১৯১৮ প্রথমপ্রকাশ ১৩৪৩
ও } পৃঃ ২৫২' ৩৫৮, ৪০৮
রবীন্দ্র সাহিত্য- প্রবেশক } বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় } ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – কলিকাতা।

আড় কাঠি দ্যায় ওদের চালান, ফাঁড়ি দারেও বেগার ধরে
দাবড়ি – ভোতা ক্যাবলা হাকিম ওদের পরেই জুলুম করে।
এমনি ধারা হাজার জুলুম সইছে যত নিরক্ষর
বেঁচে মরে চোখের জলে ভিজিয়ে মাটি নিরন্তর।'

(গোখলে : অভ্র আবীর)

বিদগ্ধ জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই কবির এ সমপ্রাণতা বোধ। দীনতার চরম লাঞ্ছনা গণজীবনকে তিলে তিলে দগ্ধ করছে। অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে হতভাগ্যদের চৈতন্যলোকে তুলে ধরার আকুলতা ভালবাসারই নামান্তর। জনমন থেকে অশুভ সংস্কার ধুয়ে মুছে যাক, অজ্ঞতার চিতাভস্মের উপর এই সংখ্যা গরিষ্ঠের দল দাঁড়াবার আত্মপ্রত্যয় অর্জন করুক, কবির সেই পবিত্র কামনা ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়। কবির বিশ্বাস :

দুই, জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবিশশী মোদের সাথী।

(জাতির পাঁতি : অভ্র আবীর)

নিরর্থক নয় সত্যেন্দ্রনাথের ভাবনা। তাই তিনি শোনালেন :

তিন, বুদ্ধ, নিমাই, নানক, কবীর
তোরি কাছে মাগে সার্থকতা।
মিলনের সাম তারা অবিরাম
গাহিল যে সে মিথ্যা হবে।

(নবজীবনের গান : বিদায় আরতি /১৯২৪)

দুর্বলকে মর্যাদা দিতে সবল চিরকালই কার্পণ্য করেছে। চাতুর্যের জালে তার উপায় নির্দ্ধারিত। সেই মুখোস ছিঁড়ে দেন নির্ভীক কবি সত্যেন্দ্রনাথ :

চার, (ক) কণ্ঠে বাঁধিয়া ধন সম্পুট, রত্ন মুকুট শিরে
কেহ নাহি আসে গর্ত – নিবাসে, মানবের মন্দিরে।
(খ) আমরা মানি না শিখা, ত্রিপুণ্ড্র, উপবীত, তরবারি
জাব্দা খাতার, ধারি নাক ধার, মোরা শুধু মমতারি।
মাংস পেশীর শাসন মানি না, মানি না শুষ্ক নীতি
নূতন বারতা এসেছে জগতে, মহামিলনের গীতি

(সাম্যসাম : হোমশিখা)

পরিশেষে এই কবিতাতেই গণ মানুষকে পিট সোজা করে দাঁড়াবার ডাক দিলেন কবি :

পাঁচ, জানু পাতি কেন রয়েছে নীরবে অবনত করি মাথা ?
কারা কাঁধে পিঠে উঠিয়া তোমার, তোমারে দিতেছে ব্যথা।

কারণ এদের চিনে রাখতে না পারলে নিজেদের প্রাপ্য থেকে চিরদিন বঞ্চিত হতে হবে। কবির নির্ভুল বিশ্বাসের কথা নিম্নাংশে প্রতিধ্বনিময় :

ছয়, বংশে বংশে নাহিক তফাৎ
বনেদী কে আর গরু—বনেদী
দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ
দুনিয়া সবারই জন্ম – বেদী।
(সেবাসাম : বিদায় আরতি)

গণজীবনের প্রতি গভীর দরদ এখানে উচ্ছসিত। সঙ্কীর্ণতার বাঁধ ভেঙে দিয়েছে সেই প্রবলাঘাত। মরমী কবি কৃত্রিম জাতি ভেদ প্রথারমূলে কুঠার বসিয়েই মাত্র ক্ষান্ত হননি তাঁর সুপ্ত বাসনার জাগরণ ঘটে এইখানে :

সাত, এক মার কোলে বসি কুতূহলে
মোরা দোঁহে দিন যাপি।
মিলন – সাধন করিছে মোদের
বিশ্বদেবের আঁখি।
(কুলশিনি : কুহু ও কেকা)

সমাজের চোখে ঘৃন্য নারী এবং কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার জন্য ও কবি-মন বিচলিত। তার দৃষ্টান্ত :

আট, কুলটাদের মূল্য আছে, ফুল বালার মূল্য নাই।
কন্যা ঘরের আবর্জনা। পয়সা দিয়ে ফেলতে হয়।
(মৃত্যু-স্বয়ম্বর : অভ্র-আবীর)

সমাজকে টুকরো করায়, সমাজ বেত্তাদের উপর কবির রোষ বর্ষিত :

নয়' সমাজেরে তুমি ভাগতো করনি
করেছ ব্যবচ্ছেদ
যোগের সূত্রে কাটিয়া দিয়াছ
গড়িয়াছ জাতি ভেদ।
(পরেরা : তুলির লিখন)

সমাজ সচেতনতা থেকে সত্যেন্দ্রনাথের দেশপ্রেম। তাঁর বিশ্বাস, যেখানে মানুষের বৃহত্তম অংশ উপেক্ষিত সেখানে মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু। ব্যষ্টির স্বার্থ মগ্নতা কবি প্রাণে বেদনাঘাত করায় তিনি সমষ্টির জন্য ব্যাকুল। বাস্তব সত্যকে অস্বীকারের সাধ্য কারো নেই বলেই অপরের জন্য কবির বেশী অধীরতা :

দশ, পঙ্কে আছি নাবতে রাজী
মনের চাবি খুলতে।
দোষ যদি হায় ঢুকেই থাকে
মজিয়ে থাকে মগজটাকে
মানুষ তবু মানুষ, ওগো
পারব না তা, ভুলতে।
(নষ্টোদ্ধার : কুহু ও কেকা)

তবু সত্যেন্দ্রনাথ গণজীবনের যথার্থ কবি নন। কারণ এই গণদরদ এসেছে সাধারণ মানব দরদ থেকে। আর এই দরদ তৈরী হয়েছে তিল তিল করে সমাজ বক্ষ থেকে। প্রসঙ্গত সত্যেন্দ্রনাথের মানসিক গঠনের কালের কথা স্মরণ করতে হয়। সেই পর্বে দৃষ্টিপাত করলে জানা যায়, দেশ জুড়ে যখন নব জাগরণ কলকাতার মধ্যবিন্দুতে এসে উপস্থিত, তখন সেই উত্তাল পরিধি-গর্ভে সত্যেন্দ্রনাথের কৈশোর উত্তীর্ণ। স্বভাবতই নবজাগরণ এবং দেশের স্বার্থে নানাবিধ আন্দোলন যখন সমুত্থিত, সেই ধারায় সত্যেন্দ্রনাথের কবি মানস পরিণতিতে পৌঁছয়। সেই তথ্য সন্ধানের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রভৃতি বিশিষ্ট ঘটনাপুঞ্জের দিকে চোখ ফেরাতে হয়। কেন না সেই পরিবেশ কবিচিত্তের পরিণতির কারক।

"১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় 'ব্রিটিশইণ্ডিয়ান-অ্যাসোসিয়েশনে'-র সভাগৃহে 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' এর দ্বিতীয় অধিবেশনে বাংলা এবং বহিরাঞ্চলের নানা প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম অধিবেশন হয়েছিল ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর (২৮, ২৯, ৩০-এ ডিসেম্বর)- কলকাতার 'অ্যালবার্ট'-হলে। সেবার প্রথম দিনের অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেছিলেন রামতনু লাহিড়ী,-সভায় উৎসাহী কর্মীদের মধ্যে ছিলেন চন্দ্রমাধব ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পিতৃব্য কলকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী কালীমোহন দাশ, ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মাতামহ ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর ইত্যাদি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। ১৮৮৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এই 'কনফারেন্স' – এর দ্বিতীয় আনুষ্ঠানিক অধিবেশন সম্পন্ন করার সমকালেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পত্তন হয়। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হলেন ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জি। প্রথম অধিবেশন হয়েছিল বোম্বাইয়ে। ১৮৮৬ সালে দ্বিতীয় অধিবেশন হলো কলকাতায়।

.....১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে রমাবাঈ রাণাডে (মাধব গোবিন্দ রাণাডের পত্নী), পণ্ডিতা রমাবাঈ, বিদ্যাগৌরী নীলকণ্ঠ, শ্রীমতী নিকম্ব, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এবং স্বর্ণকুমারী ঘোষাল, এই ছয়জন মহিলা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এবং কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকারের দাবী বাস্তবভাবে স্বীকার করে নেওয়া হল।

.....সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় ১৮৮৯, ১৮৯৬ এবং ১৯০১ যথাক্রমে এই তিন সালের তিনটি অধিবেশনের স্মৃতি যে নিখুঁতভাবে সঞ্চিত আছে তা নয়। সরাসরি কংগ্রেস – সভার উল্লেখ 'বেনুবীণা' অথবা তৎপূর্বে 'সবিতায় খ নেই। কিন্তু ১৮৮৯ সালের সভায় নারীর রাষ্ট্রীয় অধীকারের স্বীকৃতি, ১৮৯৬ সালের কংগ্রেসের স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী এবং ১৯০১ এর অধিবেশনে 'সরলাদেবী'-র জাতীয় সংগীত এই তিন ঘটনার বিশেষ প্রভাবের পৃথক পৃথক দৃষ্টান্ত হিসেবে উদ্ধৃত হতে পারে এমন অংশ তাঁর নানা কবিতা থেকে খুঁজে পাওয়া গেছে...১৮৮৯, ১৮৯৬, ১৯০১ সালের ঘটনাবলী সত্যেন্দ্রনাথের কবিমানসকে অনুমাত্র স্পর্শই করেনি, এমন ভাবনা ও বৃথা কল্পনা।" ১

এ ছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথের কবিমানস গঠনে তৎকালীন আরও কিছু ঘটনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়ঃ

"১৯০৮ – ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতির নির্মমতা বাংলার জনময় রাজধানী থেকে বহু দূরবর্ত্তী প্রত্যন্ত অঞ্চলের পল্লীসীমা অবধি ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯০৮ সালের মধ্যে 'নবশক্তি' যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম, বামপন্থী চারখানি বাগজই সরকারের রোষদৃষ্টির জ্বালায় বহুবা নির্যাতিত হয়ে অবশেষে উঠে গেল। নেতারা নানা ভাবে নিপীড়ন ভোগ করলেন। এই দেশব্যাপী যন্ত্রণা উদ্দীপনা, চাঞ্চল্যের মধ্যে ১৯০৯ সালের 'মে' মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে হিন্দু--

---

১, হরপ্রসাদ মিত্র। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ। ১ম প্রকাশ মাঘ ১৩৬১ প্রকাশক ও মুদ্রাকরঃ শ্রীজ্যোতিভূষণ বিশ্বাস, ইষ্ট এণ্ড কোম্পানী, ৫২, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট কলিকাতা – ৯ পৃঃ ৫৪ – ৫৬

ক, ১৯০৬ সন খ, ১৯০০ সন, গ, স্বর্ণকুমারী দেবীর দ্বিতীয়া কন্যা।

মুসলমানের পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি সমেত ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ আইন বিধিবদ্ধ হলো।

এই ঘটনার মাস দুয়েক পরে খাস বিলেতের মাটিতে ভারতীয় সন্ত্রাসবাদের আর একটা নমুনা দেখা গেল।

— — শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে বহু সমৃদ্ধ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দেশের এই বিপুল আলোড়নের প্রত্যেকটি তরঙ্গ প্রতিটি আবর্ত লক্ষ্য করেছেন। রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের কলরোল, কর্মঝঞ্ঝা, কর্তব্যাকর্তব্য, যুদ্ধমুখিতা তাঁকে নানাভাবে স্পর্শ করেছে। কিন্তু তাঁর মজ্জায় ছিল শান্ত নিরীক্ষার বৈশিষ্ট্য। দেশে যখন সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়েছে, বিদেশি কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব যখন ব্যাপক অনুষ্ঠানের দীপ্তি বিস্তার করেছে, তখন রবীন্দ্রনাথের শিষ্য সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ছন্দ-লীলায় আপাত পলায়নী কৌশলের মধ্যে ডঙ্কা নির্বাসন নিয়েছিলেন মনে করা অসম্ভব নয়।"[1]

স্বাভাবিক মানবভাবের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের অন্যান্য শ্রেণীর [illegible] গভীর প্রেমের জাগরণ। ভাবোচ্ছ্বাস নেই, বিদ্রোহের সুর নেই, শুধু মাত্র সুস্থ মঙ্গল কামনা অতি সাধারণের জন্য সহজভাবেই উচ্চারিত। যুক্তি-বদ্ধ শব্দ গুচ্ছ প্রেরণায় সঞ্চারিত শুধু নয়, এক মহান আদর্শে দীপ্যমান :

এগারো, ক) স্বপর নাহিক কিছু স্নেহের মানবে ;
হে বন্ধু! তুমিই একা - জেনেছ সে বাণী।

খ) এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিত্তে -
কল্যাণের কর্ম করি লাঞ্ছনা সহিতে।

(মেথর : কাব্য সঞ্চয়ন)

অথবা

বারো শূদ্র মহান্ গুরু গরীয়ান্,
শূদ্র অতুল এ তিন লোকে,
শূদ্রে রেখেছে সংসার, ওগো!
শূদ্রে দেখো না বক্র চোখে।

(শূদ্র : ঐ)

মানবাত্মার অপমান সত্যেন্দ্রনাথের বিবেক দংশন করে। তাঁর শুদ্ধ চেতনায় বর্ণ-ভেদের স্থান নেই। তিনি মনে করেন সমাজ জীবনকে বন্ধুর মুক্ত রাখতে

১, হরপ্রসাদ মিত্র। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ। পৃ: ৬৭ - ৭০ ১ম প্রকাশ মাঘ১৩৬১ প্রকাশক ও মুদ্রাকর : শ্রীজ্যোতিভূষণ বিশ্বাস, ইষ্ট এণ্ড কোম্পানী, ৫২, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট কলিকাতা - ৯

যারা অক্লান্ত, তাদের ঘৃণা করার মতো অন্যায়, পাপ আর কি থাকতে পারে৷ যারা সর্বজনের জীবনরক্ষায় ব্রতী, প্রতিদানে ভালবাসা দিয়ে তাদের অন্তর জয় করা দরকার। সমাজের কাছে পাওনা তাদের অনেক, সে ঋণ অপরিশোধ্য। কবির এই উপলব্ধি থেকে উদ্ভূত গণ-প্রীতি।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় স্বদেশ প্রেম ও মনুষ্যপ্রেম একত্রে মিশে তাঁকে উত্তর জীবনে জনপ্রিয় করেছিল। তাঁর 'বেণুবীণা'য় ধর্মঘট, অন্ধশিশু, সন্ধিক্ষণ নাভাজীর স্বপ্ন, বিকলাঙ্গী প্রভৃতি কবিতায় নিখাদ সমপ্রাণতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। 'হোমশিখা'তেও ঐরূপ মমতার স্পর্শ রয়েছে। রয়েছে বিশ্বমানবে বিলীন হবার আকাঙ্ক্ষা। 'কুহু ও কেকা'-য় স্বজাতি প্রীতি ও দেশাত্মবোধ পরিস্ফুট। 'অভ্র-আবীর'-এ তারই বাস্তব বোধজাত তাড়না।

'বেণুবীণার বেদনার মধ্য দিয়ে অপরিণত কবি-মনের যে সাক্ষাৎ ঘটে, নিঃসন্দেহে তা মানব প্রেমিক কবির কথাই স্মরণ করায়:

যেন, বাতাসে যে ব্যথা যেতেছিল ভেসে ভেসে
যে বেদনা ছিল বনেরি বুকেরি মাঝে,
লুকানো যা ছিল অগাধ অতল দেশে
তারে ভাষা দিতে বেণু সে ফুকারি বাজে।
মূকের স্বপন মুখর করিতে চায়
ভিখারী আতুরে দিতে চায় ভালবাসা;
পুলক প্লাবনে পরাণ ভাসাবে, হায়,
এমনি কামনা—এতখানি তার আশা।

.........পিতামহের থেকে জিত, সঞ্চিত বিত্তবল এবং পিতৃকুলের সংস্কৃতির দৃঢ়ভিত্তি এই উভয় সম্পদের অনুকূল প্রভাবে লালিত হয়ে নিরাপদ শান্ত নাগরিক জীবনের নিশ্চিন্ত সমতলবাসী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত উৎসাহী পর্যটকের প্রাণ নিয়ে, আশা নিয়ে বিশ্বের কাব্যলোকে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। জীবনের গূঢ়, অনির্বচনীয়, প্রবল আনন্দ বেদনা সংশয়ের তাড়নায় তিনি কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন।[১]

প্রবাসী ভারতবাসীর সম্বন্ধেও সত্যেন্দ্রনাথের সমান ভাবনা এবং ভালবাসা। গান্ধীজীর নেতৃত্বে দক্ষিণ-আফ্রিকায় শাসকের নির্দয়তার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন, তাতে কবির পূর্ণ সমর্থন:

১। হরপ্রসাদ মিত্র। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ। পৃঃ ১১৬/দ্রষ্টব্য

চোদ্দ, অমনি গেল সুরু হয়ে নূতন নূতন আইনজারি—
ভারতবাসী কৃষ্ণ অতি, ভারতবাসী দুষ্ট ভারী,
অসাব্যস্ত বিবাহ তার, পত্নী তাহার পত্নী নয়
কারণ বহুনারীর ভর্তা দুশ্চরিত্র সুনিশ্চয়।
খনির তলে ঘাটুক কুলি, অবসরে চিবোক চানা
কিন্তু কুলির আফ্রিকাতে কন্যা জায়া আনতে মানা।
ইজ্জতে হাত পড়লে জাতির 'জ্যোৎ' বেচে সে রাখতে হবে—
সাহায্য দাও সাহায্য দাও সাহায্য আজ দাওগো সবে।"

(ইজ্জতের জন্য : অভ্র-আবীর)

এই অকৃত্রিম আন্তরিকতা সবার মনোহরণ করে। সেটুকুই উপরি পাওনা। সেই কারণে এই সত্যকে ও মেনে নিতে হয় যে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে স্বদেশ প্রীতিবস্তু ও তথ্যে বিধৃত। শ্রমজীবীদের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা তাঁকে দূরে থাকতে দেয়নি। তাদের মনের সংবাদ তিনি রাখতেন। সূক্ষ্ম অন্তর্বেদনা থেকেই তাঁর অনুভবের প্রকাশ :

পনেরো, রুখো শুখো কাঠে ফুল যে ফোটাই
বাটালির ঘায়ে বশ করি
কর্নিক, ছেনি, হাতুড়ি চালাই
তুরপুন মাকু বাঁশ ধরি।

(রাজা কারিগর : কাব্যসঞ্চয়ন)

'রাদলরাম' গাড়োয়ান দারিদ্র্যে পিষ্ট। সমাজে অতি সাধারণ মানুষের জন্য ধনীর ভাবনা নেই। শোষণ করাই যাদের উদ্দেশ্য তাদের শাসন থেকে এরা মুক্তি পাবে কি করে? অভয়বানী উচ্চারণ করে কবি সমবেদনার সঙ্গে তাদের মূল্য সম্বন্ধে সর্তক করে দেন :

ষোলো, ধনীর ধনের উপরে যে
পরিশ্রমের আছে, মান—
যদিও এটা নাই সে জানে
নয় সে তবু ক্ষুদ্র প্রাণ।

(ধর্মঘট : বেনুওবীণা)

গণ-প্রেমিক কবির আত্মবিশ্বাস 'বেনে, চাষী, জেলে, ময়রার ছেলে,/তামুলী, বারুই কেউ উপেক্ষার নয় কারণ মানুষে মানুষে প্রকৃতই কোন পার্থক্য নেই। জীবন সম্পর্কে এই গভীর বোধ মস্তিষ্ক চালনার মধ্য দিয়ে জন-প্রাণকে ছুঁয়েছে। তিনি প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা নিঙড়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, সমাজে বৈষম্য যতদিন থাকবে ততদিন হতভাগ্য প্রতিবন্ধী এবং দরিদ্রদের ভাগ্যাকাশে সূর্যালোক অদৃশ্য থাকবে। সেই বার্তায় ভরপুর তাঁর কবিতা :

সতেরো, শীর্ণদেহ, শুষ্ক তার মুখ
দৃষ্টিহীন – শিশু এতটুক :
জন্মেছে সে ভিখারীর ঘরে
জীবন বহিছে অনাদরে।
(অন্ধশিশু : 'বেণু ও বীণা)

অথবা

পাঠাবো, নগরীর পথের হায়
কৌতুকের স্রোতে
পাতিয়া বিশীর্ণ হাত
প্রাতঃকাল হতে
বসে আছে পথে।
(বিকলাঙ্গী : ঐ)

অথবা

উনিশ' ক) 'ডোম' বলি ফিরাইয়া মুখ, চলে গেল পূজারী ব্রাহ্মণ–
খ) হে নাভাজী। ক্ষুণ্ণ কেন মন? জিজ্ঞাসিল গোবিন্দ তখন
কর বৎস হরিদাস কবীরে স্মরণ
সে সব ভক্তের কথা করহ প্রচার
ব্রাহ্মণের দর্প হবে দূর – ঘৃণা কারে করিবে না আর!
(নাভাজীর স্বপ্ন : ঐ)

সত্যেন্দ্রনাথের এ কঠোর নির্দেশ নয়। মনুষ্যত্ব জাগরণের ঐকান্তিক ইচ্ছার প্রকাশ। বাঙালীর মধ্য দিয়ে কবি এই সংকল্পকে প্রচার করে বিশ্ববাসীর হৃদয়-দ্বার খুলতে পারবেন বলে যে সম্ভাবনার উজ্জ্বল সংকেত পেয়েছেন তারই প্রকাশ এখানে :

কুড়ি, যেথা যে বাঙালী আছে
প্রাণে প্রাণে মিলিয়াছে
শুভ লগ্ন পেয়েছে বাঙালী
মনে হয় আর মোরা রব না কাঙালী
(সন্ধিক্ষণ : ঐ)

খ. গৌণ কবি-সংঘে : যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রোম্যান্টিক সৌন্দর্য বিলাস এবং অতীন্দ্রিয় সুখ তৃপ্তি বোধের বিরুদ্ধে যতীন্দ্রনাথ অসম্ভব অসন্তোষ নিয়ে কাব্যভূমিতে অবতীর্ণ। চির ব্যথাতুর মানুষের বাস্তব অবস্থান তাঁর মনে স্থায়ী ক্ষোভ প্রকাশের প্রেরণা যোগায়। তাঁর কবি দৃষ্টিতে সুখের ছোঁয়া নেই। দুঃখ-প্রেমী কবির চিত্তে অশান্তির ঝোড়ো হাওয়া।

তাই তাঁর কাব্যের অভিনব আস্বাদ। জড়বাদী কবির চোখে যন্ত্রের অন্তঃসারশূন্যতার মতো লোক-জীবনের অক্ষমতার ছায়া ধরা পড়েছে :

এক দেখিনু তন্দ্রাভরে—
তাঁতীর টাকার বড় দরকার, মাকু ছুটাছুটি করে।
(ঘুমের ঘোরে : মরীচিকা)

অথবা

দুই [ক] রাজার পাইক বেগার ধরেছে
ক্ষেতে যাওয়া বন্ধ হল আজ;
পরের কাজে কাটবে সারাদিন
রইল পড়ে ঘরের যত কাজ।

[খ] সারা সনের অন্ন ছাড়ি
যেতেই হবে রাজার বাড়ী
স্বর্ণ চূড়ার বর্ণ সেথায়
মলিন হল বুঝি!
যাচ্ছি চল, চক্ষু কান বুঁজি।
(চাষার বেগার : মরীচিকা)

গণজীবনের ব্যথা-বেদনার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। ইঞ্জিনীয়ার কবির সাধারণের মধ্যে প্রবেশের সুযোগ অবারিত। কাছে থেকে তাদের নিত্য অভাব দেখেছেন। যারা বাবুদের প্রাণ ধারণের জন্য শস্য উৎপাদন করছে, বেগার খাটছে, তাদেরই অনাহারে, অর্দ্ধাহারে দিন কাটে। সমাজের আশ্চর্য বিধান একটা অসংলগ্ন পথে প্রবাহিত বলেই বঞ্চনা উপেক্ষা এবং উৎপীড়নের কোন কোন মাপ কাঠি নেই। তাই নির্ভীক কবির উচ্চনিনাদে ঘোষিত বাণী :

তিন [ক] ক্ষুধার অন্ন, পরণের বাস, বাসের গেহ
তাদের যদি না মেলে
ঘৃণা কি করুণা কোরো না তাদের করগো স্নেহ—
তারা মানুষেরি ছেলে।
[খ] বেতসের মত সভ্য শিক্ষা শেখেনি যারা
হাওয়ার নেশায় মাতি--
বটের মতন খোলা মাঠে আজও রয়েছে খাড়া
তারা মানুষেরি জাতি।
[মানুষ : মরীচিকা]

উচ্চশিক্ষিত কবির আত্মসচেতনতা মনের গভীর বিন্দু থেকে উৎকলিত। ব্যঙ্গ চকিত ভাবনায় তাই যতীন্দ্রনাথের কবিতা সজীব। পল্লীর অশলিল ভাষাভাষী নির্বোধ মানুষগুলোর আবেদন নিবেদন ভস্মে ঘি ঢালার মতো চিরকাল অর্থহীন। দুর্ভিক্ষের ভিক্ষার ঝুলি শূন্য পড়ে থাকে। এদের পরিশ্রমের পুরস্কার, তিরস্কার। এই চরম প্রতারণার জন্য একদিন প্রতারকদের অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হবে। জীবনকে সামাজিক মর্যাদা দিতে প্রতিজ্ঞ কবি সেই উৎপীড়িতের সমতলে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বোঝেন এই সংখ্যা গরিষ্ঠের দল ভিন্ন, দেশের মুক্তি সম্ভব নয়। তীক্ষ্ম বাকবিন্যাসে উচ্চকিত কবি :

চার বার বার তিনবার--
এবার বুঝেছি চাষা ছাড়া কভু হবে না দেশোদ্ধার।
শোন্‌রে শ্রমিক শোনভাই চাষা
আমাদের বুকে যত ভালবাসা
ঢালিব বিলাব তোদের দুয়ারে অকাতরে অনিবার।
(দেশোদ্ধার : মরুশিখা)

অথবা

পাঁচ এবার একমাত্র পেট হতে
জন্মাবে বিশ্বের নূতন মানুষ।
তারা সবাই হবে সমাধিকারী
বিধাতার পেটের সন্তান,
একেবারে সহোদর।
কিন্তু সেই মানুষের

কী হবে আশা ভাষা আকাঙ্খা ?
আমরা দুশ্চিন্তান্বিত। (নবজন্ম : ত্রিযামা)

নবজাতকের আগমন বার্ত্তা শুনে কবি ভাবনায় কাতর। কারণ সমাজের সংকীর্ণ বিভেদের মূল যদি ইতিমধ্যে উৎপাটিত না হয় তাহলে আধুনিক সভ্যতার অনিবার্য সর্বনাশ। কারণ মৃত্যু দেখে দেখে কবি নির্বাক কুশলী শোষণের যন্ত্র যেন নিরুপায় মানুষের জীবনে আর অভিশাপ হয়ে না নেমে আসে, আর নবজাতকের স্বচ্ছন্দ জীবন অহেতুক ভীতির ছায়া স্পর্শ না করে, বর্ত্তমানে সেরূপ কোনো বাসনায় উদ্বুদ্ধ হতে চলেছেন কবি। তাঁর বিশ্বাস স্বাধীনতাও জীবনে সুখ দিতে অক্ষম। মহাসত্য হলো জীবন ধারণের জন্য নিরুপদ্রব সুস্থ একটা নির্মল সমাজ। কবির ধারণা :

ছয়

উদরে যার অন্ন নাই
কটিতে নাই বস্ত্র।
বাহুতে যার বহ্নি নাই
প্রাণ বাঁচানো অস্ত্র
স্বাধীন হোক অধীন হোক
কী তার তাহে আসে যায় ?
স্বাধীনতা তো মাদুলি নহে
গলায় বেঁধে ধুয়ে খায়।
(টুকরো : নিশান্তিকা)

পেটের সমস্যাই বড় সমস্যা। দেশ দেশান্তরে মানুষ সেই অতীত থেকে অর্বাচীন কালে ছুটে বেড়াচ্ছে। বাঁচার জন্য অধিকতর চাহিদাই তো ঐ পেট। সাম্রাজ্যবাদী কিংবা স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠি মানব প্রেমের ধার ধারে না। তাই গণজীবন এখানে একটা বোঝা মাত্র। দুবেলা 'কদন্ন' দিতে যে কৃপণের বুক ফাটে, তাদের রাজ্যে স্বরাজের সুখ কোথায় ? ব্যথিত কবির উক্তি :

সাত

(ক) অহর্নিশ—অবিশ্রান্ত মরিছে খেটে
দুবেলা দুমুঠো কদন্ন তবু জুটে না পেটে
জানি জানি আমি জানি
নিদ্রাহারা সে মহাশূদ্রের
রুদ্র ক্ষুধার বাণী
[দুবেলা দুমুঠো : নিশান্তিকা]

অথবা, আট [ক] এখন বুঝেছি ভাই
পেট ছাড়া আর পূজা করিবার
দুনিয়ায় কিছু নাই।
[খ] তাই চারিদিকে চাষ ও চাষার
ঘন ঘন জয়রব
তাই সংগ্রাম, তাই প্রস্তুতি
তাই যত বিপ্লব।
[পেট ও মাট : নিশান্তিকা]

অথবা নয় সহ্য যাহার হয় না বন্ধু দুখানি ফুল্কো লুচি
কোন্ ভরসায় গিলিবে সে হায় ডাহা স্বরাজের কুচি ?
আমি চলে যাবো, কিছুকাল পরে দেখে নিও ভাই তুমি-
স্বাধীন কলিকে ছট্‌ফট্ করে বিশাল ভারত - ভূমি।
বহু ভেবে কহি তাই -
স্বরাজের আগে ছিল প্রয়োজন কলিকের দাওয়াই।
[স্বরাজ সমরে : ত্রিযামা]

চাষী, মজুর, তাঁতী, ডাকহরকরা, ভিক্ষুক প্রভৃতি উপেক্ষিত সাধারণ জন যতীন্দ্রনাথের কবিতায় অধিক স্থান জুড়ে রয়েছে। তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থে
'মরীচিকা'-] ১৩৩০ : উৎসর্গ শ্রীযতীন্দ্র মোহন বাগচী বন্ধু বরেষু];
'মরুশিখা'- [১৩৩০ : উৎসর্গ শ্রীযতীন্দ্র মোহন বাগচী করকমলেষু];
'মরুমায়া'- [১৩৩৭ : উৎসর্গ জ্যোতি [কবি পত্নী],
'সায়ম্'- [১৩৪৮ : 'ত্রিযামা' - [১৩৫৫]; 'নিশান্তিকা -' [১৩৬৪];
তারই কমবেশি পরিচয়।
যতীন্দ্রনাথের কবি-ব্যক্তিত্ব 'শশিভূষণ দাসগুপ্তের লেখায় বিবৃত :

"কবি যতীন্দ্রনাথের মধ্যে একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি-পুরুষ বাস করতেন; সেই বলিষ্ঠ ব্যক্তি-পুরুষের পরিচয় সমভাবে ছিল তাঁহার কাব্য জীবনে এবং বাস্তব জীবনে। আমরা যাঁহারা জীবনে ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম তাঁহাদের অনেক সময়ই মনে হইয়াছে- আমাদের ভিতর এই লোকটি একান্ত ভাবে 'একক'।
..... কবিরা সাধারণত : সুন্দরের এবং মধুরের উপাসক - কিন্তু যতীন্দ্রনাথ কবি প্রথমাবধিই রুদ্রের উপাসক।

..... কবির কবিতাগুলি সমগ্রভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাইব' তিনি অপরাজেয় মানবতাবাদী; এই অপরাজেয় মানবতাবাদ আসিয়াছে বিশ্বাতীত দৈবের বিরুদ্ধে – এই বিদ্রোহই চারিদিকে জ্বালাইয়া রাখিতে চায় অনির্বান জ্বালা। .... বধির বিধাতা যেথা অনলাক্ষরে
লিখিয়া চলিছে তিমির – ললাট' পরে
মানুষের দাসখৎ।
[চির বৈশাখ : সায়ম্]

কবি তাই শুধু দুঃখের কবি নন, তিনি কবি – বিদ্রোহী।" ১

'সায়ম্" স্বতন্দ্র সুরের – এর কবিতায় সার্বভৌম উপলব্ধির নিশ্চিত উত্তরণ :

দশ [ক] ওই আসে সেই ঝড়
ওঠরে বেদেনী, মোট তুলে নিয়ে
বেদিয়ার হাত ধর্।
খ) ঝড়ে ঘর ওড়ে, মাঠ ত ওড়ে না –
ভয় নাই ভয় নাই,
ওই মাঠ ছেড়ে চল্‌রে বেদেনী
আর কোন মাঠে যাই।
(বেদেনী : সায়ম্)

কবি-মন বেদনায় ভারাক্রান্ত। বিরাগশূন্য তাঁর বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াস :

এগারো অকথিত বাণী অকৃত কাজের
জনম অবধি টেনে চলি জের,
মোর সুখ চেয়ে মুক এ মাটির
দুখ ভরে বুক ফাটে;
ওগো নির্মম, জীবন যে মম কাঁদিয়া কাটে।
(মাটির কাজে : সায়ম্)

---

১ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রথম পর্যায়। পৃঃ ৩ – ৬৩। দ্বিতীয় সংস্করণ মাঘ ১৩৭১। প্রকাশক : শ্রীঅমিয় রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রা : লি :
২, বঙ্কিম চাটার্জ্জী স্ট্রীট। কলিকাতা--১২

বিধ্বস্ত বিশ্বাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে সামান্যতম মনোবলের সঞ্চয়ে যতীন্দ্রনাথ শূন্যতাকে পূর্ণ করতে কখনো বা উন্মুখ। জীর্ণতার বাধা ডিঙিয়ে জীবনের নতুন বার্তা ঘোষিত হয় কবির কণ্ঠস্বরে :

বারো যে বোঝা বহিয়া আনি, শুনিয়াছি আছে এর মাঝে
নূতন বারতা ;
কত বিরহের শান্তি, হৃদয়ের কত না স্পন্দন –
মিলনের কথা।
(ডাক – হরকরা : মরীচিকা)

ক্ষুধার তাড়নায় লজ্জার কথা ভুলে যায় লোক। আবার এ-ও দেখা যায় উদর ভাবনার চেয়ে বড় হয়ে উঠে জীবনে লজ্জা সম্ভ্রম বোধ। ভিখারিনী তার পেটের কথা বিস্মৃত হয়ে ছেঁড়া ঝুলি দিয়ে সম্ভ্রম বাঁচায়। এ দৃশ্য যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টি, মন কেড়ে নিয়েছে। ভয়ঙ্কর অন্ন সংকটের কালেও শরীরী লজ্জাকে জেগে থাকতে দেখে তিনি চমৎকৃত। সে প্রতিবেদন কবি উপহার দিয়েছেন :

তেরো হায় ভাগ্য, ছিন্ন সেই ঝুলি
করেছিস বুকের কাঁচুলি।
রাখিতে লাজের মান

ঝুলিটায় দিলি টান,
উদরের কথা গেলি ভুলি ?
(ভিক্ষারিণী : ত্রিযামা)

তাই গণজীবন যন্ত্রণার শরিক কবির আত্মপরিচয় :

চৌদ্দ কবি নহি আমি, করিনি ছন্দে গ্রথিত
যে বিধি – বিধান প্রতিবিধানের অতীত
আমি মহাবন্ধনে ব্যথিত।
(কবি নহি : নিশান্তিকা)

নিঃশর্ত বাঁচার দাবিতে মানুষের জীবনে মৌল প্রত্যয়ের বীজ রোপন করতে চান তিনি :

পনেরো মিটে যাক নিষ্করুণ ক্ষুধা
উদরের দাস্য হতে
মুক্তি পাক লজ্জিত বসুধা।
(অন্নসমস্যা : ত্রিযামা)

পরিবেশে যতীন্দ্রনাথ গণ – সংগ্রামের ইস্তাহার হাতে নিয়ে পথের মিছিলে সামিল হয়েছেন ঃ

বোলো ভুখারি ভিখারি হয়ে, একদিন
উধাও আওয়াজ, সাজাও, মিছিল
আজ নয় কাল হবেই আকাল
ইনক্লাবী জয়গান।

(এদিক-ওদিক (এদিক ঃ নিশান্তিকা)

কবির মানবতাবোধের জাগ্রতরূপের বিকাশ ঘটেছে সাধারণের জীবনের অবর্ণনীয় সামাজিক সংকটের ভয়াবহ রূপ থেকে। এই উন্নত মানসিকতা থেকেই কবির গণদরদ প্রস্ফুটিত। কবির সম্পর্কে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেন ঃ

"কাব্যবিচারে আমি অধিকারী নই। সমলোচনায় আমার মন খেলে না তবু আমার বিশ্বাস, যদি কোন কোঠায় তাঁকে ফেলতেই হয়, তবে তা দুঃখবাদী' নয় – তাঁকে সত্যসন্ধ বাস্তবাদী বললেই ঢের বেশি মানায় ॥" ১

---

১ সুভাষ মুখোপাধ্যায়। আমার দেখা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। রবি বাসরীয় – ১ ৬৬ বর্ষ ৭ সংখ্যা রবিবার ৭ই চৈত্র ১৩৯৩। আনন্দবাজার পত্রিকা ২২ মার্চ, ৮৭,

গ। গৌণ কবি-সম্বন্ধে : জীবনানন্দ দাশ

জীবনানন্দ দাস রূপসী বাংলার কথক কবি। যান্ত্রিক সভ্যতার নিগড়ে বাঁধা অভ্যস্ত জীবনের চেয়ে ধূসর নিঃসঙ্গতাই তাঁর কাম্য। শহরের নিষ্প্রাণ প্রাচুর্য তাঁর কবি মনকে বেঁধে রাখতে পারেনি। তিনি উপলব্ধি করেছেন :

এক, 'হেমন্তের ধানকাটা মাঠ,

দুই, 'দেবদারুর ছায়া'

তিন, 'রূপার ডিমের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ'

চার, 'পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে'

পাঁচ, 'পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি-ধানভানা
রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ'

ছয় 'চীনে বাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাস'

সাত, আমলকী গাছ ছুঁয়ে তিনটি শালিক'

আট, 'নিকটে মরুর মতো মহাদেশ ছড়ায়ে রয়েছে'

সাধারণের জন্য বুক ফাটা আর্তনাদ জীবনানন্দ করেননি। একটা তাজা মানুষের সমাধি রচনার দুর্মর অন্তর্তাগিদ থেকে যে মৃত্যুর আগমন-সেই দৃশ্যে ফুটেছে জীবনানন্দের সমবেদনার স্পর্শ। তিনি সংগ্রামী আত্ম-হননকারী মানুষটির জন্য করুণা অনুভব করেছেন।

নয়, 'লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নেই ;
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।'

(আট বছর আগের একদিন : মহাপৃথিবী)

তবে তাঁর মনে ইতিহাস-চেতনা ক্রমে সমাজ চেতনায় মিশে একাকার। কবির বিক্ষুব্ধ অন্তর থেকে সংকেতিত হয়েছে, যন্ত্র সভ্যতায় পিষ্ট জীবনের বিরল অথচ স্পষ্ট ছবি :

দশ, 'অনেক শ্রমিক আছে এইখানে।
আরো ঢের লোক আছে

শঠীক শ্রমিক নয় তাঁরা।
স্বাভাবিক মধ্যশ্রেণী নিম্নশ্রেণী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিধি থেকে বুরে
এরা তবু মৃত নয়; অন্তবিহীন কালমৃত্যুবৎ ঘোরে।"
(এইসব দিন রাত্রি ঃ সাতটি তারার তিমির)

অথবা

এগারো, 'সতই বিমর্ষ হয়ে ভদ্র সাধারণ
চেয়ে ছ্যাখে তবু সেই বিষাদের চেয়ে
আরো বেশি কালো-কালো ছায়া
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রীজে উঠে
নর্দমায় নেমে—
ফুটপাত থেকে দূরনিরন্তর ফুটপাতে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা মরে যেতে জানে।'
(তিমির হননের গান ঃ সাতটি তারার তিমির)

অথবা

বারো, 'কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ ;
বহুদিন থেকে শান্তি নেই।
নীড় নেই
পাখিরো মতন কোনো হৃদয়ের তরে
পাখি নেই।
মানুষের হৃদয়কে না জাগালে তাকে
ভোর, পাখি, অথবা বসন্ত কাল ব'লে
আজ তার মানবকে কী ক'রে চেনাতে পারে কেউ।
চারিদিকে অগণন মেশিন ও মেশিনের দেবতার কাছে
নিজেকে স্বাধীন ব'লে মনে ক'রে নিতে গিয়ে তবু
মানুষ এখনও বিশৃঙ্খল।"
(জনান্তিকে ঃ ঐ)

এখানে জীবনানন্দকে সাধারণ মানুষের শরীক বলে ভুল হয় না। তাঁর রোমান্টিক কবি—ভাবনা জুড়েও মানুষের দুর্ভাগ্যের জন্য কিয়ৎক্ষণ বিষণ্ণ শব্দগুলো যে ভিড় করে বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

পুরনো পৃথিবীর রঙ বদলে গেছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মানুষের কতটা ভাল চান, এব্যাপারে জীবনানন্দের নির্ভুল সন্দেহ। বারংবার তাঁর মন ঘুরে ফিরে আসে অন্ধকার শিকড়ে। সেখান থেকে তিনি দেখতে পান জলস্নাত তাজা মানুষগুলো কিভাবে বাধ্যতার শেকলে বাঁধা পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদীর সুখের মুখে এদের আত্মাহুতি অর্থহীন। এদের কণ্ঠ রুদ্ধ, ঐক্য শিথিল, অন্তর্দাহ দুর্নিবার হয়েও মাত্রাহীন কাপুরুষতায় পর্যবসিত।

তেরো, যুগে—যুগে মানুষের অধ্যবসায়
অপরের সুযোগের মতো মনে হয়।
কুইসলিং বানালো কি নিজ নাম—হিটলার সাত কানাকড়ি
দিয়ে তাহা কিনে নিয়ে হয়ে গেল লাল ঃ
মানুষেরই হাতে তবু মানুষ হতেছে নাজেহাল ;
পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি।
এ কেমন পরিবেশে রয়ে গেছি সবে—
বাক্‌পতি জন্ম নিয়েছিলো যেই কালে,
অথবা সামান্য লোক হেঁটে যেতে চেয়েছিলো স্বাভাবিক
ভাবে পথ দিয়ে
কী করে তাহলে তারা এ-রকম ফিচেল পাতালে
হৃদয়ের জন-পরিজন নিয়ে হারিয়ে গিয়েছে ; ”

(সৃষ্টির তীরে ঃ সাতটি তারার তিমির)

চাষীরা কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। শোষিত, বঞ্চিত, সর্বহারাদের অনুতপ্ত হৃদয়-কথার খবর রাখতেন জীবনানন্দ। তাঁর আন্তরিকতায় ধরা পড়েছে ঃ

চোদ্দ, আমাদের খেতে-ভুঁয়ে অবিরাম হতমান সোনা
ফলে আছে বলে মনে হয়;
আমাদের হৃদয়ের সাথে
সে-সব ধানের আন্তরিক পরিচয়
নেই; তবু এই সব ফসলের দেশে
সূর্য নিরন্তর হিরণ্ময়;
আমাদের শস্য তবু অবিকল পরের জিনিষ'
(সোনালী সিংহের গল্প : ঐ)

মৃত্যু পথ যাত্রী অসহায় কৃষকের সর্বনাশকে চোখে দেখে উদাসীন বা নির্বিকার থাকতে পারেননি জীবনানন্দ। তাই তাঁর কবিতায়,

পনেরো, (ক) তবুও কোথাও কোনোও প্রীতি নেই এতদিন পরে।
নগরীর রাজপথে মোড়ে-মোড়ে চিহ্ন পড়ে আছে;
একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
তবুও আতঙ্কে হিম-হয়তো দ্বিতীয় কোন মরণের কাছে

(খ) অবশেষে জাগরূপ জনসাধারণ আজ চলে?
বিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়
চেয়েছে ভাবের ঘরে চুরি বিনে জ্ঞান ও প্রণয়?
(বিভিন্ন কোরাস : ঐ)

উপোসী মানুষের নিরর্থক হয়রানির ছবি একই শব্দ নর্দমা, ফুটপাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এঁকেছেন কবি। মন্বন্তর, যুদ্ধ, শেষ নেই, সাধ নেই। মানুষের রক্তের স্রোতে এই মানুষই অবগাহন করতে অত্যন্ত আগ্রহী বলে জীবনানন্দের ঘৃণা দানা বেঁধে উঠে:

ষোলো, চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়—অলীক প্রয়াণ!
মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর;
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল;
মানুষের লালসার শেষ নেই;
উত্তেজনা ছাড়া কোনদিন ঋতুক্ষণ
অবৈধ সঙ্গম ছাড়া মুখ
অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ নেই।'

(এইসব দিনরাত্রি : শ্রেষ্ঠ কবিতা)

সত্য সন্ধানী কবির আত্মপ্রত্যয় জন্মেছে ইতিহাস চেতনা থেকে। তাই কল্যাণকামী কবির স্পষ্টভাষা :

সতেরো, আমরা অন্তিম মূল্য পেতে চাই প্রেমে'

(পৃথিবীতে এই : শ্রেষ্ঠ কবিতা)

তীব্র উপলব্ধি থেকে জীবনানন্দ তাই সচেতন ভাবে উচ্চারণ করেন,

আঠারো, ক) নিখিল আমার ভাই

— কীটের বুকেতে যেই ব্যথা জাগে আমি সে বেদনা পাই।

খ) —সবার বুকের বেদনা আমার, নিখিল আমার ভাই।

গ) বাতায়নে মোর ভেসে আসে যেন কাদের তপ্তশ্বাস
অন্তরে মোর জড়ায়ে কাদের বেদনার নাগপাশ,
বক্ষে আমার জাগিছে কাদের নিরাশা গ্লানিমা ত্রাস

— মনে মনে আমি কাহাদের হায় বেসেছিনু এত ভালো!

ঘ) আমার চোখের অশ্রুপুঞ্জে নিখিলের বোন ভাই।

(নিখিল আমার ভাই : ঝরাপালক)

জীবনানন্দের কবিতায় আকুল গণদরদ নেই। শ্রেণীশাসিত মানুষের জীবনযাপনের বৈষম্য ধরে তৈরী-হওয়া মর্মান্তিক অসংগতির বোধ থেকে তাঁর গণদৃষ্টি গড়ে উঠেছিল। শান্ত অথচ নিগূঢ় পর্যবেক্ষনের ভিতর দিয়ে জীবনানন্দের গণচিন্তা গোটা বিশ্ব জুড়ে জেগেছিল তার পরিণত কাব্যরচনার কালে, - '৭টি তারার তিমির' এবং 'বেলা-অবেলা-কালবেলা'য়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের যথার্থ বিশ্বাস :

'কিছুদিন আগে পর্যন্ত জীবনানন্দ দাস ছিলেন শুধু কবিদের কবি। এখন তিনি সমস্ত মানুষের।' ১

১। জীবনানন্দ দাসের কাব্যগ্রন্থ : ভূমিকা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ৬ষ্ঠ মুদ্রণ ১৩৮৮। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলিঃ ৭০০০৭৩

৬. গৌণ কবি-সংঘে ঃ অমিয় চক্রবর্তী

অমিয় চক্রবর্তী আমেরিকা প্রত্যাবৃত্ত বাঙ্গালী কবি। বিশ্ব মানুষের বেঁচে থাকার ইতিহাসে চোখ রেখে সত্যের বোধ তাঁর প্রবাসী কবিপুরুষকে জাগিয়ে দেয় ঃ

"আপন দেশে দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা দেখে কবি সভ্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছিলেন, বিধ্বস্ত ইউরোপেও তিনি দেখলেন ছিন্নমূল মানুষের বেদনাবহ ইতিহাস। আমেরিকা প্রবাসে আপন জীবনে উপলব্ধি করলেন অনিকেত মনের ভার। শুধু ধ্যানে মুক্তি নেই, শুধু বিজ্ঞানেও মুক্তি নেই। সমাজের জন্য চাই, বিজ্ঞানের কল্যাণে সন্ধি, কবির জন্য চাই দৃষ্টি ও ধ্যানের সংগতি, 'যা দেখায় ভাবায় মেলানো' ... । জগৎ তাঁর কাছে মায়া নয়, সবই প্রয়োজনীয় অঙ্গ। সংসারেই তাঁর নির্বাণ। "১

অমিয় চক্রবর্তী সমাজ সচেতন আধুনিক বাঙালী কবি। বলাবাহুল্য সে কারণেই অন্নহীন কৃষকদের মন্বন্তরে (বাংলা ১৩৫০) নির্মম মৃত্যুর শিকার হতে দেখে তিনি লিখলেন ঃ

এক, শহর—গ্রামের কোটি জনতার
নেই শুধু চোখে সবুজ অন্ন,
সোনার অন্ন ॥
অন্ন দাও
প্রাণের ক্ষুধায় একটু অন্ন দাও ॥
(অন্ন দাও ঃ পারাপার)

নিজস্ব শ্রেণী ভেঙ্গে কবি যে মাটিতে পা রেখে অতবড় সমবেদনার কথা উচ্চারণ করতে পারলেন, তা ভাবতে কষ্ট হয় সত্য, তবে অকপটে মন খুলে সেই বলাতো উপলব্ধিরই বহিঃপ্রকাশ। পক্ষপাত-দুষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় উপেক্ষিত কোটি মানুষের দৈন্য দশা ভয়ংকর। তা কবির কবিতায় কান পাতলে শোনা যায় ঃ

দুই (ক) আডং বেঁচে আছো, বাঁচো (নিরাশ্চর্য বাঁচা) এবং যমের কৃপায় মরা ;
অমৃতস্য অধমপুত্র, বন্দী স্যাঁত সেঁতে গলির ঘরে ইদুর-ভরা;
নেই রাগ। - অবশ্য। আছো আনন্দে ;

১। দীপ্তি ত্রিপাঠী। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়। পৃঃ ৩২৭। ১ম প্রকাশ ১৯৭৪ প্রকাশক - দে'জ পাবলিশিং কলি - ৯।

(খ) শুধু জানি আগুন, আগুনের কাজ, সৃষ্টির আগুন, জাগলে প্রাণে
তীব্র হানে বেদনা জাগবার, আর্টের অগ্নেন, মরীয়াকে টানে।
(চেতন সাকরা : এক মুঠো)

সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটেছে বটে। কিন্তু ঘর ভেঙেছে যন্ত্র। যন্ত্রণা তাতে তীব্র-হওয়ায় বাস্তুহারার চোখে বিরাট শূন্যতা। তাই স্বভাবতই ভিটে ছাড়ার দলে মিশে কবির ভাবনা ভারাক্রান্ত :—

তিন, দূরে কোন
জায়গায় তবে
ইট বাঁধা বহু গ্রাম একত্রে শহরে গেঁথে, কোন মতে
থাকবে বহুলোক। এই গ্রাম
তাহলে
উঠে যাবে ॥

(ইতিহাস : পালা-বদল)

বৃহত্তর জনসংখ্যার অধিক অংশই যেখানে নিম্ন আয়ে জীবণ ধারনে অসমর্থে সেখানে সুখ বস্তুটা আশাতীত ব্যাপার। চিতার জ্বালা যেখানে মানুষকে তাকদগ্ধ করে সেখানে মানুষ নির্মম ক্ষয়ের মুখোমুখি। উচুতলার কর্তার প্রতি মানবাত্মার কান্নায় অধীর কবির হুশিয়ারী :

চার ক) তালিকা প্রস্তুত
কী কী কেড়ে নিতে পারবে না—
বাস্তু ভিটে পৃথিবীটার সাধারণ অস্তিত্ব।
খ) কুয়োর ঠাণ্ডা জল, গানের কান, বইয়ের দৃষ্টি
গ্রীষ্মের দুপুরে বৃষ্টি।
আপন জনকে ভালবাসা,
বাঙলার স্মৃতিদীর্ন বাড়ী-ফেরার আশা।
(বড়োবাবুর কাছে নিবেদন : পারাপার)

অথবা

পাঁচ ক) বেচাকেনা আর লভ্যের খাতায়

এখানে জমানো রক্তপণ্য –
যারা দান দেয় তারা মুনাফায়
সাধুতার সুদ কষে তবে হয় দাতা,

খ) আসো যদি তবে শাবল হাতুড়ি
আনো ভাঙবার যন্ত্র
নতুন চালের মন্ত্র।
গ্রামে যাও, গ্রামে যাও
এক লাখ হয়ে মাঠে নদী ধারে
অন্ন বাঁচাও, পরে সারে সারে
চাবে না অন্ন, আনবে অন্ন ভেঙে এ দৈত্যপুরী,
তোমরা অন্নদাতা।

(অন্নদাতা : পারাপার)

"আমেরিকা থেকে অমিয়বাবু ছত্রিশ বছরে এগারো বার দেশে ফেরেন স্বল্পকাল থাকতে। বারো বারের বার বরাবরের জন্য, কিন্তু সেই বরাবর স্বল্পকাল। তার পরে মর্ত্য থেকে বিদায়।" ১০

বিচ্ছিন্নতাকামী চিরকালের কিছু স্বার্থপর 'বিশেষশ্রেনী গড়ার দল' তাদের নির্দিষ্ট সুখকে সীমানার পাহাড় উঁচিয়ে পৃথক করে রাখতে ব্যস্ত। এরা শোষণের যন্ত্র, পীড়নের হাতিয়ার, এদের মুখে মধু, মনে বিষ। সাধারণের চিত্তে এরা ভূতের মতো কোনো বীভৎস আতংক রূপে চিহ্নিত। এই কাঁপা নির্দয় মানুষগুলোকে দেখলে আঁতকে ওঠে সরল মানুষগুলো :

ছয়, ছায়া জমিদারের কায়া
তেতলায় বসে আছে কোথাও
ভয় পেয়ে ওঠে কাকেরাও,

(কালের ভূত : অভিজ্ঞান – বসন্ত)

---

১০ অন্নদাশঙ্কর রায়। অমিয় চক্রবর্ত্তীর স্মরণে। পৃঃ সংখ্যা নেই। শারদ সঙ্কলন ১৯৮৩ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সম্পাদক শ্রীসুহাস তালুকদার : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট। কলি – ৭০০০১৩

অমিয় চক্রবর্ত্তীর দূরদৃষ্টি গাঢ়, স্বচ্ছ এবং প্রসারিত। তাঁর চোখ এড়ায়নি কোনো তুচ্ছ বস্তুও। নষ্ট মানুষের কৌশল জালে বন্দী সহজ মানুষগুলো যেমন খোঁজে তাদের উত্তরাধিকার তেমন কীটরাও তাদের গোটা সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার্থে শত্রুর পাশ কাটিয়ে মুক্তির পথ সন্ধান করে। কবির অনুভবে সেই পথের ঠিকানা, আর নগণ্যের উদ্দেশ্যে হৃদয়ের উষ্ণ ভালবাসা :

সাত, ক) নতুন মৃত্যুতে মরে, এরা আর আমি
বেঁচে আছি পুনর্বার।
এই গাছ, এই বাড়ি-ছায়া-করা মেঘ, এই বুক॥

খ) সুন্দর নিমেষ ভরা সর্বরিক্ত দান
কিছু নেই তারি ধন কত অনিঃশেষ;
বিদীর্ণ কঠিন প্রাণে মুক্তিকে শূন্যের আঙিনায়
মাথা ঠুকে করি নমস্কার। নমস্কার।
প্রীতি দাত্ত, হে নক্ষত্র, হে পৃথিবী,
স্মৃতিহীণ প্রসন্নতা।
(প্রতিবেশী : পারাপার)

আট, আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ঘুরুক দেখুক থাকুক
কেমন যেন চেনা লাগে ব্যস্ত মধুর চলা-
শুদ্ধ শুধু চলায় কথা বলা-
আলোয় গন্ধে ছুঁয়ে তার ঐ ভুবন ভরে রাখুক
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ধূলোর রেণু মাখুক॥
(পিঁপড়ে : পারাপার)

বিভেদ-প্রেমী মানুষের প্রতি কবি বীতশ্রদ্ধ। কৃত্রিম পসরার মানুষ ভুলানো ফাঁদ ভিন্ন আর কিছু নয়। শ্রান্ত মনে শান্তির নির্যাস নেই। হৃদয়হীনদের মন্ত্রে বিভ্রান্ত আত্মাগুলো নিঃসাড়, অর্থহীন, বিবর্ণ, ব্যর্থ। ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়ে এতো কিসের অহংকার। কবির দুঃখ সেখানেই। সমভাবনার উন্মেষ না ঘটলে সভ্যতার শুভ্রমূল্য ম্লান। শিক্ষার আলোক আত্মার ভিতর থেকে জাগিয়ে তুলতে হবে। নতুবা মনুষ্য জন্মের গৌরব কোথায়? সুস্থ বিশ্ব সভ্যতার ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিত প্রত্যাশা করেছেন কবি। তারই বিস্তীর্ণ পরিধি রেখায় দাঁড়িয়ে অপচয়নাশী মনুষ্যত্বের হিরণ্যগর্ভ উদ্ভাস খুঁজেছেন। নিচের পংক্তিকটি সে কারণে বিশেষ মনোযোগের বিষয় :

নয়, ক) ক্লান্ত আমি, এড়িয়েছি মন্দির-মসজিদের হাতছানি
ত্যাগ করলাম ধর্মযাজকের বক্তৃতা আর কাহিনী ॥
খ) এসো পরস্ফুরের মধ্যে মিথ্যে পর্দা করি ছিন্ন
সংযুক্ত করি তাদের যারা কাছে থেকেও অন্য ॥
গ) প্রেমিকের মন্ত্রে সেই মদিরা যাতে শান্তি পেয়েছে শক্তি
মিলনের ধর্মে মানুষে - মানুষে জানি মুক্তি ॥
(নয়া মন্দির ঃ হারানো আর্কিড)

কবির একান্ত বেদনা তাঁকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে নিয়ে ছুটেছে। স্থায়ী প্রবাস-জীবনেও মনের সুখ পাননি। তবে এ ভাবনার উৎস-কুলে কবির জন্ম না হলেও, যে সম—প্রাণতা বোধের উন্মেষ ঘটেছে স্বাভাবিক ভাবে তাঁর কবিতায়, তার উত্তাল-তরঙ্গ অতিমাত্রায় সচেতন করলেও যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠে না গণজীবনের চরায়। তাই আভিজাত্যের উঁচুতলা থেকে যে গণবোধের প্রকাশ ঘটেছে অমিয় চক্রবর্ত্তীর কবিতাংশে তা মানব দরদ থেকেই উদ্ভূত। তাই বলা চলে তিনি গণদরদী কবি। তাঁর কাব্য চেতনা সম্পর্কে একটি মূল্যবান প্রতিবেদন প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ঃ

"সমস্ত পৃথিবী তাঁর সংসার, ছড়ানো, ছিটানো, বিস্তীর্ণ পরিধিতে সীমায়িত যেখানে অভিজ্ঞতার প্রত্যন্ত ভূমিতে তিনি একক। নিছক খেয়াল খুশীর আনন্দে তাঁর পথ—চলা নয়, জীবনের করুন কঠিন আশ্চর্য সত্যটিকে চিনবার আগ্রহে মনের এই অস্থিরতা, যদিচ অস্থি-রতার মৌল কারণটুকু জীবনের প্রতি বীতরাগ নয়, জীবনকে নিবিড় করে ভালবাসার একান্ত দায়।

————তাঁর কাব্যের পরিধি দেশকালের গণ্ডি মানেনি, স্বীকার করেনি মানুষে মানুষে দেশে দেশে ব্যবধান। সব মানুষের আনন্দ বেদনা, সকল মানুষের চিন্তা ভাবনা, সংসারের ছোট ছোট দুঃখ দৈন্য একটি বৃহৎ 'চৈতন্যময় মনের 'উজ্জ্বল আলোকে এক হয়ে মিশে গেছে। এজন্যই তাঁর কাব্যে একটি সহজ অনাড়ম্বর প্রতীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, মুনিবিড় আত্মীয়তার পরম ঐকান্তিক অনুভূতির চিহ্ন প্রতি

কবিতাতেই বর্ত্তমান। পালা-বদল কাব্যগ্রন্থের 'ইতিহাস' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যনীয়ঃ

এই গ্রাম
তা হ'ল
উঠে যাবে ॥
(পালা-বদল ৫৫)" ১

জন্ম-স্বত্বে এবং কর্ম-স্বত্বে কবি যে শ্রেণীর বাসিন্দাই হ'ন দেশ-ব্যাপী ভাতৃদ্রোহের কলঙ্ক অমিয় চক্রবর্ত্তীকে প্রচণ্ড ভাবে দুলিয়েছিলো। পৃথিবী জোড়া গণজীবনের দুঃখ মথিত রূপ এবং তার থেকে উত্তরণের উপায় ভাবনা তাঁর কবিতায়ঃ

দশ, ক) গান ধর গো
ঐ কালো পন্থী কেউ টিঁকবে না, না, না।'
খ) আমাদের মতো বিচিত্র জনসাধারণ মানুষধর্মী;
বর্বরের হাতে দুঃখ পেয়েও নিভৃত করুণার জিৎ,
প্রত্যহ বীর্যেই ধ্যানের ভিৎ ;
গ) যাই হোক
পাপের বিরুদ্ধে পাপী হয়ে, হত্যার বদলে হেনে হত্যা-শোক
মাথা নিচু করব না কোটি লোক।
(সত্যাগ্রহ ঃ পারাপার)

মানুষকে ভালবেসেছেন অমিয় চক্রবর্ত্তী। কর্মপটু কবি নির্ভেজাল প্রবাস সুখে বাঁধা না পড়ে অন্তর তাগিদকে কাজে লাগিয়েছেন। মন তাঁর মুক্ত-বিহঙ্গ। ছুটে বেড়িয়েছেন দেশ দেশান্তরে, যেখানে সকল বয়সের মানুষ, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, অনাহারে দগ্ধ হয়ে বিদ্রূপে ঝলসে লোভে দাসখত লিখে ছন্ন ছাড়া। আবাল্য দেশ-

১, অরুণ ভট্টাচার্য। কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতু বদল পৃঃ ১০১—১০৪। ১ম প্রকাশ সন ১৩৬৫। প্রকাশক 'জিজ্ঞাসা' ১৩৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কলি-২৯

ছাড়া হয়েও নাড়ির টানে, কলকাতা, নোয়াখালি এবং প্রেমের টানে সুদূর আমেরিকার প্রবাসী-জীবনেও তিনি মনের অস্থিরতার বল্গা আয়ত্তে রাখতে পারেননি। শেষ জীবনে স্বদেশেই প্রাণত্যাগ করেন। বস্তুতঃ মানবপ্রীতিই কবিকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে তাঁর ভিতরকার মনুষ্যত্বকে সর্বদা সজাগ করে রাখে। তাই তিনি একদিকে দুর্দশাগ্রস্ত স্বদেশের আকর্ষণ, অপরদিকে স্প্যানিশের উদ্বাস্তুদের অসহ্য যাতনার টানে ছুটে চলেছেন। এ ছোটা তাঁর আত্মিক ব্যাপার বলেই আবেগ বর্জিত সুর কবিতার ছত্রে ছত্রে বেদনকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করেছে। উপযুক্ত স্তবকগুলো তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ :

এগারো, ক) শোনো, মন
মানুষের তীব্রাঘাতে তারি কান্না জাগে অনুক্ষণ।
জননী সে, ভাই সে যে, বোন মোছে শূন্যে ত্রস্ত চোখ,
সে যে ঐ নগণ্য লোক
বাপ সে যে, পোড়া ভিটে দেখে একা কিরে-
দলে দলে কেউ গেছে নিরন্নের ভিড়ে-

খ) সাড়া দাও, মন
তার তীব্র দুঃখে হও একক চেতন।
বহু হাত এক বাহু হোক তবে বীর্যের উত্তরে
সংকীর্ণ গ্রামের সাঁকো তাই দিয়ে চলো ঘরে ঘরে।

গ) দ্বীপান্তরে কান্না শুনে একা চলে এসে
জনে জনে মুক্তি জানি পরম একের সমাবেশে-
অথবা (সন্দীপ : পারাপার)

বারো, ক) ডানজিগের মেয়ে
ছবিতে দেখেছি' ওড়াচুল আঁখি ছেয়ে
কিছু তো জানো না, শিশু মুখে হাসি, স্কুলে যাও দূর দেশে

খ) স্থান নেই
রাষ্ট্রের হিসেবে তোমার প্রাণ নেই।
(যুদ্ধের খবর : একমুঠো)

কবির চোখ জুড়ে উদ্বাস্তুর ভিড়। শঙ্কিত কবি সমষ্টির মুক্তি চান। গণজীবনের শরিক না হয়েও এর চোখে অধিকতর চাওয়ার আর কি আছে। বিদেশে পাড়ি দিয়েও দেশকে ভোলেননি। তার কাছে গোটা বিশ্বই বসত-বাটি। তাই পৃথিবী জুড়ে তাঁর গতায়াত। নির্দ্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে দেহ থাকলেও মন সর্বত্র ভাসমান, তাই শোনাতে পারলেন গ্রামবাংলার বঞ্চিত শিশুদের প্রতি উপেক্ষার কথা :

তেরো, ক) হায়রে' নেমন্তন্ন।
সাগর পারের লোক, দেখে যাও
অন্ন দেশের শিশু,
খ) কাঙালি সারি বসেছে পথে উপরে ওরে কাক
সেখানে ছুটে আসা।—
গ) মাটিতে ফল, মাটিতে ধান—
এদেরেই নেমন্তন্ন ছিল।
ঘ) উঁচু বাড়িতে নীল পর্দা
সেপাই ঘোরে বড়ো দরজায়—
ঙ) ফুটপাথেই ফুরোয় নেমন্তন্ন ॥
(নিমন্ত্রণ : পারাপার)

এখানেই মনুষ্যসংস্কৃতির প্রেমিক কবির সার্থক পরিচয়।

৬০ গৌণ কবি-প্রসঙ্গ : বিষ্ণু দে

বিষ্ণু দে-র জনপ্রীতি অন্তর্জাত। তাই তিনি অন্তরের টানেই দেখেন যন্ত্র সভ্যতার নিগড়ে—বাঁধা যান্ত্রিক—দানবকে। এদের বন্দী জীবন যে কী বিষময়- তার স্পষ্ট পরিচয় :

এক, ক) বড় বাজারের উপল উপকূলে
জনগণের প্রবল স্রোত
উগারিছে ফেনা
আর বিড়ির আর সিগারেটের আর উনুনের আর মিলের ধোঁয়া
আর পানের পিক
আর দীর্ঘশ্বাস

খ) ট্রাফিক-থমকে দাঁড়ায় উঁচোট খায়

গ) জানিনি আগে, ভাবিনি কখনো
এত লোক জীবনের বলি
মানিনি আগে
জীবিকার পথে পথে এত লোক

ঘ) হায়রে। আশার ছলনে ভুলি।
কোথায় তুমি। ট্রেন তো এল।
কয়লা খনি ধসে পড়ুক
ধর্মঘট নাই বা থামল
ট্রেন তো এল।

(টপ্পা ঠুংরী : চোরাবালি)

চেনা পৃথিবীর অলিগলি পেরিয়ে বিষ্ণু দে শহুরে মানুষকে দেখে আরও বেশি চিন্তিত। মানুষের অগ্রগতি বিশ্বাস ভাঙছে' তিক্ত করছে বিশুদ্ধ ভাবনাগুলো। সভ্য জগতের কার্যকলাপ কবির বিশ্বাস, শ্রদ্ধা হনন করেছে। বরং ঢের সুখ মোহমুক্ত অন্ধকারের গাঢ় শরীরে। যন্ত্রণাদগ্ধ কবি সর্বজনীন কল্যাণে নৈতিক অবক্ষয়রোধে উচ্চকণ্ঠ :

দুই, ক) থেকেছি বুর্জোয়া বহুদেশে গ্রামে শহরে বস্তিতে

খ) —থেকেছি নিবিড়
ঘননীল অন্ধকারে, স্পন্দমান ছন্দে অতল স্মৃতির হর্ষেভয়ে

কাব্যের আদিম গর্ভে যেখানে করেছে মহাভিড়
লক্ষ—লক্ষজীবন—মৃত্যুর ক্ষিপ্র দিব্য অন্ধকার।

গ) থেকেছি সে- অন্ধকারে সেই অন্ধকার চাই শরীরে, হৃদয়ে ;
সেই বনে হিংস্রতা ও স্বাভাবিক, সৃষ্টিময়, মধুর দয়াল ;
মৃত্যু নয় দীনহীন, আপতিক, নয় সামাজিক ভয়ে
অথবা হাজার জন্তুর দন্তুর নখীমানবিক শোষণে ভয়াল।
(সেই অন্ধকার চাই ঃ সেই অন্ধকার চাই)

অথবা

তিন, খুঁজেছি অনেক শ্রেষ্ঠদের সঙ্গ, কিন্তু তারা প্রতিজনে
সভ্য ভব্য মহাজন, উদারতান্ত্রিক বচন—বাচনে
ঘৃণাকে বানিয়ে দেন এলে বেলে খেলা নয় ছয়,
যা বলেন যা করেন, অক্ষম তা কিছুই গ্রহণে
একাগ্র এ আমার
বাংলা থেকে আমাদের বিশ্বে আগমন,
প্রচণ্ড প্রকাণ্ড ঘৃণা, ক্ষুদ্র বাসস্থান,
আরম্ভেই আমাদের বিকলাঙ্গ করে বিপর্যয়।
(স্বদেশী কবিতা ঃ সেই অন্ধকার চাই)

মনুষ্যত্বের অপমৃত্যুতে কবি বিস্মিত। বিপর্যয়ের মধ্যে মানুষের লালসা তীব্রতর হতে দেখে বিষ্ণু দে স্বভাবতই হতবাক। ধ্বংসকে অনিবার্য করে জীবন ও সমাজকে তছনচ করার মোহ প্রত্যক্ষ করার পূর্বাভাসে কবির প্রশ্ন ঃ

চার, শান্তি নয়, সখ্য নয়, চায় বিশ্বে চায় হিরোশিমা ?
(বেয়াত্রিচে ঃ সেই অন্ধকার চাই)

মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী বিষ্ণু দে চলমান জগতে মাৎস্যন্যায়ে বিচলিত এবং ব্যথিত। তাই তিনি মনে করেন সুস্থ, সবল এবং সুন্দর সমাজ গড়তে হলে সংহতির প্রয়োজন। কিন্তু কবি তাকিয়ে দেখেন ঃ

পাঁচ; কিন্তু এ-সমাজে, বঙ্গে শতরঙ্গে ভঙ্গুর সমাজে
সংবাদ-সরবরাহ রোজ-জ্ঞানের গর্দানে দেয় কোপ ;

বেতার বাজায় ঢাক, উপন্যাস ও, কিংবা বায়োস্কোপ ;
এমন কি থীসিস মারে কিংবা রম্য রচনা ও সাজে
হয় ন্যাকা বিজ্ঞাপন নয় ঝুটা, এলে বেলে, বাজে;
(এরা জনা কয় ঃ সেই অন্ধকার চাই)

অথবা

ছয়, প্রেমের বিনয়ে দেখে গ্রামে-গ্রামে দেশে-দেশে জীবনে মননে
একক ও অনেকের সম্মিলিত- হৃদয়ের স্পন্দনে—স্পন্দনে
সেখানে আপন পর দুই তীরে আলিঙ্গনে এক নদী
(শীলভদ্র পঞ্চমুখ ঃ সেই অন্ধকার চাই)

নির্জনতা, এবং জনতা উভয়ই পাশাপাশি বিষ্ণু দে-র কবিতায় পদধ্বনি তুলেছে। ব্যষ্টি ছেড়ে সমষ্টিতে মিলতে হৃদয়াবেগ গভীর চেতনাকে উপস্থিত করায়। কবির আত্মজয় মুক্তির পথ দেখায়। জীবনের তাগিদে তাই উন্মুখ বিষ্ণু দে। উদাসীন থেকে কর্তব্যচ্যুত হতে চাননি, বরং বিষণ্ণ স্মৃতি বহন করেই সমকালীন অভিজ্ঞতাকে তিনি চিত্রিত করলেন ঃ

সাত, এ নরকে
মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই
(স্মৃতি সত্তাভবিষ্যৎ ঃ স্মৃতি সত্তাভবিষ্যৎ)

কবি তবু আশাহত হননি। তিনি বিপ্লবের সঙ্কেত পেয়েছেন। এবার কোন রাজপুত্র এসে কৃত্রিম সমাজ ভেঙে গড়ে তুলবে শান্তির আবাস ঃ

আট, জন সমুদ্রে নেমেছে জোয়ার
মেরু চূড়া জনহীন
হালকা হাওয়ায় কেটে গেছে কবে
লোক নিন্দার দিন।
(ঘোরসওয়ার ঃ শ্রেষ্ঠ কবিতা (চোরাবালি)
১৯২৬—৩৭

জীবনের রঙিন স্বপ্নে বিভোর হতে গিয়েও পারেননি বিষ্ণু দে। তাঁর সামনে সমাজের নানাবিধ সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়ায়। কবি তাঁর প্রথম জীবনের বাসনার ডানায় ভর করেছেন ঃ

নয়, পৃথিবীকে চূর্ণ—চূর্ণ করে
আকাশে ছড়িয়ে এসো অন্ধকারে হৃদয়ে আমার ॥

(অভীপ্সা ঃ শ্রেষ্ঠ কবিতা (উর্বশী ও আর্টেমিস)
১৯২৯—৩৩

বিবেক দংশন ভুলে থাকতে চান বিষ্ণু দে। মনুষ্য প্রীতির তাড়নায় পুনর্নির্মাণ করলেন তাই 'পদধ্বনি'/ 'জন্মাষ্টমি' / 'জলদাও' / '৩১ শে জানুয়ারি ১৯৪৮' / 'প্রচ্ছন্ন স্বদেশ' / 'অন্বিষ্ট' / 'একজন দুঃস্বপ্ন'/ প্রভৃতি কবিতা। প্রগতি চেতনায় নতুন সমাজ রূপায়নের ভাবনায় মগ্ন হবার অনায়াস আভাস পান ঃ

'দশ, ক) প্রাক্তন পৃথিবী ওঠে নিজস্ব স্মৃতির
করাল অতীত নিয়ে আমার অতীতে ?
খ) কার পদধ্বনি আসে ? কার ?
এ কি এলো যুগান্তর। নব—অবতার।
এ যে দস্যুদল।
হে ভদ্রা আমার।
লুব্ধ যাযাবর। নির্ভীক আশ্বাসে আসে ঐশ্বর্য-লুণ্ঠনে,
গ) চায় তারা ফসলের খেত, দীঘি ও খামার
চায় সোনা জ্বলা খনি। চায় স্থিতি, অবসর।

পদধ্বনি . শ্রেষ্ঠ কবিতা (পূর্বলেখ)
১৯৩৭—৪১

বিষ্ণু দে আসন্ন সমাজ বিপ্লবের সংকেত অনুভব করেন। তাই গণ সচেতনতা জাগাবার ইচ্ছায় প্রতীকাশ্রয়ী কবিতার নির্মান। বুর্জোয়া শক্তির অনিবার্য পতন ইঙ্গিত 'পদধ্বনি'—তে সরব। সাম্যবাদী কবি সমাজ-তুরঙ্গের কদমে কদমে পুরোগামী। তবে মগ্ন চৈতন্যে শূন্যতার ভিড়। ছল-কৌশলের সাঁকো জুড়ে সাময়িক পথ পাড়ির সমাজ ব্যবস্থায় তিনি বিচলিত সে কারণে এই হাস্যকর অনলস প্রয়াসের মধ্যে সমাজ ধ্বংসের বীজ লক্ষ্য করেন। ব্যঙ্গোক্তির মধ্যে কবির অগ্নিগর্ভ ক্ষোভ ঃ

এগারো, ক) দুটো মিল্ ও চলে-ধর্ম ঘটের উপায় নেই ;
জামাই যে তার নিজে ম্যানেজার,
খাদি প্রচারের মস্ত লীডার,
দেশের লীডার স্বনামধন্য ত্যাগস্মরণীয় তার বেয়াই।
বনিকের মানদণ্ডই রাজ দণ্ড তাই।
খ) হে মৈত্রেয়, আত্মীয় সোদর
সেই সুর মেগে
অঘমর্ষী জনতার উদ্‌গীথ—মুখর
এ কুৎসিত জীবনের ক্লৈব্যগামী স্বার্থপর ব্যর্থতা জানাই
বুস্তীরক তাই।
(জন্মাষ্টমি ঃ শ্রেষ্ঠ কবিতা (পূর্বলেখ)
১৯৩৭-৪১

অথবা

বারো, ১, পিসে তার বাঙলার প্রাচীন বিখ্যাত জমিদার,
মেসো তার দিল্লীশ্বর অর্থাৎ দিল্লীর মস্‌নদে
দক্ষিণে আসন তার আসমুদ্র বাহুর বিস্তার—
(টাইরেসিয়স ঃ নাম রেখেছি কোমল গান্ধার)
২, তবু বাঁচে দাস দাসী চাষী ও মজুর যত
আশ্চর্য জীবন।
(কোডা ঃ শ্রেষ্ঠ কবিতা (সাতভাই চম্পা)
১৯৪১—৪৪
৩, ক) লঙরখানার শান- বাঁধানো ভিড়ে
দেখি রে ভাই কলকাতার কেতা,
রাজা উধাও টাকশালের চিড়ে,
কোথায় লীগ মহাসভার নেতা।
খ) আমার মাটি সোনালি সমতলে
ফিরেছি গাঁয়ে, চষি আপন মাটি,

বিশ্ব ছেয়ে প্রাণের আগুন জ্বলে,
ফসল বেঁধে বাঁধি প্রাণের ঘাঁটি ॥
(এক পৌষের শীত : শ্রেষ্ঠ কবিতা (সাতভাই চম্পা)
১৯৪১—৪৪

৪, এ মাহ ভাদরে ভরা বাদরের শেষে
চরিতে দেখাও জনগণ মনে মুখ।
মুক্তি। মুক্তি। চিনি সে তীব্র সুখ
সাত ভাই জাগে, নন্দিত দেশ-দেশ ॥
(সাতভাই চম্পা : ঐ (ঐ)

মানুষকে ভালবাসেন বিষ্ণু দে। জাতবিচার নেই তাঁর মনে, ভাবনায়। শহরে জীবনের বিলাস বাহুল্যের মধ্যে আত্ম-তৃপ্তি পাননি। সহগ্রাম থেকে তুলে আনা জীবনের বন্যদ্যুতি লক্ষনীয় তাঁর অনেক কবিতায়। সরল জীবনের সাধ, আহলাদ একই ভূমি থেকে যেমন উত্থিত, তেমনি তার অভিব্যক্তির মধ্যেও আশ্চর্য মিল থাকার কথা। বিষ্ণু দে তাই ব্যবধান ঘুচিয়েছেন, মানুষে মানুষে। বন্ধন মুক্তির দিন সমষ্টির স্বেদবিন্দু ঝরার মধ্য দিয়েই আসবে। এমন আত্মদান বিফল হবার নয়। চোখে দেখা দেশ তার রূপ পাল্টাতে বাধ্য :

ভেরো, সিদো, কেন তুমি রক্তে করেছো চান ?
কানু, বলো তো কেন হুল্ হুল্' গান ?
—আপন জনেরই জন্যে রক্তে নাওয়া
তাই বিদ্রোহ গাওয়া
কেনে ডাকাতেরা আমাদেরই দেশ করে দিলে খান্ খান্।
(সাঁওতাল কবিতা : শ্রেষ্ঠ কবিতা (সন্দীপের চর)
১৯৪৪-৪৭

চোদ্দ, রাঁচি শহর দেখ রে ভাই
পল্টন কত হাঁটে
দেখি রে দেখি শুধুই গোরা
ফৌজ পথে ঘাটে।
(উরাওঁ গান : শ্রেষ্ঠ কবিতা (সন্দ্বীপের চর)

পনেরো, দারোগা সাহেব
এ কী সুখবর বদ্‌লী হলেন !
এক পয়সায়
তিনি কিনতেন মুরগি ও ডিম
দারোগা সাহেব ছাড়া আর কে।
এক পয়সায় বাজারে কিনতো কাপড় ?
[ছত্তিশ গড়ী গান : শ্রেষ্ঠ কবিতা (সন্দ্বীপের চর)]

সমাজব্যবস্থায় চাওয়া-পাওয়ার স্থান মাত্র ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সীমিত। গণ জীবন ক্ষমতা লোভীর পদতলে মাথা কুটেও সমবেদনা উৎসারিত করতে অক্ষম। স্মৃতি-স্তূপে তিক্ততার উদ্গীরণ কবি-প্রাণে সমব্যথার ঝংকার তোলে। ব্যক্তি-সুখে অখুশি বিষ্ণু দে-র সেই দুর্লভ আভাস :

ষোলো, ক) সেই লাল সেই রাত রঙার সিম্‌ফনি
জাগায় অমর প্রাণ ম্রিয়মান রক্ত স্নায়ু হাড়ে
মানুষের ইতিহাসে উদ্ভাসিত ঝঞ্ঝাময় চেতনায় ধমনী
খেতে ও খামারে কুটীরে টিলায় লাঙলের ঘায়ে

খ) আমারও অন্বিষ্ট তাই
অনুর সংহতি
আসুক জীবনে রঙে মানবিক আমি চাই আমরা সবাই
সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ইদ্রধনু ভেঙে দিই জীবনে ছড়াই
হে সুন্দর বাঁচাও বিস্ময়ে বিষাদে সম্ভ্রমে জীবনে আকাশ
অবকাশ বাঁচার আনন্দ চাই

গ) আমার কাজই হলো দিন আনা দিন গুনে যাওয়া
সোনা-সোনা ধান ভানা, সাইরেনের গান শুনে যাওয়া

অন্বিষ্ট : শ্রেষ্ঠ কবিতা (অন্বিষ্ট) ১৯৪৭-৪৯

অথবা সতেরো, তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া/তোমারই ঘাটের গাছে/ ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে-ঘাটে বাগানে-বাগানে। /জল দাও আমার শিবড়ে॥ /(জল দাও ঃ শ্রেষ্ঠ কবিতা (অন্বিষ্ট)

বাস্তব বাদী বিষ্ণু দে। স্বদেশ প্রীতির টানে আপন চেতনাকে সর্ব-কাল-জয়ী অস্তিত্বে প্রবাহিত করেন। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন খুঁজে ফিরে চলে ঃ

আঠারো, তবু তাকে খুঁজি সারাক্ষণ/খুঁজি সাধারণ্যে তাকে সাধা-রণে জনতায় চকিতে নিবিড়ে/দুর্গতির ব্যাপ্ত দায়ভাগে নিশ্চিন্ত আশ্বাসে/ জনগণে জনসাধারণে দেশের মানুষে/ (প্রচ্ছন্ন স্বদেশ ঃ শ্রেষ্ঠ কবিতা (নাম রেখেছি কোমল গান্ধার) ১৯৪৬—৫৩

অথবা উনিশ, উপোসীর চোখ মেলাও এখানে কাস্তের কাঁপা সবুজে/ তৃষ্ণার দিশা মিলুক কাঁঠাল ছায়ায় গভীর ইঁদারায়, / অনাচার হোক দূর স্মৃতি, কাজ মুক্তির খোলা প্রত্যহে।/ (ত্রিপদী ঃ শ্রেষ্ঠ কবিতা (ঐ)

বাস্তবের পথ চলতে চলতে কবি থমকে দাঁড়ান। তাঁর এই সাময়িক সংশয় ক্ষনিক ভ্রম। গভীর জীবন থেকে পুনরায় যাত্রা শুরু। মুক্তির ইশারা সমষ্টির কল্যাণে মুখর ঃ

কুড়ি, ক পালালাম ভয়ে ভয়ে মৃত্যু দেখা জীবিত সমাজে। /খ, মনে হলো মৃত্যু যেন মুষ্টি হানে প্রাসাদের ভিতে/ প্রচণ্ড আওয়াজে বজ্রে ভেঙে পড়ে তত্ত্বের দর্পণ ॥ (একজন দুঃস্বপ্ন ঃ শ্রেষ্ঠ কবিতা (ঐ)

দাসত্ব ও মুক্তির দুই চিত্রই বিষ্ণু দে দু' চোখে দেখেছেন। কোথাও সত্যিকার সুখ নেই যদি না সমাজের শাসন বিধির মধ্যে সুস্থতা ফিরে আসে। কৃত্রিমতার দাব-দাহ মানুষের স্বপ্ন ছাই করে। সুতরাং সমাজ বিপ্লবের পথ ধরেই বহুদিনের লালিত অভ্যাস ঠেলে গণবল্যাণ বাস্তব সত্য হয়ে উঠতে পারে বলে কবির প্রত্যয়। কবিতার সার্থকতা এসেছে শব্দিত, স্পন্দিত অভিজ্ঞানে ঃ

একুশ, জীবনের বাণী/ আনি গ্লানির তর্পনে আমাদেরও গ্লানি/ আমাদেরও পাপ তোমার এ মৃত্যু অভিশাপ/ এনে দিলে ঘৃণার

শপথ, ঘৃণা জিঘাংসু উন্মাদ ক্ষমতার প্রতিরোধে / মিলিত দুর্জয় তোমার পৌত্রেরা আর দৌহিত্র প্রপৌত্র অগণন / শোক আজ স্বচ্ছ স্রোত ক্রোধ, মৈত্রী খরতোয়া / জনসাধারণ /আমাদের বিদীর্ন হৃদয়ে ॥
(৩১শে জানুয়ারী ১৯৪৮ ঃ শ্রেষ্ঠ কবিতা (ঐ)

ক॰ মুখ্য কাব্য-সংকেত ঃ নজরুল ইসলাম

"এক ল্যাটিন কবি বলেছিলেন, "Homo sum humani nihil a me alienum puto – মানুষ, আমি, মানুষ সম্পর্কিত কোন কিছুই আমার কাছে উপেক্ষার বিষয়বস্তু হতে পারেনা"।

তাই শিল্পের অন্তিম বিষয়বস্তু মানুষ। এতোদিন মানুষ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু সে মানুষ ছিল ওপরতলার রাজা রাজড়া 'The princes and prelates' সভ্যতার যারা পিলসুজ যাদের গায়ে তেল গড়িয়ে পড়ে সেই সাধারণ মেহনতী মানুষ সকালে উঠেই যাদের মুখ দেখতে হয়, সৃষ্টির মধ্যে তারা ছিল অন্ত্যজ। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও আমরা দেখেছি এরই প্রতিফলন- শাসক ও সামন্তশ্রেণীর আস্ফালন। এই অপাংক্তেয়দের অনাদৃত জীবনের সুষমা ও গরিমার দিকে আলোকপাত করে আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গিমায় যিনি এনে দিলেন এক বিরাট পরিবর্ত্তন, তিনি প্রগতি– সাহিত্যের উদ্বোধক কবি নজরুল ইসলাম।" ১

নজরুল জনতার কবি। তাঁর পঁচিশটি 'কাব্যের'ক নির্বাচিত কবিতাংশে যে মানসিকতার পরিচয় তা অনুসরণ করলে দেখা যাবে কবির জন্য ভালোবাসার আসনখানি সাধারণের মনে আদর করে পাতা। সাম্যাশ্রয়ী কবিতাবলী মানবদরদী নজরুলের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঃ

এক. মোর বিদ্রোহ সাম্য সৃষ্টি, নাই সেথা ভেদ নাই।

(অভেদম্ ঃ নতুন চাঁদ)

১, আজহার উদ্দীন খান। বাংলা সাহিত্যে নজরুল। পৃ ঃ ২৭৫। ৪র্থ সং আশ্বিন ১৩৬৯। প্রকাশক ঃ ডি, এম, লাইব্রেরী ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা – ৩।

ক, ঝিঙ্গির (১৩৩৫), সঞ্চিতা (১৯২৮), চক্রবাক (১৩৩৬), প্রলয়শিখা রুবাইয়াৎ – ই – হাফিজ (১৩৩৭) কাব্য আমপারা (১৩৪০), নতুন চাঁদ (১৯৪৫), মরুভাস্কর (১৩৫৭), সঞ্চয়ন (১৯৫৫), শেষসওগত (১৯৫৮) অগ্নিবীণা (১৯২২), দোলন চাঁপা [১৩৩০], বিষের বাঁশী [১৩৩১], ভাঙার গান [১৩৩১], ছায়ানট [১৩৩১], পূর্বের হাওয়া, চিত্তনামা, সাম্যবাদী [১৩৩২], সর্বহারা [১৩৩৩], ঝিঙেফুল [১৯২৬], ফনিমনসা, সিন্ধু হিন্দোল [১৩৩৪]

কিংবা তুই, দরিদ্র মোর ব্যথার সঙ্গী, দরিদ্র মোর ভাই
আমি যেন মোর জীবনে, নিত্য কাঙালের প্রেম পাই
তাহাদের সাথে কাঁদিব, তা দেরে বাঁধিব বক্ষে মম ;
দরিদ্র মোর পরমাত্মীয়, দরিদ্র প্রিয়তম।

(দরিদ্র মোর পরমাত্মীয় : নজরুল রচনা-সম্ভার ১৯৬৫ পৃঃ ১৬)

'স্বরাজ পার্টির গঠন এবং পার্টির মুখপত্র 'লাঙল' (২৫ শে ডিসেম্বর ১৯২৫) পত্রিকায় প্রবেশকাল থেকে গণকাব্যের প্রেরণা লাভ করেন নজরুল। তাঁর অভিজ্ঞতা প্রসূতবাণী :

তিন' ক্ষুধাতুর শিশুচায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন
বেলা বয়ে যায় খায়নিক বাছা, কবি পেটে তার জ্বলে আগুন।
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়।
কেঁদে বলি ওগো ভগবান, তুমি আজিও আছ কি ? কালি ও চুন
কেন ওঠে নাক, তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর খুন ?

এই সাম্যবোধ কবির অন্তর্জাত। তাঁর কান্নায় ভীরুতার প্রকাশ ঘটেনি। এ কান্না অনাহারী - জঠরের বেদনা থেকে উৎসারিত। 'লাঙল' - এ সেই অভিজ্ঞতার সরব ঘোষণা :

চার, গাহি সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাঁধা ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু- বৌদ্ধ- মুসলিম- ক্রীশ্চান
গাহি সাম্যের গান।

মানুষের কালিমা মুছে দেবার তাগিদ আসে নজরুলে বিবেক দংশন থেকে। তিনি তাই সর্বহারা চাষী, মজুর, জেলে, কারিগরের দলে ভিড়ে প কৃত মানুষদের খুঁজে পান। সাম্যাশ্রয়ী কবিতাগুলো তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ :

[আজ] চারদিক্ হতে ধনিক বনিক শোষণকারীর জাত
[ওভাই] জোঁকের মতন শুষছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত।
[মোর] বুকের কাছে মরছে খোকা, নাইক আমার হাত
[আজ] সতী মেয়ের বসন কেড়ে খেলছে খেলা খল।

(কৃষকের গান : সর্বহারা)

সর্বহারা কাব্যের 'চোর ডাকাত' কবিতায় :

ছয়' রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট - রক্তইট-টে
ডাকু বণিকের কারখানা চলে নাশ করি কোটি ভিটে।
দিব্যি পেতেছ খল কলওলা মানুষ - পেষানো কল
আখ-পেষা হয়ে বাহির হতেছে ভুখারী মানব-দল।

অথবা 'শ্রমিকের গান' - এ

সাত, যত শ্রমিক শুষে নিঙড়ে প্রজা
রাজা উজির মারছে মজা
আমরা মরি বয়ে তাদের বোঝারে।
এবার জুজুর দল ঐ হুজুর দলে
দল্‌বিরে আয় মজুর দল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল।

হাতুড়ি, শাবল, কাস্তে প্রভৃতি বামপন্থী আন্দোলনের সাংকেতিক রূপবস্তু নজরুলের কবিতায় ব্যঞ্জনাধর্মী শব্দার্থে চিহ্নিত হওয়ায় স্পষ্টতই বোঝা যায় কবি সচেতন ভাবে বাম মতবাদী আন্দোলনের সামিল হয়েছেন। শব্দে শব্দে সাম্যবাদী বেদনা মানুষের লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে মুখর। সাম্রাজ্য, বাদী, মোল্লা - পুরুত শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় তিনি ক্ষুব্ধ! প্রথম মহাযুদ্ধের পর সৈনিক জীবন ত্যাগ করে কলকাতার নগর জীবনে মিশে যান কবি। এখানে দেখলেন সাধারণ মানুষের জীবন - যন্ত্রনার সঙ্গে দেশের মুক্তি - আন্দোলনের সবেগ ঢেউ।

"১৯১৭ সালে রাশিয়ায় যে সাফল্য মণ্ডিত বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমিক - শ্রেণীর মধ্যে যে জাগরণ দেখা দেয় নজরুলের চিত্তে তাহাও রেখাপাত করে।" ১

"১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে অসহ-যোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। মহাত্মাগান্ধী অসহযোগ আন্দোলন আন্দোলন সম্পার্কিত প্রস্তাবটি উতথাপন করেন। অসহযোগ আন্দোলন সমগ্র ভারতে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ ও আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই অসহযোগ আন্দোলনের সমকালীন যুগেই বাংলা কাব্য - সাহিত্যের ক্ষেত্রে নজরুল আবির্ভূত হন।

১, মধুসূদন বসু। নজরুল - কাব্য পরিচয়। পৃঃ ১৯। ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫।
প্রকাশক: সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা--৯

———অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সমগ্রদেশে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ তীব্র হইয়া উঠিতে থাকে। শ্রমিকদের মধ্যেও বিরুদ্ধতার ভাব সঞ্চারিত হয়। ১৯২১ সালে ভারতবর্ষের শ্রমিকদের মধ্যে ৪০০টি ধর্মঘট হয় এবং এই সকল ধর্মঘটের সহিত পাঁচ লক্ষ শ্রমিক জড়িত ছিল।" ১

"———রবীন্দ্রনাথ 'বসন্ত' গীতিনাট্য রচনা করিয়া উহা নজরুলকে উৎসর্গ করিলেন (১০ই ফাল্গুন ১৩২৯॥২২ ফেব্রুয়ারী ১৯২৩)। নজরুল তখন হুগলি জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। ———১৯২২ সালের প্রথম ভাগেই 'বিজলী' পত্রিকায় নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় (৬ই জানুয়ারী)। সাথে সাথেই কবিতাটি বাংলার যুব-চিত্তে এক দারুণ উত্তেজনা, উন্মাদনা ও আলোড়ন সৃষ্টি করে। এক মুহূর্তে নজরুল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলার যুব-চিত্ত জয় করিয়া লইলেন। তাঁহার 'বিদ্রোহী' 'কামাল পাশা' ও 'সাত্—ইল্—আরব' প্রভৃতি কবিতা অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করিল। রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়ে বিদ্রোহী কবির প্রতিভার দিকে তাকাইয়াছিলেন। ১৯২২ সালে ১১ই আগষ্ট নজরুলের সম্পাদনায় 'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রথম আত্ম—প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ এই ধূমকেতুকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানাইয়া এক আশীর্ব্বানী পাঠাইলেন। উহা 'ধূমকেতু' পত্রিকায় প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কবি লিখেছিলেন,

কাজী নজরুল ইস্লাম কল্যানীয়েষু

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ্ অগ্নিসেতু,

১, মধুসূদন বসু। নজরুল—কাব্য পরিচয়। পৃঃ ১৯-২৬। ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫। প্রকাশক ঃ সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মাগান্ধী রোড-কলিকাতা—৯

দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।
অলক্ষণের তিলক্ রেখা
রাতের ভালে হোক্ না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে।
আছে যারা অর্ধচেতন।

(২৪ শে শ্রাবণ' ১৩২৯) ১

'ধূমকেতু'র পূজা সংখ্যায় নজরুলের বিখ্যাত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশিত হয় (২২শে সেপ্টেম্বর ১৯২২)। কবিতাটির শুরু,

"আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল ?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারীর শক্তি-চাঁড়াল।
দেবশিশুদের মারছে 'চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা-আসবি কখন সর্বনাশী ?"

কবিতাটির শেষ কয় পংক্তি,

"অনেক পাঁঠা-মোষ খেয়েছিস, রাক্ষসী তোর যায়নি ক্ষুধা
আয় পাষানী এবার নিবি আপন ছেলের রক্ত-সুধা।
দুর্বলদের বলি দিয়ে ভীরুর এ হীন শক্তি পূজা
দূর করে দে, বল মা, ছেলের রক্ত মাগে মা দশভুজা।
সেইদিন জননী তোর সত্যিকারের আগমনী,
বাজাবে বোধন-বাজনা সেদিন গাইব নব জাগরনী।
'ম্যয় ভুখা হুঁমায়ি 'বলে আয় এবার আনন্দময়ী
কৈলাস হতে গিরি-রানীর মা-দুলালী কন্যা অয়ি।"

এই কবিতাটির জন্য নজরুল রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। ৮ই জানুয়ারী (১৯২৩) বিচারপতি সুইন হো'র আদালতে

১, শ্রীনেপাল মজুমদার। ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ। ২য় খণ্ড। পৃঃ ২১৩—২১৪। ১ম সং ১৯৬৩। প্রকাশকঃ মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কলিকাতা—১২

নজরুলের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু জেল-খানায়ও নজরুল স্থির থাকতে পারেন না।" ১

"জেল কর্তৃপক্ষের নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য নজরুল অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করেন। অনশনের সংবাদে অন্যান্য অনেকের ন্যায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও রবীন্দ্রনাথ বিশেষ বিচলিত হন। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলং-এ ছিলেন। অনশন ত্যাগ করার জন্য নজরুলের নিকট তিনি প্রেসিডেন্সী জেলের ঠিকানায় নিম্নোক্ত তার পাঠান—**'Give up hunger strike, our literature claims you'** কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই তারবার্তার কথা নজরুলকে একেবারেই জানিতে দিলেন না। রবীন্দ্রনাথের কাছে কর্তৃপক্ষ লিখিয়া পাঠাইলেন—**'Addressee not found'** বহুজনের সম্মিলিত দাবী ও প্রার্থনায় এবং সরকার কর্তৃক রাজবন্দীদের প্রতি ভাল ব্যবহারের প্রতিশ্রুতিতে অবশেষে নজরুল অনশন ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উনচল্লিশ দিন পর্যন্ত অনশন চলে; অনশনের চল্লিশ দিনে কুমিল্লার বিরজা-সুন্দরী দেবীর নিকট হতে লেবুর রস গ্রহণ করে তিনি অনশন ত্যাগ করেন। হুগলী জেল হতে নজরুলকে আবার বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।' ২

"অপর দিকে বাংলায় সন্ত্রাসবাদ ও কমিউনিষ্ট আন্দোলন পাশা-পাশি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯২৫ সালের শেষভাগে 'কাকোরী-ষড়যন্ত্র মামলা' ও 'দক্ষিণেশ্বর-বোমার মামলা' শুরু হয়। ১৯২৪ 'কানপুর কমিউনিষ্ট' ষড়যন্ত্র মামলা' হয়। রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্যে এদেশে ইতিমধ্যেই কমিউনিষ্ট চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ

১, শ্রীনেপাল মজুমদার। ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ। ২য় খণ্ড। পৃ ২১৩—২১৪। ১ম সং ১৯৬৩। প্রকাশক: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট। কলিকাতা—১২

২, মধুসূদন বসু। নজরুল-কাব্য পরিচয়। পৃ ৮। ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫। প্রকাশক: সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মাগান্ধী রোড। কলিকাতা-৯

লাভ করিতে থাকে। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ' ও এস, এ 'ডাঙ্গে প্রমুখের নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়। ১৯২৫ সালের শেষভাগে বাংলা দেশে হেমন্তকুমার সরকার' কুতুবউদ্দীন আহ্‌মদ, শামসুদ্দীন হোসায়ন, ও বিদ্রোহী কবি নজরুলের উদ্যোগে 'লেবার স্বরাজ পার্টি' (**The labour swaraj party of the Indian national congress**) গঠিত হয়। কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় কারাদণ্ড ভোগের অবসানের পরে মুজফ্‌ফর আহম্‌দ ইঁহাদের সহিত মিলিত হন। বলা বাহুল্য উঁহারা ছিলেন প্রচ্ছন্ন কমিউনিষ্ট। ২৫শে ডিসেম্বর এই সঙ্ঘের মুখপত্র 'লাঙল' পত্রিকা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম সংখ্যাতেই নজরুলের বিখ্যাত 'সাম্যবাদী' কবিতাটি এবং দ্বিতীয় সংখ্যায় 'কৃষকের গান' কবিতাটি বাহির হয়। উল্লেখযোগ্য এই 'লাঙল' পত্রিকা প্রকাশিত হইলে নজরুলের অনুরোধক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঐ জন্য পত্রিকার দুই পংক্তি লিখিয়া দেন,

"ধর হাল বলরাম আন তব মরু—ভাঙা হল
বল দাও ফল দাও স্তব্ধ হোক ব্যর্থ কোলাহল।"

উহা ঐ পত্রিকার প্রচ্ছদপটে প্রকাশিত হয়।" ১

উদ্ধৃত ইতিহাস—অংশে দেখা যাচ্ছে, নজরুলের কবিতা, গান অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে বড়ো প্রেরণা। জনচিত্তে তা উত্তেজনার তাপ বিকিরণ করে। প্রকারান্তরে প্রত্যক্ষ কোন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা না গ্রহণ করেও যুদ্ধ—প্রত্যাগত কবি গণজীবনের মুক্তির জন্য বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেন। শ্রেনী বৈষম্য ভাঙবার আন্তরিক প্রয়াসে বিস্ফোরিত তাঁর কবিতা ঃ

আট, ক) ···তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা? ঠুলি খুলে দেখ, প্রতিইঁটে আছে লিখা।

১, শ্রীনেপাল মজুমদার। ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ। ২য় খণ্ড পৃঃ ৩২১। ১ম সং ১৯৬৩। প্রকাশক ঃ মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

খ) বেতন দিয়াছ ? চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত 'ক্রোর পেলি বল ?

(কুলি-মজুর-সর্বহারা)

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সঞ্চিত ক্ষোভ কবিকে বিদ্রোহী করে তোলে। অন্য উদাহরণ সেই সত্যের। তুরস্কের মহাবীর 'কামাল' গ্রীকদের পর্যুদস্ত করে জয়ী হওয়ায় কবি উদ্দীপ্ত ঃ

নয়, ক) পরের মুলুক লুট করে খায়
ডাকাত তারা ডাকাত।
খ) দেশ বাঁচাতে আপনারি জান শেষ করেছে
বেশ করেছে ॥

(কামাল পাশা ঃ অগ্নিবীণা)

বিশ শতকের আগ্রাসী নীতিতেই কবি শুধু অসন্তুষ্ট নন্ ধর্মের গোঁড়ামীও কবিচিত্তে বিষক্রিয়া করে। মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ কবি তাই গণ-জীবনকে জাগিয়ে তুলে কর্মযজ্ঞে সমবেত করতে চান ঃ

দশ, জাতের চেয়ে মানুষ সত্য,
অধিক সত্য প্রাণের টান'
প্রাণ—ঘরে সব এক সমান।'

(সত্য—মন্ত্র ঃ বিষের বাঁশী)

প্রগতি সাহিত্যে মেহনতী জনতার অবাধ বিচরণ। নজরুলের কাব্য-গাথায় গণবিপ্লবের সেই শঙ্খ নিনাদ ধ্বনিত' প্রতিধ্বনিত ঃ

এগারো, মোরা ভাই বাউল চারণ
মানি না শাসন বারণ
জীবন মরণ মোদের অনুচর রে।

(যুগান্তরের গান ঃ বিষের বাঁশী)

অথবা

বারো, শোন্ অত্যাচারী ! শোন্ রে সঞ্চয়ী
ছিনু সর্বহারা; হব সর্বজয়ী ॥

ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম – মাঝ / নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ (অন্তর ন্যাশন্যাল সঙ্গীত : ফণিমনসা)

'উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল' – এরঅবস্থান ঘটলেই কবি প্রকৃতিস্থ হবেন। কাঙ্খিত সমাজ প্রতিষ্ঠার জীবন্ত প্রত্যয় নজরুলকে অশান্ত করে তোলে। তাঁর বিশ্বাস গণ জাগরণের মধ্য দিয়েই আসবে সাম্য এবং মুক্তি। যতদিন না সেই সত্য বাস্তবায়িত হবে ততদিন তাঁর লেখনী অবাধে পোষাকী ধর্ম এবং উৎপীড়কের আত্মসর্বস্বতার বিরুদ্ধে রক্তাক্ষরে লিখে রাখবে :

তেরো, মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত / আমি সেইদিন হব শান্ত / যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন – রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না / অত্যাচারীর খড়্গ – কৃপাণ ভীম-রণ-ভূমে রণিবে না – /বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত / আমি সেইদিন হব শান্ত। (বিদ্রোহী : অগ্নীবীণা)

" নজরুলের সাহচর্য ছাড়া মুক্ত বেপরোয়া যৌবনের প্রাণখোলা ভাষা সেদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি – রবীন্দ্রনাথের যৌবন বের্গসোঁর গতিবাদের সঙ্গে আত্মার ক্রমবিকাশবাদের সংমিশ্রণে তত্ত্বমূলক, সত্যেনদত্তে বন্ধনহীন যৌবনের উত্তাল উদ্দামতা ছিল না, মোহিতলালের যতটুকু ছিল তাও মানসিক গাম্ভীর্যে উদ্দেশ্য মূলক, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মধ্যে যৌবন ছিল সৌখীন বিতৃষ্ণা বাদের অবিশ্বাসের বেরা দিয়ে ঘেরা। নির্বাধ উদ্দেশ্যহীন বেহিসেবী জীবন – কল্লোলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নজরুলের দৃপ্ত কণ্ঠস্বর অব্যবহিত আঘাতের শক্তিতে তৎকালীন যুবক ও কিশোর কবি তাঁর থেকেই নতুন--কাব্যের ইঙ্গিত পাবেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই ।তাই আজ ও রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিদের মধ্যে তাঁকেই উজ্জ্বলতম সেতু বলে নির্দেশ করতে আমাদের এক মুহূর্ত দেরী হয় না।" ১

'বিদ্রোহী' – কবিতার সুর-সম্পদ নজরুলকে জনপ্রিয় করে তোলে। এবং সেই সুবাদে বিদ্রোহী-কবি নামে তিনি অদ্যাবধি পরিচিত। অথচ এই কবিতাকে কেন্দ্র করেই মোহিতলাল মজুমদার এবং তাঁর মধ্যে অপ্রীতিকর সম্বন্ধ গড়ে ওঠে।

১, আজহার উদ্দীনখান। বাংলা সাহিতে নজরুল। পৃঃ ৩২৩। ৪র্থ সং আশ্বিন ১৩৬৯ প্রকাশক : ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট / কলিকাতা – ৩

"১৩২১' পৌষ সংখ্যার 'মানসী' পত্রিকায় মোহিতলালের 'আমি' নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই 'আমি ক'-র সুর নিয়েই 'বিদ্রোহী খ' কবিতার সৃষ্টি; যদি ও দুজনের মানসধর্মের পার্থক্য রয়েছে, 'আমি ক'র মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ আর 'বিদ্রোহী-র সহাসবাদের সঙ্গে রয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক 'সচেতনতা। অথচ কাজী এই ঋণ প্রকাশ্যে স্বীকার করেননি।

– – 'শনিবারের চিঠি–'তে কাজীর 'বিদ্রোহী কবিতাকে ব্যঙ্গ করে বেনামে সজনীকান্ত দাসের 'ব্যাঙ্গ' কবিতা বেরুল। তরুণের দল কবিতাটিকে মোহিতলালের রচনা বলে মনে করেন। কাজী ও তাই মনে করলেন। ফলে মোহিতলালকে লক্ষ্য করে 'সাবধানী ঘন্টা' কবিতাটি ১৩২১-র কার্ত্তিকের 'কল্লোলে' তিনি লেখেন। মোহিতলাল এই কবিতাটি পড়েই ক্রুদ্ধ হন এবং প্রত্যুত্তরে 'দ্রোণগুরু' কবিতাটি লেখেন। মোহিত–নজরুলের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল এবং যার জন্য বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল তা কাজীর তরুণ বন্ধুদের ভুল বুঝবার ও বোঝাবার ফলে।

– – তবু নজরুলকে মোহিতলাল আজীবন ভালবেসেছেন"।২ নজরুলের চেতনা জুড়ে 'ভাবের' বোধের জোয়ার আসে দুই দিক থেকে। তারই সমন্বয়ে উৎক্রান্ত মনুষ্য প্রেমের সংগীত।

"নজরুলের কবি–মানস সেদিন দু'জন নেতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে-তাঁরা হলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও কমরেড মুজফ্ফর আহমদ।

ক, মোহিতলালের 'আমি' এবং 'খ' নজরুলের বিদ্রোহী'–র তুলনীয় অংশ ঃ

॥ক॥ 'আমিই মহামারী। রুধিরাক্ত কৃপাণ ষাঁড়ের অট্টহাসিতে
মৃত জনের শূন্য দৃষ্টি চক্ষুতারকায় আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইবে।'
(জীবন জিজ্ঞাসা পৃঃ ১৯৯)

॥খ॥ 'আমিই মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর।'

॥ক॥ আমি জগতে চেতনা দিয়া নিজে অচেতন।, (জীবন জিজ্ঞাসা)
পৃঃ ২০০

॥খ॥ 'আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন–চিতেচেতন।

॥ক॥ 'আমি ভীষণ–অমানিশীথের সমুদ্র, শ্মশানের চিতাগ্নি (জীবন জিজ্ঞাসা)
সৃষ্টি–নেপথ্যের ছিন্নমস্তা, কালবৈশাখীর বজ্রাগ্নি।' পৃঃ ১৯৯

॥খ॥ 'আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী।,

১, আজহার উদ্দীন খান। বাংলা সাহিত্যে নজরুল। পৃঃ ১৭-২০। ঐ

বারীন ঘোষের কাছে তিনি বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা নেন আর মুজফফর সাহেবের সংস্পর্শে এসে চাষী-মজুরদের অশ্রুসজল বেদনার সঙ্গে পরিচিত হন। সেদিন এঁরা দুজনেই তাঁর চেতনার মধ্যে বাসা বেঁধেছিলে। এঁদের সান্নিধ্য ও তখনকার পরিস্থিতি এবং প্রথম মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, মুসলিম সংস্কৃতির দুর্বার সাহসিকতা ও হিন্দু ঐতিহ্যের আত্মসমাহিত সাধনা তাঁর অফুরন্ত আশাবাদে গভীর সত্য নিষ্ঠায় মানবজাতির ভাস্বর ভবিষ্যতের অটুট আস্থায় এমন এক উপকরণ যুগিয়েছে যাতে করে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে রবীন্দ্র প্রবর্তিত ধারার বাইরেও জয়মানন্দ সুখে ভবধারাকে বলোত্তীর্ণ করে কবিতা লেখা যায় এবং লিখলে কবিতার জাত যায় না। এইখানেই তাঁর সৃষ্টি প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব।

– – তাঁর কবিতা প্রচলিত রাষ্ট্রীয় শাসন, সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কারদির মূলে যে কুঠারঘাত করেছিল, অন্যায়ের প্রতি দৃপ্ত বিরুদ্ধাচরণের জন্যই তিনি প্রগতির কবি এবং জনপ্রিয় কবি। গল্প - উপন্যাস—নাটকে তিনি ব্যর্থ, কবিতায় তিনি সার্থক, গানে সার্থকতর - ।' ১'

প্রত্যয়-শানিত শব্দগুচ্ছ সাজিয়ে ধ্বনি গৌরবে ঋদ্ধ কবিতায় গণজীবনে মুক্তির বার্তা পৌছে দেন নজরুল। এ সাম্যবাদ মানুষের কাছে কবির আন্তরিক উপহার। তাঁর সংকল্পের চড়া সুরে বুর্জোয়ারা সন্ত্রস্ত। তিনি অদৃষ্ট - নির্ভর নন। আত্মবিশ্বাসে উন্নত। তাই শোনাতে পারলেন:

চৌদ্দ, কালের চক্র বক্র গতিতে ঘুরিতেছে অবিরত/ আজ দেখি যারা কালের শীর্ষে কাল তারা পদানত ?/ আজি সম্রাট কালি সে বন্দী,/ কুটিরে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী।/ কংস - কারায় কংস- হন্তা জন্মিছে অনাগত/ তারি বুক ফেটে আসে নৃসিংহ, যারে করে পদাহত। (সব্যসাচী : সর্বহারা)

এই নির্ভীক জীবনবার্তা দলিত মানুষদের প্রেরণা স্বরূপ। নজরুল ও মোহিতলালের আত্মসচেতন মন ঘুরে ফিরে কখনো একই-সৃষ্টিধর্ম-পিঠে সমবেত:

পনেরো, কোথা চেঙ্গিস, গজনী মামুদ, কোথায় কালাপাহাড় ?/ ভেঙ্গে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা দেওয়া দ্বার।

তুলনীয়: ওরে ভয় নাই। মুকুটে তাহার নাগফণা-ছটা, মন্মথ--হার।/ কাল - নিশীথিনী লুকায় বসনে। - সবে দিল তাই নাম তাহার/ - কালাপাহাড়।

(কালাপাহাড় : মোহিতলাল মজুমদারের সুনির্বাচিত কবিতা)

১, আজহার উদ্দীনখান। বাংলা সাহিত্যে নজরুল পৃঃ ১০৮ - ১১২। ৪র্থ সং আশ্বিন ১৩৬৯ প্রকাশক: পূর্ব পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শক্তিমান পুরুষ এবং শক্তিময়ী প্রকৃতির মিলন থেকেই জীবনের আবির্ভাব। এই দেহতত্ত্ববাদ মোহিতলালের 'বুদ্ধ' কবিতাংশে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তবু তিনি দেহের মধ্যেই দেহাতীত ক্রন্দনকে 'স্মরগরল' কাব্যে প্রকাশ করে তাঁর মত পরিবর্ত্তনের ইঙ্গিত রেখে গেছেন। নিপুন শব্দের স্বকীয়তায় উজ্জ্বল মোহিতলালের কবিকর্ম কখনো নজরুলের কবিতায় মর্মরিত।

প্রকৃতির শক্তি প্রার্থনায় মোহিতলাল, নজরুল প্রকারান্তরে একই উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন, যা দুর্বলকে শক্তিধর সেনাপতির শৌর্যে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

মানবতার মুক্তি প্রত্যাশায় সেই বলিষ্ঠ অনুরাগ মূর্ত্তি পায় গণ বিপ্লবের প্রতীকরূপে 'কালবৈশাখী'—তে। রুদ্রের ভয়ংকর তাণ্ডবে নতুন প্রাণের আগমন। সেই নবজীবন ত্রাস সঞ্চারের ব্যূহ ভেদ করে আভির্ভূত হয়েই নিয়মের রাজত্বে ঃ

ষোলো, কাল-বৈশাখী আসেনি হেথায়, আসিলে মোদের তরু শিরে/ সিন্ধু-শকুন বসিত না আসি ভিড় করে আজ নদী তীরে।/ জানি না কবে সে আসিবে ঝড় / ধুলায় লুটাবে শত্রুগড় / আজিও মোদের কাটেনি ক শীত, আসেনি ফাগুন বন ঘিরে'। / আজিও বলিব কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া ওঠেনি মন্দিরে। (কাল বৈশাখী ঃ সন্ধ্যা)

মোহিতলালের 'কালবৈশাখী-'র প্রলয় ঝড়ে নজরুলের আকাঙ্খাই সংকেতিত। নজরুলের চিত্ররীতি মোহিতলালের কবিতাটিতে আশ্চর্যভাবে পূর্বধ্বনিত উভয় কবি কণ্ঠেই শক্তিবন্দনার অপূর্ব তাগিদ ঃ

'নববর্ষের পুণ্যবাসরে কালবৈশাখী আসে / হোক সে ভীষণ, ভয় ভুলে যাই অদ্ভুত উল্লাসে। / ঝড় বিদ্যুৎ বজ্রের ধ্বনি—/ দুয়ার জানালা উঠে ঝনঝনি/ আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। বুঝিতবু। প্রাণ ভরে আশ্বাসে। / (কালবৈশাখীঃ হেমন্ত গোধূলি)

সাম্রাজ্যবাদীর শাসনে দেশীয় শাসককুলের ওষ্ঠাগত প্রাণ। তারাও নিজেদের মাশুল ওয়াসিল করে নিতে ব্যস্ত। তাদের শিকার সমাজের বিপন্ন মানুষ। নানাভাবে পীড়ন ও প্রতারণার আশ্রয়

নিয়ে তারা ক্ষুধার গণ্ডময়-রাজ্য গড়ে তোলে। তারই গভীর রূপায়ণ নজরুলের কবিতায়। শাক-ভাতে শুধু বেঁচে থাকার নম্র প্রার্থনা মাত্র যাদের, তাদের দেউলিয়া করে দেবার শেষ সীমায় এনেও আত্মসর্বস্ব নির্দয় মানুষ কেমন পুঁজি বাদী-সমাজ গড়তে ব্যস্ত, তারই ব্যথাতুর জীবনালেখ্য এখানে-ঃ

সতেরো, বিপন্নদের অন্ন ঠাসিয়া ফোলে মহাজন-ভুঁড়ি / নিরন্নদের ভিটে নাশ করে জমিদার চড়ে জুড়ি। / (চোর ডাকাত ঃ সর্বহারা)

এস্থলে জসীমউদ্দীনের কবিতার আশ্চর্য মিল ঃ

রাম নগরের নায়ের মশায়, যম যেন বা স্বয়ং বসে /ভিটে নিলেম, ডিগ্রীজারী করেন বাকী খাজনা কসে। / সেলামী আর নজর আনা কিস্তি খেলাফ সুদের বোঝায় / ভুঁড়ির উপর বাড়ছে ভুঁড়ি, দিনে যতই দিন চলে যায়। (রামনগরের নায়ের মশাই ঃ শ্রেষ্ঠ কবিতা)

শুধু কথায় কলরব নয়; তাঁর কবিতার শব্দে বাক্যে স্তবকে শোষিত মানুষের 'ক্ষুধার অন্নে প্রাণের ঘ্রাণ'। আর সে কারণেই তিনি গণ প্রতিনিধি কবি। এক-দিকে নির্যাতিতের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তি, অপরদিকে শৃংখলিত মাতৃ-ভূমির বন্ধন ছিন্ন করার সবেগ তাড়না, নজরুলকে কবি-ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল। কাব্যের জগতে নজরুল অনিবার্য ধূমকেতুর মতো দেশ, জাতির সংকট মুহূর্তে আবির্ভূত ঃ

আঠারো, ক) আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুন ঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।
খ) আমি জানি জানি ঐ ভূয়ো ঈশ্বর দিয়ে যা হয়নি হবে তাও।
তাই বিপ্লব আনি বিদ্রোহ করি, নেচে নেচে দিই গোঁফে তা'ও।
(ধূমকেতু ঃ অগ্নিবীণা)

নজরুলের কবিতায় মনুষ্যের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সূত্র ধরেই সাম্যাশ্রয়ী ভাবনার উৎসার। মানুষের অসাধারণ কর্ম-বল সম্পর্কে কবির চিন্তার জগতে এক নতুন প্রত্যয় মুকুলিত। 'অগ্নিবীণা' হাতে নিয়ে পরাধীন ভারতবাসীর সামনে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। এই স্বদেশানুভূতির মূলে মনুষ্য প্রেমের। নজরুলের গভীর গণ-জীবন-প্রীতি ধীরে ধীরে 'বিষের বাঁশী' ফণি মনসা, সাম্যবাদী, ভাঙার গান, সর্বহারা, 'প্রলয় শিখা' প্রভৃতি কাব্যে ছড়িয়ে পড়েছে। 'অগ্নিবীণা'-য় গণজাগরণ, স্বাধীনতা লাভের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত, হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রত্যাশা, দেশপ্রেমের বিপুল পরিচয়।

এ সবের একত্রীকরণ তাঁর বিদ্রোহী-সত্তাকে অসহিষ্ণুতার উত্তাপে জাগায়ঃ

ঊনিশ, ক, গাহি সাম্যের গান- মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্। [মানুষ ঃ সাম্যবাদী সর্বহারা]

খ সাম্যের গান গাই।-
যত পাপী তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই।
(পাপ ঃ সাম্যবাদী / সর্বহারা)

গ, শোনো মানুষের বাণী,
জন্মের পর মানব জাতির থাকে না ক' কোনো গ্লানি।
(বারাঙ্গনা ঃ সাম্যবাদী / সর্বহারা)

ঘ, সাম্যের গান গাই-
আমার চক্ষে পুরুষ-রমনী কোনো ভেদাভেদ নাই।
(নারী ঃ সাম্যবাদী/সর্বহারা)

নজরুলের কবিতার কথা কখনো অশ্রুসিক্ত আবার রৌদ্র-দীপ্ত কখনো। ভাবাবেগে চালিত হয়েও শব্দাবলীর লক্ষ্যে পৌঁছবার নির্ভুল গতিবেগ। তাঁর উদ্দীপিত চেতনার প্লাবনে শব্দের ঘূর্ণাবর্ত কখনো কাব্যগুণ-বিনষ্টির কারণ হয়েও মনুষ্যত্বের পূজারী কবির ক্ষেত্রে সেই ত্রুটি প্রসন্ন ক্ষমার বিষয়।

নজরুলের লেখার একটা বড়ো গুণ এই যে, তাঁর কবিতার ভাষা 'জেলে বেলে মুটে মজুর' দের অনায়াসে বিষয় বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষমতায় গড়া। সে ভাষায় মুখে চালু কথার অভিধার জোর এত বেশি, তুলনায় তার লক্ষণ-ব্যঞ্জনাক্রান্ত পরোক্ষ- ভাষণের সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম এতই কম যে তা মেহনতী মানুষের কানের দিয়ে চট্ করে মর্মে পৌঁছে যাবার যোগ্য। সুকান্তকে মনে রেখেই বলব, এই বিশেষ গুণের কাব্য ভাষার এত প্রবল জনসাধারণী চরিত্র আর কোনো বাঙালী গণ কবির কলমে আজ পর্যন্ত নেই। গণজীবন নিয়ে কাব্য শিল্পের এই ঘটিত Communication ঘটিত সংকট নজরুলের কবিতায় সবচেয়ে কম।

গণ-দরদী কবির মানস নেত্রে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অটল হুংকারঃ

কুড়ি, আমরা নীচে পড়ে রইব না আর / শোন্‌রে ও ভাই জেলে / এবার উঠব রে সব ঠেলে। / বিশ্ব-সভায় উঠিল সবাইরে / ঐ মুটে-মজুর হেলে। এবার উঠব রে সব ঠেলে। (ধীবরের গান ঃ নজরুলের সুনির্বাচিত কবিতা)

কারণ সাধারণ মানুষ এতকাল যে অত্যাচার সহ্য করেছে তা সভ্যতার কলঙ্ক :

একুশ, রক্ত – মাংস খেয়েছে তোদের, কঙ্কাল শুধু আছে বাকী/ঐ হাড় নিয়ে উঠে দাঁড়া তোরা 'আজো বেঁচে আছি' বল্ ডাকি।'

[মুক্তি কাম : ঐ]

উদারচেতা প্রেমিক কবি নজরুল। তাঁর সেই প্রেম কখনো ব্যক্তিগত প্রেমিকের জন্য, কখনো গণ মানুষের জন্য শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠায়, আবার কখনো দেশমাতার উদ্দেশ্যে অথবা জবা ফুলের অঞ্জলিতে শ্যামামায়ের চরণতলে। জীবন ও জগতকে অসাধারণ আবেগে ভালোবাসার আশ্চর্য ক্ষমতা থেকে নজরুলের কবিভাষা জেগেছিল। কবির সেই খেয়াল—খুশিপ্রেমের একটা ধারা গণজীবনের মোহনায় মিশে গেছে বুদ্ধদেব বসুর মতে :

" বিদ্রোহী' পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিক পত্রে – মনে হলো, এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগ অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন – প্রাণ যা কামনা করেছিলো এ যে তা-ই, দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী।" ১

দেশের চরম দুর্গতির দিনে ভেদাভেদ ভুলে নজরুল সংহতি রক্ষার আহ্বান জানান মহৎপ্রাণের প্রতি :

বাইশ, আজ জাত – বেজাতের বিভেদ ঘুচি / এক হলো ভাই বামুন-মুচি / প্রেম – গঙ্গায় সবাই হলো শুচীরে। / আয় এই যমুনায় ঝাঁপ দিবে কে বন্দেমাতরম বলে – / ওরে সব মায়ার আগুন জেলে॥

(বাঙলার মহাত্মা : ঐ)

রক্ত পতাকার গানে – 'এ কবির বামপন্থী মনোভাবের পরিচয়। নির্যাতনের উষ্মা প্রকাশের ভাষা তপ্ত – রক্ত – বর্ণই হবে। বাঙালীর অসাড় চিন্তার জগতে স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনা ছড়াতে নজরুলের দৃপ্ত শব্দভাণ্ডার,

তেইশ, ওড়াও ওড়াও লাল নিশান। / দুলাও মোদের রক্ত পতাকা ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান। / ওড়াও ওড়াও লাল নিশান॥

(রক্তপতাকার গান : নজরুলের সুনির্ব্বাচিত কবিতা)

শত্রু চতুর্দিকে। জাতি – শত্রু, জাতি – শত্রু, দেশদ্রোহী – শত্রু, সাম্রাজ্য-শত্রু। কবি সাবধান হবার সংকেত দেন। শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে হলে

১, বুদ্ধদেব বসু। কালের পুতুল। পৃঃ ১৫০। ১ম সং ১৩৫৩। কবিতা-ভবন। কলি –

ঐক্যের প্রয়োজন। উপযুক্ত পথ প্রস্তুত করে সংঘবদ্ধভাবে এগোতে হবে। কবির বলীয়ান উচ্চারণে তারই প্রতিধ্বনি :

চব্বিশ, ঘরে ঘরে তার লেগেছে কাজিয়া / রথ টেনে আন্ আন্‌রে তাজিয়া/ পূজা দে রে তোরা, দে রে কোরবান। / শত্রুর গোড়ে গালাগালি কর আবার হিন্দু-মুসলমান। / বাজাও শঙ্খ' দাও আজান।

(যা শত্রু পরে পরে : ফণি-মনসা)

ঐক্যবদ্ধমানুষ বিপুল শক্তির অধিকারী। অথচ এক হওয়া ছাড়া এই শক্তির যথার্থ বিকাশ সম্ভব নয়। সুসংগঠিত ঐক্য নিয়ে স্বার্থপর ঐশ্বর্যমত্তের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। তাদের সংগৃহীত সম্পদ-সৃষ্টির মূলে যাদের দান, সেই সমগ্র মানুষের, বিক্ষুব্ধের দিন আজ। ন্যায্য অধিকার শক্তি দিয়েই ছিনিয়ে নিতে হবে। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে, সশস্ত্র বিপ্লব প্রয়োজন। প্রগতিশীল ভাবনা নজরুলকে সেইদিক থেকে উদ্বুদ্ধ করে।

"মানবের মানবত্বকে আশাঙ্কিত ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে সর্বমানবের সংহত চেষ্টার প্রয়োজন। মানবের সকল শক্তির আজ প্রয়োজন হইয়াছে সংহত হইয়া এই দুর্ধর্ষ ধ্বংস প্রচেষ্টার গতিরোধ করিবার। যাহার বাহুতে বল আছে, চিত্তে আছে যার ধীশক্তি ও ভাবুকতা, কণ্ঠে আছে যার বাগ্মিতা, লেখনী যার শক্তিমান-সকলের সমবেত চেষ্টার আজ প্রয়োজন, মানবের সভ্যতা' সংস্কৃতি ও প্রগতিকে দৃপ্ত শক্তির মূর্ত অকল্যাণের হস্তে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার।" ১

সে নির্দেশ এই অংশে পূর্বধ্বনিত :

পঁচিশ, ক) আমরাই গড়ি হাতুড়ি, শাবল, বন্দুক, তলোয়ার / আপনার পাণে ,চেয়ে, দেখি আজ হাতে নাই হাতিয়'র। / খ) মোদের প্রাপ্য আদায় করিব, কব্‌জি শক্ত কর; / গড়ার হাতুড়ি ধরেছি, এবার ভাঙার হাতুড়ি ধর।

(শ্রমিক মজুর : নজরুলের সুনির্বাচিত কবিতা)

মহামানবের আদর্শ দাঁড় করিয়ে এই শোষিত মানুষদের জড়বৎ প্রাণে-আশার আলো জেলে দিতে হবে। যুগ যেমন পাল্টায়, মনকে ও সে ভাবে

---

১ ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত- মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক। তয় খণ্ড। পৃঃ ৪৩ - ৪৪। (প্রগতির ভূমিকা-নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত) প্রথম প্রকাশ-বৈশাখ ১৩৮৫, এপ্রিল-১৯৭৮। বুকমার্ক, ৬ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট। কলিকাতা-১২

রূপান্তর করে আলো থেকে আরো আলোর উজ্জ্বলতায় নির্মল সত্য দর্শন করাতে হবে। সভ্যতা মাত্র আক্ষরিক অর্থ-বদ্ধ উচ্চারণ হয়ে মানুষের কর্মে ও কথায় প্রয়োগমূলক হয়ে উঠবে।

"অথচ এটা অত্যন্ত সাধারণ সত্য যে বঙ্কিম – মাইকেল – রবীন্দ্রনাথ – শরৎচন্দ্রের রচনা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তণের ক্রমাগ্রসর ইতিহাস। আজকে 'বিপ্লব 'গুণগত পরিবর্ত্তণের একেবারে উপান্তে এসে দাঁড়িয়েছে কোনো অত্যুৎসাহী সাহিত্যিককে বলতে শুনেছি, শরৎচন্দ্র প্রতিবিপ্লবী। কিন্তু একথা কেন আমাদের মনে থাকে না যে' কোনো শিল্পী – সাহিত্যিকের বৈপ্লবিক ভূমিকাকে তাঁর দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হয়? আজকের বিচারে মধুসূদনের কবিতা হয়তো অনেক দিক থেকেই অসম্পূর্ণ মনে হবে, মনে হবে তখনকার দিনে হয়তো 'ইয়ংবেঙ্গল' – এর ইংরেজিয়ানাকেই তিনি সাহিত্যে চালু করতে চেষ্টা করেছেন-তাঁর বিদ্রোহের সীমা ঐ পর্যন্তই। কিন্তু সমকালিক ইতিহাসকে যদি আমরা পড়ে দেখি, তাহলে দেখতে পাব কি বিরাট বিরোধিতা এবং ব্যর্থতার সম্ভাবনাকে সামনে রেখে তিনি এই নতুন পথে যাত্রা করেছিলেন। মধ্যবিত্ত জীবনের গ্লানি সংশয় ও হতাশাকে সর্বপ্রথম শরৎচন্দ্রই সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। শক্ত মুঠিতে কত বড় ঘা তিনি দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের ধারাবাহী আত্মতৃপ্ত রোমান্টিকতায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর Teargas জাতীয় ইংরেজী উপন্যাসের অনুসরণকে। এঁদের সকলের সমবেত প্রয়াসই সত্য করে তুলেছে আজকের গণসাহিত্যের ভবিষ্যৎ।" ১

নজরুল জানালেন :

ছাব্বিশ, হইল প্রভাত বিংশশতাব্দীর/নব – চেতনায় জাগো জাগো' ওঠ বীর। নব ধ্যান নব ধারনায় জাগো / নব প্রান নব প্রেরণায় জাগো / সমকালের উচ্চ তোলো গো শির / সব – বন্ধমুক্ত জাগো হে বীর।

(বিংশ শতাব্দীর : প্রলয়শিখা)

নতুন শতাব্দীর সূচনা থেকে মানুষ তার জীবনের মহৎ দায়িত্ব পালনের তাগিদ বেশী করে অনুভব করতে পারবে বলে কবির বিশ্বাস। দেশপ্রেম আর মাত্র কল্পলোকের রম্য স্বপ্নে আচ্ছন্ন না থেকে মানুষের কর্ম চৈতন্যে বিস্তৃত

---

১ ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত – মার্ক্সবাদী সাহিত্য – বিতর্ক। ৩য় খণ্ড। পৃঃ ১৫৪। প্রথম প্রকাশ – বৈশাখ ১৩৮৫, এপ্রিল – ১৯৭৮। প্রতিবিপ্লবী সাহিত্য – নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়। ঠিকানা পূর্বপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হবে। পদ্ধতি ও কর্মসূচীতে জীবনের কল্যাণ কামনা প্রতিটি মানুষের মনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে, বিশ্ব সংকটের অবসান ঘটবে। এই প্রত্যয় কবির মনে,

সাতাশ, নব-ঋত্বিক নবযুগের / নমস্কার। নমস্কার। / আলোকে তোমার পেনু আভাস / নওরোজের নব উষার। (শরৎচন্দ্র ঃ সন্ধ্যা)

কিংবা আটাশ, যুগে যুগে এই পৃথিবী গেয়েছে সেই মানবের জয়,/ বিলায়ে দিয়েছে মানুষেরে যারা স্বীয় সব সঞ্চয় / (মহাত্মা হাজীমোহাম্মদ মোহসিন ঃ নজরুল ইসলামের সুনির্বাচিত কবিতা)

কিংবা উনত্রিশ, তব দান-ভারে টলমল ধারে চাহে বিহ্বল আঁখি অঞ্জলিপুরি, দিয়া মহাদান, চক্ষেরে দিলে ফাঁকি।

(মনীন্দ্র প্রয়াণ ক ঃ ঐ)

কিংবা ত্রিশ, হে দেশবন্ধু হয় ত স্বর্গে / দেবেন্দ্র হয়ে তুমি / জানি না কি চোখে দেখিছ পাপের / ভীরুর ভারত ভূমি। (তর্পন খ ঃ ঐ)

নজরুলের কাব্য যৌবনের প্রশস্তি। এর মূলে জাতীয় জীবনের ভাবনা। সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার বিষময় কুশ্রীতা দর্শন করে কবি শঙ্কিত, ব্যথিত এবং পরিশেষে উত্তেজিত। সমাজের স্বার্থান্বেষী মুষ্টিমেয় মানুষ জীবনে জীবনে যে পর্বত প্রমাণ বাধার সৃষ্টি করেছে সত্যদর্শী যে-কেউ তা বরদাস্ত করতে চাইবেন না। একত্রিশ, বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে। দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে / রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা / তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা / বড় কথা বড় ভাব আসেনাক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাঁহারা আছ সুখে। (আমার কৈফিয়ত ঃ সর্বহারা)

নজরুলের চিত্তে সুখ ছিল না। সমাজ সচেতন কবি সর্বমানবের সুনিশ্চিত সুখের প্রত্যাশী। এই মানসিক অস্থিরতার জঠরে তাই তার কবিতার ক্ষুরধার বাক্য সমুদ্ভব হল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রার্থনায় ঃ

বত্রিশ, চাই না ধর্ম, চাই না কাম / চাই না মোক্ষ, সব হারাম আমাদের কাছে ; শুধু হালাল / দুশমন খুন্ লাল-সে-লাল ॥

(দুঃশাসনের রক্তপান ঃভাঙার গান)

ক, কাশীমবাজারের মহারজো স্যার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের তিরোধান উপলক্ষে লিখিত।

খ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের চতুর্থ বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে লিখিত।

কিংবা তেত্রিশ, লাথি মার, ভাঙরে তালা। / যত সব বন্দীশালায়-
আগুন জ্বালা, / আগুন জ্বালা, ফেল্ উপাড়ি' (ভাঙার গান : ঐ)
কিংবা চৌত্রিশ, সৃষ্টির কথা তুমি জান, দেব। এ ভীষণ পাপ-ধরাতে / পারি
না বাঁচিতে; এর চেয়ে ঢের ভালো তব হাতে মরাতে।
(শূদ্রের মাঝে জাগিছে রুদ্রঃ প্রলয় শিখা)

বিপদ বরণ করে নেবার আত্মবিশ্বাস নজরুলের। ঈশ্বর ভক্তি থেকে সেই প্রত্যয়ের জন্ম। তিনি জানেন অনাথের নাথ সেই সৃষ্টি কর্ত্তাই। এখানে একটা কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে,-কোনো সাম্যবাদী গণকবির এমন উত্তপ্ত ঈশ্বর বিশ্বাস বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আর দেখিনি। হয়ত কবিতা লেখার প্রকরণ অথবা উপকরণগত তাগিদে কেউ কেউ ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু ভগবৎ শরণাগতি এবং গণজীবনের যন্ত্রণাকে এমন একটি বিন্দুতে মিলিয়ে দেওয়ার সুষমা কেবল তাঁর লেখাতেই। নজরুলের ঈশ্বর-নির্ভরতা এবং গণজীবনর ভাবনা-কোনটীতেই ফাঁকি ছিলনা। তাঁর আকুল ভাবপ্রবণতার মৌলিক মানস বৈশিষ্ট্যের শুধু এই দুটি বিষয় প্রসঙ্গই নয়, ব্যক্তিগত জীবনের কোনো নারীর ভালোবাসার বিষয়েও তাঁর একই মাত্রার অভিনিবেশ। মানুষকে ভালোবাসার একটা অনন্যসাধারণ শক্তির পাত্রে তাঁর ঐসব আবেগ, কখনো একসঙ্গে কখনো পর্যায়ে পর্যায়ে, প্রবলরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। সেখানে ব্যক্তিগত প্রেমিকা আর যন্ত্রণাবিদ্ধ গণমানুষের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। সেখানে দেশপ্রেমের প্রসঙ্গ এবং ভগবৎ প্রসঙ্গ কবির হৃদয়াবেগের একই প্রযত্নে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব।

এবার উদাহরণ

পঁয়ত্রিশ ক) এই বিশ্বাসে, তোমার নামের মহিমায়-ফিরে পাব
শান্তি, সাম্য। তব দাস মোরা তব কাছে ফিরে যাব।
খ) ভোগীদের দিন অস্ত হউক, আসুক মোদের দিন।
[আর কতদিন ? : শেষ সত্তগত]

ঈশ্বরের কাছে আত্ম সমর্পণের মধ্যেও তাঁর উৎপীড়কের বিরুদ্ধে নালিশ। নজরুল হয়তো মনে করেন সকলের ভাল চাওয়ার মধ্যেই সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছাপূরণের সাধ। মানুষকে ভালবেসে ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায়। তবেই সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী :

ছত্রিশ' যৌবন-সেনাদল তব সখা, বন্ধু গো নাহি ভয়
পোহাবে রাত্রি গাহিবে যাত্রী নব আলোকের জয়।

(হবে জয় : নজরুল ইসলামের সুনির্বাচিত কবিতা)

নজরুলের শেষ ইচ্ছা 'সকাল-বেলার পাখী'--র মতো জনগণের ঘুম ভাঙাবেন 'ক্ষুধায়' কাতর ভাইগুলিকে,-প্রাণ দেবেন, 'পুরাতন পৃথিবীকে, স্মৃতিতে সতেজ রাখবেন, 'নয়া জমানার মিনারে মিনারে জীবনের আহ্বান' জানাবেন, ফলে 'বেদনার যুগ' অপসারিত হয়ে 'সাম্যের যুগ' আসবে, আর তখনি 'কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, 'যুগের ধর্ম এই'-। এর পর পরলোকে গেলেও সুখ, জনতার দরবারে তাঁর জীবন অনুভূত সত্য এমন করেই নিবেদিত :

সাঁইত্রিশ, আমার কণ্ঠ হইবে নীরব· নিখিল-কণ্ঠ-মাঝে / শুনিবে আমারি সেই ক্রন্দন, সে গান প্রভাতে সাঁঝে।

(আড়াল : ঐ)

স্বদেশ-প্রীতি, জন-প্রীতির মতো প্রত্যক্ষ বোধ নজরুলকে শুধু প্রেরণাই দেয়নি, তাঁকে নির্ভর জীবন মন্ত্রে শক্তিমান করে তুলেছিল। 'ভুবনভরা দুঃখ শোকে' কাতর না হয়ে 'সর্বদুঃখ মুক্ত-' হবার বাসনা। রবীন্দ্র-ভাষায় বলতে গেলে,

"বিপদে মোরে রক্ষা করো / এ নহে মোর প্রার্থনা- / বিপদে যেন না করি আমি ভয়।"

নজরুলের কবিতায় গণসংযোগের অজস্র আয়োজন। রচনায় আবেগের অতিরেক কখনো প্রকাশ পেলেও শক্তিশালী শব্দেগড়া ভাষায় স্বতোচ্ছ্বাসিত ছন্দের স্পন্দনে তা সুগঠিত। গদ্যের পথে তিনি তাঁর কবিতাকে ঠেলে দেননি। বরং তাঁর রচনাবলী পড়লে দেখা যাবে, সেখানকার গদ্যভাষা কতো অনায়াস আবেগে ছন্দের এলাকায় ঢুকে পড়েছে।

" এ সেই কণ্ঠ। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কিছু বলার ইচ্ছা ছিল না। ভদ্রতার খাতিরে একবার মাত্র বলতে গেলাম- 'অপূর্ব। গলার স্বর বেরল না। শিউলির চোখে পড়ল-আমার চোখের জল। সে তার দীর্ঘায়িত চোখের পরিপূর্ণ বিস্ময় নিয়ে যেন সেই জলের অর্থ খুঁজতে লাগল। "

(শিউলি মালা (ছোট গল্প) : নজরুল বিচিত্রা)

বক্তব্যধর্মী কাব্য রূপায়নের ভিতর কবি চড়াগলায় যথাসম্ভব ছন্দ - প্রেমিক শিল্প চেতনার পরিচয় দিয়েও 'ব্যথিত অশ্রু জলের মুকুরে তাঁর হৃদয়টিকে প্রতিফলিত করতে পেরেছেন। মুসলিম ও হিন্দু ঐতিহ্যের যুগলমিলনের ভাবোচ্ছ্বাস রাজনীতির দর্শনে অনুভাবিত।

তাঁর কবিতার আঙ্গিকে প্রবাহিত। তৎসম থেকে দেশজ আরবি, ফার্সি শব্দের আমদরবারেই তাঁর কাব্যের কোনো গরমিল ঘটেনি। বহু ভাষাভাষী দেশের প্রতিনিধি কাব্য কথায় নজরুলের সৃষ্টি, এদিক থেকে, গণচেতনার অভিমুখী বলতে হবে।

"বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ প্রসঙ্গের আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীতে। চর্যা পদ থেকে রামপ্রসাদের গান পর্যন্ত প্রায় সাতশ বছরের সাহিত্যে স্বদেশ সম্পর্কিত গান বা কবিতা নেই।

– – – দেশপ্রেম স্থান মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল পরাধীনতার বোধ থেকে – পরাধীনতার বোধ মূলতঃ হীনমন্যতার ও বেদনার বোধ এবং তার মধ্যেই হীনমন্যতা ও বেদনার প্রতিষেধক হিসেবে দেখা যায় দেশের যা কিছু মহৎ তার জন্য গৌরব বোধ এবং যা কিছু তুচ্ছ তার জন্য মমত্ব। স্বদেশপ্রেমের সাহিত্য তাই একই সঙ্গে হীনমন্যতাও বেদনা, গৌরব ও আশা, মমতা ও প্রীতির কথা

– – – স্বদেশ – চেতনা যখন বাঙালীর মনে বিকশিত হল তখন থেকেই শুধু কবিতায় নয়, গানেও তার আবির্ভাব ঘটল।" ১

সংগীতের রাজ্যেও অবাধ যাতায়াত ছিল বিদ্রোহী নজরুলের। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে স্বদেশী গীতিকারদের মধ্যে নজরুল ইসলাম অন্যতম। রাজশক্তিকে প্রত্যাঘাত করার উপযুক্ত সংগীত তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। সেই রসপানে দেশপ্রেমিক আত্মদানে উদ্বুদ্ধ। শত্রু দলনের দীক্ষামন্ত্রই নজরুল – সংগীতের প্রাণ। জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনেও তা যথেষ্ট প্রেরণাদায়ক। হিন্দু – মুসলমান নির্বিশেষে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হবার বাণীশিল্প তাঁর গান।

নজরুল – গীতিকার চিত্তকল্পে, উপমায় ব্যঞ্জ বিদ্রূপাত্মক ভাষায় স্বদেশী সঙ্গীতের অবাধ আবেদন গণজীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর দেশমাতানো গানের প্রাণীন উল্লাস দেশকর্মীদের জীবনে শৃঙ্খলমুক্তির প্রেরণা-স্বরূপ। এদেশে সে-সব গানের গণ-জাগরনী ভূমিকাটি স্মরণ করে নেবার জন্য কিছু রচনা উদাহৃত হল ঃ

১, গীতা চট্টোপাধ্যায় ঃ বাংলা স্বদেশী গান। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৩ (জানুয়ারী) পৃঃ (ভূমিকা IX – X)। প্রকাশক ঃ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, নয়া প্রকাশ, কলিকাতা – ৭০০০০৬ কর্তৃক মুদ্রিত।

আটত্রিশ
রাগ : পাহাড়ী মিশ্র
কার্ফা।

ক) এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবরে বিকল ॥
খ, তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে, করব তারে লয়।
মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব বরাভয়;
মোরা ফাঁসি পরে আনব হাসি মৃত্যুঞ্জয়ের ফল ॥
ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল—ঝঞ্ঝনা,
এ যে মুক্তি পথের অগ্রদূতের চরণ বন্দনা;
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হান্‌ছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল ॥
(—নজরুলগীতি, ৪র্থ খণ্ড গা ৩৬৯, পৃঃ ২২২)

উনচল্লিশ,
রাগ : কানাড়ামিশ্র
একতালা।

ক, উদার ভারত। সকল মানবে
দিয়াছ তোমার কোলে স্থান।
পার্সী জৈন বৌদ্ধ হিন্দু
খৃষ্টান শিখ মুসলমান ॥
তুমি পারাপার, তোমাতে আসিয়া
মিলেছে সকল ধর্মজাতি
আপনি সহিয়া ত্যাগের বেদনা
সকল দেশেরে করেছ জ্ঞাতি,
নিজেরে নিঃস্ব করিয়া, হয়েছ
বিশ্ব-মানব পীঠস্থান ॥
খ, বক্ষে ধরিয়া কত সে যুগের
কত বিজেতার গ্লানির স্মৃতি
প্রভাত আশায় সর্ব্বসহা মা
যাপিছ দুখের কৃষ্ণা তিথি,
এমনি নিশীথে এসেছিল বুকে
আসিবে আবার সে ভগবান।
(—নজরুলগীতি, ২য় খণ্ড গা—২৩৮ পৃঃ ১২১—১২২)

চল্লিশ,
রাগ : ঐ।

ক) কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী

ওরে ঐ তরুণ ঈশান বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীন প্রাচীর ভেদি।

খ, লাথি মার ভাঙরে তালা, যতসব বন্দিশালায়
আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা ফেল উপাড়ি।
—নজরুলগীতি ২য় খণ্ড (সম্পাদক আব্দুল আজীজ)
গা – ২৪০, পৃঃ ১২২ – ১২৩

একচল্লিশ ক, চল্‌ – চল্‌ - চল্‌।
রাগ : কোরাস্ উর্দ্ধ-গগনে বাজে মাদল নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
(মার্চের সুর)। অরুণ প্রাতের তরুণ দল / চল্‌রে – চল্‌রে – চল্‌।
চল্‌ – চল্‌ – চল্‌ – ।

খ, জাগিল তারা সকল,
জেগে ওঠ হীনবল।
আমরা গড়িব নূতন করিয়া
ধূলায় তাজমহল। চল্‌ চল্‌ চল্‌ ।।
নজরুল গীতিকা : (ডি, এম, লাইব্রেরী) পৃ : ২৪-২৫

বিয়ালিশ ক,
কোরাস : দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু দুস্তর - পারাবার
রাগ : বৃহন্নট কেদারা। লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।
একতালা। খ, অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী। আজি দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি – পণ।
হিন্দু না ওরা মুসলিম ?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী। বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।।

গ, ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান
আসি' অলক্ষে দাঁড়িয়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান ?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।।
– তরবারি / নজরুলগীতিকা, পৃঃ ১৭ – ১৮

তেতাল্লিশ, হায় পলাশী।
রাগ : মাঢ় - কার্ফা। এঁকে দিলি তুই জননীর বুকে
কলঙ্ক কালিমা রাশি

হায় পলাশী ॥
আত্ম ঘাতী স্বজাতি
মাখিয়া রুধির কুম্‌কুম্‌ ।
তোরই প্রান্তরে ফুটে ঝরে গেল
পলাশ কুসুম ।
তোরই গঙ্গার তীরে পলাশ-সকাশ
সূর্য ওঠে যেন
দিগন্ত উদ্ভাসী ॥

নজরুলগীতি, তয় খণ্ড গা – ৪৪৯ পৃঃ ৩০৪—৩০৪

উনিশ শতকে সেই বঙ্কিমচন্দ্রের কাল থেকে দেশজননীকে সামনে রেখে ('বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে – – – মন্দিরে মন্দিরে। ') সকল গীতিকার জনগন মনে মুক্তি চেতনার সঞ্চার করে এসেছেন। মাতৃসম্ভাষণে সমগ্রভারত বন্দিত। নজরুলের মতো সনামধন্য আরো অনেক সংগীতকারের সংগীতাংশ প্রসংগত উদ্ধৃতিযোগ্য। স্বদেশ প্রেমের মধ্য দিয়েই গণ প্রেমের উৎসার। দেশপ্রেমিকের আত্মদান, দুঃখবরণের অমোঘ বল কবির গীত – ভাষা থেকেই স্ফুরিত। শাসক – বিরোধী পদক্ষেপের দীপ্ত ও প্রত্যক্ষ তাড়না সৃষ্টিতে এবং উদ্বোধিত হবার Emotional Content হিসেবে এই সংগীতের ভূমিকা অভাবনীয়:

গোবিন্দচন্দ্র দাসের তুলনীয় অংশ:

(১)

রাগ: মূলতান – আড়াঠেকা

ক, স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে ? এ দেশ তোমার নয় ; –
এই যমুনা গঙ্গা নদী, তোমার ইহা হত যদি,
পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয় ?
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্মা ভরা চুনি মণি,
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয় ?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয়।

(২)

এই যে ক্ষেতে শস্য ভরা, তোমার ত নয় একটী ছড়া
তোমার হলে তাদের দেশে চালান কেন হয় ?
তুমি পাওনা একটি মুষ্টি, মরছে তোমার সপ্ত গোষ্ঠি,
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি – জগৎভরা জয়।

তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয়।
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এদেশ তোমার নয়,

(৩)

এই যে জাহাজ, এই যে গাড়ী, এই যে পেলস-এই যে বাড়ী
এই যে থানা জেহেলখানা- এই বিচারালয়,
লাট ছোট লাট তারাই সবে, জজ মাজিষ্টর তারাই হবে,
চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়-
বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয়।

মাতৃবন্দনা সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাধার্য (আরও অতিরিক্ত স্তবক আছে) পৃঃ ৫৮-৬০

মুকুন্দদাসের তুলনীয়

অংশ : ক, পণ করে সব লাগরে কাজে,
রাগ : ঐ ঐ খাটবো মোরা দিন কি রাত।
(এই) বাংলা যখন পরের হাতে
কিসের মান আর কিসের জাত॥
মারোয়াড়ী দিল্লীওয়ালা
উড়ে পার্শী ভাটীয়ারা,
তারা মোটর হাঁকে, চৌতালায় থাকে,
আমাদের নাই পেটে ভাত।
-চারণকবি মুকুন্দদাস, সম্পাদক জয়গুরু গোস্বামী

গান- ১৫, পৃঃ ২১৭

রাগ : বাউলের সুর। খ ১, ছেড়ে দেও কাঁচের চুড়ী বঙ্গনারী
কভু হাতে আর পরো না।
জাগ গো ও জননী ও ভগিনী
মোহের ঘুমে আর থেকো না॥
২, আমি অভাগিনী কাঙ্গালিনী
দুবেলা অন্ন জোটে না।
কি ছিলাম, কি হইলেম, কোথায় এলেম
মা যে তোরা চিনলি না। *

চারণকবি মুকুন্দ দাস, সম্পাদক জয়গুরু গোস্বামী গান- ৫২ পৃঃ২৪৯ *(মুক্তি-সংগ্রাম, রবীন্দ্রকুমার বসুও গানটি মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর বলে উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৬৮ - ৬৯)

গ, আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম
তবে ফিরিঙ্গী বণিকের গৌরব—রবি—
অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম।
শোন সব ভাই স্বদেশী
হিন্দু মোছলেম্ ভারতবাসী।
গারি কিনা ধরতে অসি
জগতকে তা দেখাইতাম॥
কথা শুনে প্রাণ যদি মজে,
সেজে আয় বীর সাজে।
দাস মুকুন্দ আছে সেজে
দাঁড়ি পেলে তরী ভাসাইতাম।
ঐ—গান—৬৫ পৃঃ ২৬১

ঘ, ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে
রাগ : ঐ মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে॥
তাথৈ তাথৈ থৈ ধ্রিমী ধ্রিমী দং দং
ভূত পিশাচ নাচে যোগিনী সঙ্গে।
দানব-দলনী হয়ে উন্মাদিনী,
আর কি দানব থাকিবে বংগে॥
সাজ রে সন্তান হিন্দু মুসলমান
থাকে থাকিবে প্রাণ না হয় যাইবে প্রাণ।
লইয়ে কৃপাণ হও রে আগুয়ান
নিতে হয় মুকুন্দে-রে নিও রে সঙ্গে।
ঐ—পৃঃ ২০৫

রাগ : টোরি ঙ, ১। বাবু বুঝবে কি আর মলে।
ঝুলন কাঁধে সাদা ভূত চেপেছে, একদম দফা সারলে॥
খেতে ভাত সোনার থালে
নাউ সেটিস্ ফাইড ষ্টীলের থালে
তোদের মত মূর্খ কি আর, দ্বিতীয়টি মেলে।
(২) মুকুন্দের কথা ধর, এখনো সামলে চল,
সাহেবি চালাকি ছাড়, যদি সুখ চাও কপালে।

বন্দেমাতরম্ বাজাও ডঙ্কা, জাগুক ভাই সকলে,
দেখে মুকুন্দ ডুবে যাক আজ, প্রেমময়ীর প্রেমসলিলে।
ঐ – গান – ২৫, পৃঃ ২২৭

চ, স্বরাজ সেদিন মিলিবে যেদিন/চাষার লাগিয়া কাঁদিবে প্রাণ।
তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে, / সপ্তমে তোরা তুলিবি তান।
– চারণ কবি মুকুন্দ দাসের গীতাবলী, সম্পাদক কালীপদ দাস
গান – ১০, পৃঃ ৭

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের তুলনীয় অংশ ঃ

রাগ ঃ খাম্বাজ – ক, লক্ষ্ণৌ ঠুংরি। আজ আয় আয় ভাই সব মিলে।
সাধিতে স্বদেশহিত আয় রে সকলে। / চিরদিন দুখে বসি
কি হবে কাঁদিলে, / একা অসহায় ভাই মোরা ধরা তলে/
হয় কি উদ্ধার কাজ এক নাহি হলে, /
হয় কি উদ্ধার কাজ প্রাণ নাহি দিলে, / আয় একবার
সবে দ্বেষ হিংসা ভুলে / আয় এই দুখনিশি দূরে
যাবে চলে।

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী ১ম (সাহিত্য সংবাদ) আর্য্য গাথা, ১ম গান –
১৮ পৃষ্ঠা ৪৮৩

খ, ১ কিসের শোক করিস ভাই – আবার তোরা মানুষ হ'।
রাগ ঃ বাগেশ্রী আড়া গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই – আবার তোরা মানুষ হ' ॥
পরের 'পরে কেন এ রোষ, নিজেরাই যদি শত্রু হস্?
তোদেরই এ যে নিজেরই দোষ- আবার তোরা মানুষ হ'।
২ জগত জুড়ে দুইটী সেনা পরস্পরের রাঙায় চোক্,
পুণ্য সেনা নিজের কর, পাপের সেনা শত্রুর হোক্,
ধর্ম যেথা সেদিকে যাক্ – ঈশ্বররে মাথায় রাখ,
স্বজন দেশ ডুবিয়ে যাক্ – আবার তোরা মানুষ হ' ॥
– দ্বিজেন্দ্র কাব্য – সঞ্চয়ন, সম্পাদক দিলীপকুমার রায় পৃঃ ২৫০ – ৫১

রজনীকান্ত সেনের তুলনীয় অংশ ঃ

রাগ ঃ বেহাগ—খাম্বাজ ক ১, ॥ সংকল্প ॥

তেওরা মূলতান-গড় খেম্‌টা। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় /মাথায় তুলে নে রে ভাই;
দীন – দুঃখিনী মা যে তোদের/তার বেশি আর সাধ্য নাই।

২ আয় রে আমরা মায়ের নামে /এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই,
পরের জিনিস কিন্‌ব না, যদি/মায়ের ঘরের জিনিস পাই

– কান্তবানী, রজনীকান্ত সেন, সম্পাদিকা দীপ্তি ত্রিপাঠি, পৃঃ ৪০ – ৪১

খ ১, ॥ তাই ভালো ॥

রাগ : জংলা – কাহারোয়া : তাই ভালো, মোদের / মায়ের ঘরের শুধু ভাত।
মায়ের ঘরের ঘি – সৈন্ধব,/মার বাগানের কলার পাত
ভিক্ষার চালে কাজ নাই, সে বড় অপমান ;
মোটা হোক সে সোনা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান।
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান।

২ ও ভাই চাষী, ও ভাই তাঁতী, আজকে সুভাত ;
কসে লাঙ্গল ধর ভাই রে, কসে চালাও তাঁত।
কসে চালাও ঘরের তাঁত।

– ঐ,—ঐ – ঐ পৃঃ ৪১

গ, ॥ তাঁতী ভাই ॥

রাগ : "রেগঞ্জামাই – প্রাতে দরশন – দে–" সুর কাহারোয়া।
রে তাঁতী ভাই, একটা কথা মন লাগিয়ে শুনিস্‌/ ঘরের তাঁত যে ক'টা আছে রে/
তোরা স্ত্রী – পুরুষে বুনিস্‌। / এবার যে ভাই তোদের পালা, / ঘরে বসে, কসে
মাকু চালা, / ওদের কলের কাপড় বিশ হবে রে- / না হয় তোদের হবে উনিশ।
তোদের সেহ পুরানো তাঁতে ; / কাপড় বুনে দিবি নিজের হাতে,
আমরা মাথায় করে নিয়ে যাব রে- / টাকা ঘরে বসে শুনিস্‌।
– ঐ – ঐ – ঐ – পৃঃ ৩৪ – ৩৫

ঘ, ১ ॥ মা ভৈ ॥

রাগ : কীর্ত্তনভাঙা সুর গড় খেমটা। আর কিসের শঙ্কা, বাজাও ডঙ্কা, হে মেরি গঙ্গা বো'ক;
মায়েরি রাজ্যে, মায়েরি কার্য্যে, ফুটেছে আজ যে চোখ।
২ হও, কর্মে বীর বাক্যে ধীর, মনের গভীর ভাব,
সে অপদার্থ, যে পরমার্থ ভাবে স্বার্থ-লাভ ;
মায়েরি রাজ্যে, মায়েরি কার্য্যে, ঘুচেছে আজ যে শোক,
হবে সমৃদ্ধি, শক্তি বৃদ্ধি, ছেড় না সিদ্ধি - যোগ।
– কান্তবানী, রজনীকান্ত সেন, সম্পাদিকা, দীপ্তি ত্রিপাঠী পৃঃ ৫০

ঙ ১ ॥ মিলন ॥

রাগ : সংকীর্ত্তন – গড় খেম্‌টা।

আয় ছুটে ভাই, হিন্দু – মুসলমান। / ঐদেখ। ঝরছে মায়ের দু নয়ান / আজ, এক করে সে সন্ধ্যা নমাজ মিশিয়ে দে আজ, বেদ কোরাণ। (জাতিধর্ম ভুলে গিয়ে রে) (হিংসা বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে রে) থাকি একই মায়ের কোলে, করি / একই মায়ের স্তন্যপান। / (এক মায়ের কোল জুড়ে আছি রে) (এক মায়ের দুধ খেয়ে বাঁচিরে) / আমরা পাশা-পাশি, প্রতিবাসী / দুই গোলারি একই ধান। (একই ক্ষেতে সে ধান ফলে রে) একই ভাতে একই রক্ত বয়ে যায়) / এক ভাই না খেতে পেলে / কাঁদে কোন ভায়ের প্রাণ? /(এমন পাষাণ কেবা আছে রে) (এমন কঠিন কেবা আছে রে) / বিলেত ভারত দুটো বটে, দুয়েরি এক ভগবান্। / (দুই চখে যে দু' দেশ দেখে না) / তার কাছে তো সবাই সমান রে)

ঐ – ঐ – ঐ – পৃঃ ৩৩ – ৩৪

অক্ষয়চন্দ্র সরকারের তুলনীয় অংশ :

॥ স্বদেশীর গান ॥

রাগ : প্রসাদী সুর- একতালা।

ক ১, মা আমি স্বদেশী হব। / ওমা বিদেশীর কাছে না যাব ॥
বিদেশীর বিষম মায়ায় কতকাল আচ্ছন্ন রব ?
তোর চরণ – ধূলি, শিরে তুলি, সে মায়া কাটিয়ে দিব।

২, লক্ষ্মীগোলায় লক্ষ্মীরূপার লক্ষ মন্দির উঠাইব,
তুমি অন্নপূর্ণা- তোমার ছেলে অন্নের জন্য না কাঁদিব ॥

অক্ষয়সাহিত্যসম্ভার - ২য় খণ্ড পৃঃ ৮১৯ ('বঙ্গভঙ্গ' উপলক্ষ্যে রাখীবন্ধন ও অরন্ধন দিবসে চুঁচুড়ার পথে পথে শোকযাত্রায় গীত হইয়াছিল)

অতুলপ্রসাদ সেনের তুলনীয় সংগীতাংশ :

রাগ : মিশ্র, কাহারবা

ক, হও ধরমেতে বীর, হও করমেতে বীর / হও উন্নত-শির. নাহি ভয়। / ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান সাথে আছে ভগবান - হবে জয়। / নানা ভাষা নানা মত, নানা পরিধান / বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান দেখিয়া ভারতে মহা জাতির উত্থান – জনগন মানিবে বিস্ময়।

তেত্রিশ কোটী মোরা নাহি কভু ক্ষীন / হতে পারে দিন তবু
নহি মোরা হীন / ভারত গগনে পুনঃ উদিবে সুদিন
ঐ দেখ প্রভাত উদয়। / ন্যায় বিরাজিত যাদের করে,
বিঘ্নপরাজিত তাদের শরে, / সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে/
সত্যের নাহি পরাজয়।

– ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন, সম্পাদক - মুখোপাধ্যায় এবং বন্দোপাধ্যায় পৃ : ৩৬৩

রাগ : ঐ খ, ১ মোদের গরব, মোদের আশা, আমরি বাংলা ভাষা।
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা।
কি যাদু বাংলা গানে। গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে
(এমন কোথা আর আছে গো)
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা ।।
২ ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে; ডাকনু মায়ে মা মা বলে;
ঐ ভাষাতেই বলবো হরি, সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা ॥

– ঐ – ঐ – ঐ – পৃ : ৩৬৩ – ৬৪

রাগ : মিশ্র খাম্বাজ গ ১ বলো বলো বলো সবে, শত- বীণা – বেনু – রবে,
ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে
ধর্মে মহান হবে কর্মে মহান হবে
নব দিনমণি উদিবে আবার, পুরাতন এ পূরবে।
২ এসো হে কৃষক কুটির নিবাসী / এসো অনার্য
গিরিবনবাসী / এসো হে সংসারী, এসো হে সন্ন্যাসী/
মিল হে মায়ের চরণে /এসো অবনত, এসো হে শিক্ষিত,
পর-হিত ব্রতে হইয়া দীক্ষিত / মিলহে মায়ের চরণে।
এসো হে হিন্দু, এসো মুসলমান / এসো হে পারসী,
বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান / মিল হে মায়ের চরণে।

ঐ – ঐ – পৃ: ৩৬১—৬২

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের তুললীয় সংগীতাংশ

রাগ : বাউলের সুর ক ১ মা গো যায়, যেন জীবন চলে, / শুধু জগৎ মাঝে
তোমার কাযে / 'বন্দেমাতরম বলে। / (যখন)
মুদে নয়ন, করবো শয়ন/ শমনের সেই শেষ কালে

তখন, সবই আমার হবে আঁধার / স্থান দিও মা
ঐ কোলে ॥ (আমার) যায় য বে জীবন চলে ॥

২ লাল টুপি কি কালো কোর্তা, / জুজুর ভয় কি
আর চলে ? (আমি) মায়ের সেবায় রইব রত
প্রাণব বলে দিক্ জেলে।। (আমার) যায় যাবে
জীবন চলে ॥

৩ আমি ধন্য হব মায়ের জন্য / লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের, বেত্রাঘাতে, কারাগারে/ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিলে ॥
(আমার) যায় যাবে জীবন চলে ॥

৪ বিশারদ কয় বিনা কষ্টে / সুখ হবে না ভূতলে
সে ত, অধম হয়ে সইতে রাজি / উত্তমে চাও
মুখ তুলে ॥ /(আমার) যায় যাবে জীবন চলে ॥

– ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন, সম্পাদক – মুখোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৩৪০ – ৪১

গিরিশচন্দ্র ঘোষের তুলনীয় সংগীতাংশ :

রাগ নটবেহাগ ক. কেন আর ভাবুহ অত দুদিন যাক রয়ে সয়ে।
– পোস্তা এস ভাই থাকি সবাই মায়ের ছেলে মায়ের হয়ে।
স্বদেশী কাপড় নিতে পেছিয়ো না ভাই দু' পাই দিতে
হার হবে না, যাবে জিতে দেশে টাকা যাবে রয়ে ॥
ভয় করো না চড়া দরে সস্তা হবে দুদিন পরে
তাঁত বসেছে ঘরে ঘরে সস্তা কাপড় দেবে বয়ে ॥
কাজ কি বিদেশী ধাঁজে কব্জিকারী কিনে বাজে,
আধা দিলে দেশের কাজে কেউ তো ভাই যাব নাক্ষয়ে
পড়ে থেকে পরের পায়ে পেটে ভাত নাই, বস্ত্র গায়ে,
মাথা দিতে আপন দায়ে ভীরু যে সে পেছোয় ভয়ে॥
দুখের তো নাই অবধি দেখি কিছু হয় হে যদি,
সইবো কত নিরবধি, যা' হবার যাক্ হয়ে বয়ে ॥

– স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় পৃ : ২৩৬ – ৩৭

– বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের তুলনীয় সংগীত কলি :

রাগ : মল্লার – ক চাই স্বাধীনতা, সাম্য চাই / গাই দিকে দিকে চারণদল
কাওয়ালীতাল। পীড়িত দলিত বন্দী নর / সবলে দুহাতে ভাঙো শিকল।

১৭৮

মুক্তির কভু নাই মরণ / কোটি-হিয়া-তলে তার আসন
সাম্যের জয় চিরন্তন / এই বিশ্বাসে রহ অটল।
শুভ পতাকা ফেলিয়া দাও / ঊর্দ্ধে উড়াও লাল নিশান/
শান্তির কথা ভুলিয়া যাও / প্রলয় নাচন নাচে ঈশান।
মরণ- পথের- পথিক বীর / ভীরুরা থাকুক আঁকড়ে তীর
তুমি বিদ্রোহী,তুমি অধীর / দিকে দিকে জ্বাল কাল অনল।

ভারতের স্বদেশী গান, কমলরায় চৌধুরী গান- ৫১ পৃঃ ৬০

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলনীয় সংগীতকলি :

রাগঃ রাগিনী বাহার ক লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে। / লুটিতেছে পরে
তাল জৎ এই রত্নের আকরে॥ / সাধিলে রতন পাই, তাহাতে
যতন নাই। / হারাই আমোদে মাতি অবহেলা করে॥
দেশান্তর-জনগন, ভুঞ্জে ভারতের ধন' / এ দেশেরধন হায়।
বিদেশীর তরে॥ / আমরা সকলে হেথা' হেলা করি
নিজ মাতা' / মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে।

সাহিত্যসাধক চরিত মালা ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ : ৫৪

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুললীয় সংগীতকলি

রাগ : নটবেহাগ ক, মলিন মুখ- চন্দ্রমা ভারত তোমারি / রাত্রি দিবা ঝরিছে
ঝাঁপতাল লোচন-বারি। /চন্দ্রজিনি কান্তি নিরখিয়ে ভাসিতাম আনন্দে/
আজি এ মলিন-মুখ কেমনে নেহারি। / এ দুঃখ তোমার
হায়রে সহিতে না নারি।

-ঐ-ঐ-পৃ : ১৫

জোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলনীয় সংগীতকলি :

রাগ : ঐ-ঐ ক আয় রে আয় দেশের সন্তান / গৌরবের দিন এসেছে ;
অত্যাচার ঐ দ্যাখ-গগনে / রক্ত-ধ্বজা তুলেছে ।
শুনিছ না ক্ষেত্র মাঝে / ভীষণ সৈন্যের হুঙ্কার ?
ওরা আসে বুকের পরে / করিতে স্ত্রী- পুত্র সংহার।
ধর অস্ত্র পৌরজন / কর ব্যূহ সংগঠন ,
চলো- চলো- মোদের ক্ষেত্রে / শত্রু রক্ত হোক্ সিঞ্চন।

ঐ- ঐ- পৃঃ ৫৬

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলনিয় সংগীত কলি : ॥ গাও ভারতের জয় ॥

রাগ : রাগিনী খাম্বাজ ক ১ মিলে সব ভারত সন্তান
তাল আড়াইঠেকা একতান মন-প্রাণ / গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান ?
কোন্ অদ্রি অভ্রভেদী হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শত-খনি কত মণি-রত্নের নিধান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়।

২ ভিষ্মদ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কী স্মরণ
পৃথুরাজ আদি বীরগণ। / ভারতের ছিল সেতু
রিপুদল--ধূমকেতু / আর্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়

৩ কেন ডর, ভীরু কর সাহস আশ্রয়
যতোধর্ম্মস্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল
মায়ের মুখ উজ্জ্বল হইবে নিশ্চয়।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয় ॥

– উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন, সম্পাদক – মুখোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৩১২ – ৩১৩

অশ্বিনীকুমার দত্তের তুলনীয় সংগীতকলি :

রাগ : সিন্ধুভৈরবী ক আজি মঙ্গল মোহন তানে ভারত যশ গাও রে,
একতাল স্বদেশের হিত লাগি প্রাণ ঢেলে দাওরে।
ও ভাই আর্য্য নামে, কি সম্ভবে, জীবনে দেখাওরে
নরনারী মিলি সবে ভারতবর্ষে আজি,
দেশের কাজের জন্যে রে ভাই স্বার্থ ভুলে যাওরে ॥

– বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী পৃঃ ৬৮৪

বিপিনচন্দ্র পালের তুলনীয় সংগীতাংশ :

রাগ : রাগেশ্বরী ক বাজায়োনা আর মোহন বাঁশী / আজি রুদ্ররূপে ভীমবেশে
জলদ তেতালা প্রকাশ পরাণে আসি ॥ / বন্ধ কর সব কুসুম গন্ধ
রুদ্ধ কর মলয় মন্দ।

শুষ্ক কর যত ললিত স্বচ্ছন্দ, প্রকাশি অট্টহাসি।
জীবন-মায়া আজি কর হে ভিন্ন
দয়া বন্ধন কর হে ছিন্ন
জাগাও সংহার জগত পূর্ণ প্রলয়- পয়োধি - রাশি ॥
দলিত কর হে চরণ তলে
সকল ভীরুতা সব দুর্ব্বলে
ভীম আসি ধরে, শ্মশানে মশানে, ভীষণ সাজাও আসি ॥

– হাজার বছরের বাংলাগান, সম্পাদক– প্রভাতকুমার গোস্বামী গান– ১৪, পৃ: ১২৪

অমৃতলাল বসুর তুলনীয় সংগীত

রাগ : বাউলের ক ১ ওরা জোর করে দেয় দিক না বঙ্গ বলিদান।
সুর আমরা রব অন্তরঙ্গ, এক্ অঙ্গে মনের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণ
আমরা জাত বাঙ্গালী প্রেম - কাঙালী, –
ভাবছিস্ তোরা মন ভাঙালি,
তা নয়, জালিয়ে আগন করে দ্বিগুন বাড়িয়ে দিলি প্রাণের টান।
আমাদের চোখ ফিরেছে মায়ের কুঁড়েতে,
বিদেশী চিনির চেয়ে দেশের গুড়তে
আবার কর্কচেতে হয়ে রুচি' চাইনে তোদের লবণ দান।
আমাদেরর ভাতের সংগে তাঁত বজায় যাক্
নাই বা দেখাই সাজের জাঁক্
তোদের, ওই চক্চক্যানি মধুর চাকে করবো না আর বিষপান
২ তোদের শাপে হল আশীর্ব্বাদ / দৃঢ় হল মনের বাঁধ
এই, বিসংবাদে বংগভেদে, আমরা হলুম আবার তেজীয়ান।
পেয়ে মর্মে আঘাত, কর্মেহাত বাকিয় ছেড়ে দেবে বুদ্ধিমান ॥

– হাজার বছরে বাংলা গান, সম্পাদক– প্রভাত কুমার গোস্বামী গান – ১১ পৃ: ১২০ – ১২১

বিজয়চন্দ্র মজুমদারের তুলনীয় সংগীত :

রাগ : ললিত, ক ১ আয় আজি আয় মারিবি কে ?
আড়া পিষিতে অস্থি শুষিতে রুধির নিশীথে শ্মশানে পিশাচ অধীর ?
থাকিতে তন্ত্র সাধন মন্ত্র প্রেত ভয়ে ছি ছি ডারিবি কে ?

মরার মতন না লভি মরণ, সাধকের মত মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মারিবি কে ?
অসুর নিধনে কিসের তরাস, পশুর নিধনে তোরা কি ডরাস্ ?
না গণি বিজন কানন ভীষণ বিপদ তারিবি কে ?
নিষ্ঠুর অরি সংহার করি বীরের মতন মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?
২ মাতি সৌরভে যশ গৌরবে অমর হইয়া মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?

– হাজার বছরের বাংলাগান, সম্পাদক– প্রভাতকুমার গোস্বামী
গান– ১৯, পৃঃ ১২৮ – ১২৯

দীনবন্ধু মিত্রের তুলনীয় সংগীত

রাগ : আড়ানা – ক হে নিরদয় নীলকরগণ। /আর সহে না প্রাণে এ নীল-দাহন ॥
বাহার, তেওট। দাহনের সুকৌশলে, শ্বেত – সমাজের বলে,
লুটেছে সকল ধন কি আর আছে এখন।।
দীনজনে দুঃখ দিতে, কাহার না লাগে চিতে,
কেবল নীলের হেরি পাষাণ সমাজ মন।
বৃটন-স্বভাবে শেষে, কালী দিলে বঙ্গে এসে,
তরিলে জলধি – জল পোড়া' – তে স্বর্ণভবন ॥

– ঐ – ঐ––গান – ২ পৃঃ ১১২ –

হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তুলনীয় সংগীতাংশ :

রাগ : ঝিঁকিট ক ১ সাবধান – সাবধান – / আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড
কাওয়ালি। রুদ্র দৃপ্ত মূর্তিমান "
২ অগণিত করে ঝলসে কৃপাণ তপ্ত রক্ত করিতে পান ;
বল দর্পির চরণ ঘাতে – / ত্রিভুবন ভীত কম্পমান "
ত্রিভুবন জুড়ি বিরাট দেহ ভেবেছ কি আর পলাইবে কেহ
এখনো চরণে শরণ লহ – / নতুবা নাহিকো পরিত্রাণ ॥

ঐ - ঐ - গান – ৩৩, পৃঃ ১৪৪ – ১৪৫

কামিনী রায়ের তুলনীয় সংগীত

রাগ : ঝিঁঝিট—ক ১ যেইদিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন / হাসি অশ্রু
কাওয়ালি। সেইদিন করিয়াছি বিসর্জন।

হাসিবার কাঁদিবারঅবসর নাহি আর
দুঃখিনী জনম-ভূমি, -মা আমার, মা আমার।

২ অতীতের কথা কহি, বর্ত্তমান যদি যায়
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়;
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার
মরিব তোমারি তরে,- মা আমার, মা আমার।
মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদ ময়, এ জীবন কেবা ধরে?
যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলঙ্ক-ভার
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ,—মা আমার, মা আমার।

—উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন, সম্পাদক মুখোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায়
পৃঃ ৩৫৬

স্বর্ণকুমারী দেবীর তুলনীয় সংগীত

(১)

রাগ: বেহাগ একতালা ক বন্দেমাতরম বলে আয়রে ভাই দলে দলে।
হইবে আগুয়ান, যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
মায়ের কাজে আত্মদান করব সবাই কুতূহলে।

(২)

বল ভাই বন্দেমাতরম্।
সাত সমুদ্রের ঢেউ তুফানে খেলুক গানের রং।
অস্ত্র নাইকো হাতে, (মোদের) ভাবনা কিরে তাতে।
ভক্তি মহাশক্তি ও ভাই আজো ভূতলে।
আয়রে ভাই আয়রে চলে, বন্দোমাতরম্ বলে।

(৩)

আমারা রক্ত বীজের ঝাড়,
মরণ মাঝেই গোপান মোদের সঞ্জীবনী বাড়।
চাইনা রক্তপাত (আমরা) কোর্কনা আঘাত,
ব্যর্থ করব অরির অস্ত্র ধর্ম কৃপা বলে।
আয়রে ভাই দলে দলে, বন্দেমাতরম্ বলে।

- গীতিগুচ্ছ, স্বর্ণকুমারী দেবী, গান-৩, পৃঃ ৩

সরোজিনী দেবীর তুলনীয় সংগীত ঃ

রাগ ঃ প্রসাদী সুর ক নিক্ না মোদের জেলে ধরে। / বিনে অপরাধে অবিচারে ॥
একতালা মাতৃমন্ত্রে নিয়ে দীক্ষা, পেয়েছি যে নতুন শিক্ষা
মা'র চরণ পেয়ে ভিক্ষা, ঘরের ছেলে ফিরব ঘরে।
ভারতের জয় বলে মুখে, জেল খাটনী খাট্‌ব সুখে ;
মার মূরতি রেখে বুকে, কাজ করিব হাতের জোরে ॥
জীবে জীবে ভগবান, সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান,
ওরে' মা মোদের সর্ব্বপ্রধান, বল্‌ব ইহা যারে তারে ॥
মার জিনিস পরে নেবে, কোন্ ছেলে সহিতে পারে ?
ছোট হয়ে আছি মোরা, সে দুঃখ আর বল্‌ব কারে।
সচেতন হও ভাই সকল, বলে পথিক সকাতরে,
ওরে, সুখ - দুঃখ সমান করি ঝাঁপ দিও কর্ম সাগরে।

- জাতীয় সংগীত, সরোজিনীদেবী গান - ১০ ,পৃঃ ৯ - ১০
সম্পাদক ঃ উপেন্দ্রনাথ দাস

ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীর তুলনীয় সংগীত ঃ

রাগ ঃ ইমনকল্যাণ, ক, আজ এস সবে গীত রবে বন্দি ভারতে।
তেওরা। মায়ের চরণ বিনা শরণ কোথায় মরতে।
দেশ বিদেশে যেথায় থাকি / দেশের মাকে মনে রাখি।
দেশের ভাই সব চলব নাকি মিলি একপথে ?
দেশ প্রেমের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়ে কল্যাণ রথে ॥
এই দেশের কোলে জন্মেছি যে, এই দেহ প্রাণ
মায়ের তরে অকাতরে করব নাকি দান ?
আবার মোরা মানুষ হলে / দেশের ছেলে ঐক্যবলে
বিপদ বাঁধা যাব দলে কি ভয় কার এহতে ?
তখন মায়ের নামে মানের আসন পাব জগতে ॥

- ঐ - ঐ --গান - ৬ পৃঃ ১৮ - ১৯

সরলা দেবী চৌধুরাণীর তুলনীয় সংগীত

রাগ ঃ খাম্বাজ ক ১ কোন্ রূপসাগরে ডুব দিলিরে বাঙ্গালী সেপাইরা।
তোদের দেখে চক্ষু জুড়ায় আমার মানিক ভাইরা।
দেখছি সুন্দর শিখ, মারাঠা, গোর্খা বীর,
এমন মোহন মূরতি সে নাই যে কোনটির

২, ভারতলক্ষ্মীর আশীষভরা তোদের মুখের আলোক্
বঙ্গলক্ষ্মীর আশায় গড়া তোদের রূপের ঝলক।
দেখে দেখে সাধ না মেটে পড়তে না চায় পলক
বাঙ্গালী সেপাইরা। আমার মাণিক ভাইরা।

গীত-ত্রিংশতি, সরলা দেবীচৌধুরাণী গান-৭ পৃঃ ১৬

"চর্যাপদ থেকে শুরু করে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণবপদাবলী, শ্যামা সংগীত পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য মূলত সংগীত নির্ভর। বাংলা দেশের লোকসংস্কৃতিও সংগীত সম্পদে সমৃদ্ধ। সারি. জারি, ভাটিয়ালী, বাউল, দেহতত্ব বিষয়ক গান-দীর্ঘদিন ধরে বাঙালী শ্রোতার সংগীত পিপাসা মিটিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত স্বদেশী গানগুলীও এই ধারারই অনুবর্ত্তন।

— —স্বদেশ গান সাধারণ মানুষকে স্বদেশী প্রেমে আহবান জানাল। এই আহবান স্বদেশীর ভাবের ক্ষেত্রে নয়, কর্মের ক্ষেত্রে। চাষী, জোলা, তাঁতী কর্মকার-সকলেই এই আহবানের লক্ষ্য ছিল। শহরে, গ্রামে, গঞ্জে, জেলায়-বিদেশীপণ্য বর্জনের ও স্বদেশী গ্রহণের আদর্শ প্রচারের সহজ ও দ্রুততম উপায় হিসেবে এই যুগের স্বদেশী গানগুলি গৃহীত হয়।" ১

অন্যান্যদের মতো গীতিকার কবি নজরুল, দেশপ্রেমীদের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর সংগীত ধারা অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে গণচিত্তকে উন্মুখ করেছিল। এই সব গান কণ্ঠে কণ্ঠে প্রতিধ্বণিত হয়ে সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষে দেশবাসীকে পৌছে দেবার ভাবসম্পদ। রবীন্দ্র অনুসৃত পথেই গীতিকারদের ভূমিকা পালিত হয়ে একটি ঐতিহাসিক অধ্যায় সৃষ্টি করে। একদা সমাজ জীবনে সেই উদ্গত আবেগ বিস্মৃত হবার নয়। শিল্পের ক্ষেত্রে এর মূল্য নিঃসন্দেহে সিকার্য।

"কাব্য বাস্তবের জগৎকে আবেগোদ্দীপকজাত সুর দিয়ে রঞ্জিত করে।
— — কাব্যে অবশ্য প্রত্যক্ষজাত বাস্তবের সাধারণ জগতে বাস করতে বাধ্য হওয়ায় অনুভূতি একটা সামাজিক রূপ লাভ করে। কাব্য আবেগের বাহ্যীকীরণ ঘটায়। সত্তা (self) প্রকাশিত হয়-তাকে প্রচলিত মুদ্রা করে তোলা হয়। অনুভূতিকে সামাজিক মূল্য দেওয়া হয়। কাজ সম্পাদিত হয়।

১, গীতা চট্টোপাধ্যায় : বাংলা সদেশীগান পৃঃ ২২৪-২২৬

– – সংগীতের স্বরগুলি (notes) নিজেরাই সংগীতের পরিস্ফুট অর্থ এবং সেইজন্য তারা ব্যাকরণের (বিষয়ীগত) নিয়ম মেনে চলে না। তারা ছন্দ – গাণিতিক (বিষয়ীগত) নিয়ম মেনে চলে।" ঐ

– – সুতরাং কবিতার মতো সংগীতও যে গণজীবনকে আপন করে নিতে পারে, তার স্বাক্ষর মনুষ্য প্রেমিক নজরুলের প্রান ঢালা রচনায়। দিলদরিয়া ভালোবাসার লেখনীতেই নজরুলের জনপ্রিয়তা ও সৃষ্টি-স্বার্থকতা।

ঐ, ক্রিস্টোফার কডওয়েল (অনুবাদ – রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।) ইলিউশ্যন অ্যাণ্ড রিঅ্যালিটি (বাস্তব ও বিভ্রম)। ১ম প্রকাশ ২৪ শে নভেম্বর ১৯৮২। প্রকাশক সুনীলকুমার ঘোষ এম, এ পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫/১ বি, বিধান সরণি, কলি – ৭০০০০৬। পৃঃ ২৫৯ – ২৬০, ২৫৬

২৫০ মূল্য কবি-সংখ্যা : প্রেমেন্দ্র মিত্র

—" মাটির ঘরে মাটির মানুষের ব্যথা গ্লানি জ্বালা অভিশাপ ' কলঙ্ক হতাশা আর কদর্য কলুষ ' চয়ন করে কবি যে প্রণামখানি বয়ন, করেছেন, 'সেই নমস্কার তোমারে অর্পিনু আজি হে জীবন — বিধাতা আমার ।'
প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবি ভাবনার মূল আত্মরতি নয়, মানবারতি ; জীবনকে তিনি দেখেন ভালমন্দ প্রেম প্রবৃত্তি আলো কালো মিলিয়ে সমগ্র দৃষ্টিতে । "১

প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি ।' পাঁক' উপন্যাসেই তাঁর প্রথম সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা । কবিতা ভিন্ন সাহিত্যের অন্য শাখাগুলোতেও তাঁর অবাধ বিচরণ । তবে কবিতাতেই মুখ্যতঃ তিনি জনপ্রিয় হলেও, গদ্য - পদ্যের সব্যসাচী ।

"... এই যুগে কেউই একক ভাবে বড় হতে পারেননি । তবু কবিকুল সকলে মিলেই যে একটা যুগ - একটা মহান জীবন বাণীকে বহন করছেন ও প্রকট করছেন — তা স্বীকার করতেই হবে । "২

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' (প্রকাশকাল : ১৯৩২ ৩২ টি কবিতা); 'সম্রাট' (প্রকাশকাল : ১৯৪০/২০ টি কবিতা); ফেরারী ফৌজ' (প্রকাশকালঃ ১৯৪৮/৩৩টি কবিতা) ; 'সাগর থেকে ফেরা' (প্রকাশ কাল ১৯৫৬/৩২ টি কবিতা', হরিণ চিতা চিল' (প্রকাশকালঃ ১৯৬০/৪০টি কবিতা) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের মুন্সীয়ানা বিশণতকে শুধু স্বকীয়তার গুণে চমকপ্রদই নয়, একটা বিশেষ ঘটনা । প্রেম, প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার রাজ্য ছেড়ে তিনি মর্ত্তের মনুষ্য প্রীতির দিকে বেশী ঝুঁকেছেন । তাই পথযাত্রীর ক্লান্ত, বিষন্ন মুখ দেখে মানবিক সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধাবোধের পরিচয়ে প্রেমেন্দ্রের কবিতা বাঙ্ময় । বেদনার্ত মানুষের যন্ত্রণা তাঁর কাব্যের পশ্চাৎ পটভূমি । গজদন্ত মিনারে বসে সুখ স্বপ্নে বিভোর না হয়ে কবি মাটির মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান গভীর আগ্রহে । ইন্দ্রিয় সচেতন প্রেমেন্দ্র মিত্র সাধারণের অস্তিত্ব স্বীকার করেই ক্ষান্ত থাকেননি, মানবাত্মার মূল্যবোধের সাক্ষর তাঁর কবিতায় প্রথম মুদ্রিত পংক্তিতে পংক্তিতে :

১, গুরুদাস ভট্টাচার্য । বাংলাকাব্যে শিব । পৃঃ ২১৮ । ১ম সং ৭ই আশ্বিন ১৩৮২ রচনাকাল (ডিসেম্বর ১৯৫১মে ১৯৫৬) । প্রকাশকঃ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ ৯৩ মহাত্মাগান্ধীরোড, কলিকাতা - ৭ ।

২, শুদ্ধসত্ত্ব বসু । আধুনিক বাংলাকাব্যের গতিপ্রকৃতি । পৃঃ ৪৮—৫১ । ১ম সংস্করণ কার্ত্তিক ১৩৮০ । মণ্ডলবুক হাউস প্রকাশক, সুনীল মণ্ডল ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধীরোড কলিকাতা — ৯

এক, নাম তার জানি নাকো
শুধু জানি ধরণীর ধূলিম্লান আশার প্রতীক
আছে এক করুন পথিক
– যুগে যুগে সব যুদ্ধে ফেরে-ফিরে-আসা
ক্লান্ত পথিক ।
(জনৈক : ফেরারী ফৌজ)

অথবা দুই/ক, রক্ত নয়, মাংস নয়
নয়, কোনো পাথরের মতো ঠাণ্ডা সবুজ কলিজা
মানুষের সংভাই চায় শুধু ফ্যান ।
তবুযেন সভ্যতার ভাঙে নাকো ধ্যান ।
একদিন এরা বুঝি চষে ছিলো মাটি
তারপর ভুলে গেছে পরিপাটি
কত ধানে কত হয় চাল,
ভুলে গেছে লাঙলের হাল
কাঁধে তুলে নেওয়া যায়,
কোনো দিন নিয়ে ছিলো কেউ ।

খ, অন্ন ছেঁকে তুলে নিয়ে,
ক্ষুধাশীর্ন মুখে যেই ঢেলে দিই ফ্যান,
মনে হয় সাধি একি পৈশাচিক নিষ্ঠুর কল্যাণ,

গ, রাজপথে কচি কচি এই সব শিশুর কঙ্কাল – মাতৃস্তন্যহীন,
দধীচির হাড় ছিলো এর চেয়ে আরো কি কঠিন ?
(ফ্যান : ফেরারী ফৌজ)

অ-শ্রুতপূর্ব কণ্ঠস্বর কবি – হৃদয় দর্শনের সৌভাগ্য ঘটায় । রেখে ঢেকে কিছু বলেননি তিনি । শব্দ চয়নে এবং বন্ধনে অখণ্ড জীবন স্পষ্ট চিন্তায় ধরা পড়েছে । সেখানে' জনৈক' প্রতীক । জনগণ আধারের কেন্দ্রে বিস্তৃত জীবন – প্রতাপ । তারই সার্বিক পরিচয় –

তিন/ক, আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের
মুটে মজুরের
– আমি কবি যত ইতরের ।

খ, সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি আর
খাল কাটি তাই, পথ বানাই
স্বপ্ন বাসরে বিরহিনী রাতি
মিছি সারারাতি পথ চায়
হায় সময় নাই ।
(কবি : প্রথমা)

এখানে মানব প্রেমিক কবি বলে প্রেমেন্দ্রকে চিনতে ভুল হয় না। সত্যাশ্রয়িতার মধ্যে ব্যক্তিক-প্রেম অকৃত্রিম দরদের কথা স্মরণ করায়। আবেগ এখানে শ্রুতিকটু নয় বরং মমত্বের বাহন। দুনিয়ার বোঝা বহনে তাঁর ক্লান্তি নেই, কবি-চিত্ত ও বিচলিতও নয়। আশাবাদীকবি 'সম্রাট' এবং 'প্রথমা' কাব্যে ছুতোর-কামার, কুলি--মজুরের জীবনের শরিক হবার ইচ্ছা নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করেছেন। শ্রমজীবি গোষ্ঠীর একজন বলে নিজেকে ঘোষণা করেছেন। সেই রাজ্যের অধিবাসী না হয়েও ঐ অংশে তাঁর হৃদয়ের বিস্তার সম্পর্কে পাঠকের আশ্বাস বাড়িয়েছেন। হৃদয়ের আলো ফেলতে ফেলতে যে অস্পষ্টকে ক্রমে সম্যক উপলব্ধির আধারে সুস্থির করা সম্ভব, প্রেমেন্দ্রের কবিতায় তারই নিশ্চিত পরিচয়।

নিদ্রা-ভঙ্গের কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। কবি পথিক। পাথেয় তাঁর নাম-গোত্র-হীন 'মুখ'। সবার চোখেই পড়ে মুখ। কিন্তু প্রেমেন্দ্রের দেখার মধ্যে বৈচিত্র্য। তাঁর দেখা স্বতন্ত্র। প্রতীকধর্মী কবির বুদ্ধিগ্রাহ্য কবিতাংশ প্রসঙ্গতঃ লক্ষনীয় :

চার/ক, রোদ দাও
এক ঘেয়ে এক রঙা ম্যাড়মেড়ে ছবি
আত্মার অরুচি ।
রোদ দাও
এ অশুচি মুছি।
খ, মুখ তার মনেও পড়ে না।
গ, মুখ তার কত মনে করি ।
মুখ তার আবছায়া অশ্রুর কুয়াশা ।
(রোদের প্রার্থনা : সাগর থেকে ফেরা)

প্রতিতুলনা ক, সুভাষ খ, জীবনানন্দ, গ, রবীন্দ্র নাথ এবং A ওয়াল্ট হুইট্ ম্যান-র কবিতায়ঃ

ক/১, ময়দানে মিশে গেলেও
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জন সমুদ্রের ফেনিল চূড়ায়
ফস্‌ফরাসের মত জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকল
মিছিলের সেই মুখ ।

২, অন্যসব মুখ যখন দুর্মূল্য প্রসাধনের প্রতিযোগিতায়
কুৎসিত বিকৃতিকে চাপার চেষ্টা করে,
পচা শবের দুর্গন্ধ ঢাকার জন্যে
গায়ে সুগন্ধি ঢালে,
তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই মুখ
নিষাষিত তরবারির মত
জেগে ওঠে আমাকে জাগায় ।
(মিছিলের মুখ : অগ্নিকোণ)

খ, তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে
মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন
সেই মুখ আর আমি রব এই স্বপ্নের ভিতরে।
(স্বপ্ন : মহাপৃথিবী)

গ, এই সব ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে –
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে।
(এবার ফিরাও মোরে : চিত্রা)

A/ i SAUNTERING the Pavement on riding the Country by – road, lo, such faces !

Faces of friendship, Precision, Caution, suavity, ideality, the spiritual – Precient face, the atways welcome Common benevolent face,

ii, Sauntering the Pavement thus. or Crossing the ceaseless ferry, faces and faces and faces,

I see them and Complain not, and am Content w'th all,

* * *

Do you suppose 1 could be content will all if 1 thought them their own finale ?

This now is too lamentable a face for man,

Some object Louse asking Leave to be, Cringing for it,

Some milk – nosed maggot blessing what lets it wrig to its hole,

(Faces : Leaves of Grass/From noon to starry night) Page : 36I

সুভাস মুখোপাধ্যায়ের 'মিছিলেরমুখ' কবিতা, হৃদয়ানুভূতির জলন্ত প্রকাশ। কবির দৃষ্টিপথে বুর্জোয়া এবং হতদরিদ্র গণশ্রেনী পাশাপাশি প্রতিফলিত। কেউ দারিদ্র মুক্তির আশায় প্রতিবাদে মুখর আবার কেউ বা বনেদী স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য 'দুমূর্ল্য প্রসাধনের' মাধ্যমে 'বিকৃতি চাপার চেষ্টা করে'। আর 'অপ্রতিদ্বন্দী সেই মুখ কবিকে 'তরবারির' তীক্ষ শক্তিতে জাগিয়ে দেয়।

জীবন-প্রেমিক জীবনানন্দ স্বপ্নের মধ্যে বস্তুর কাঙ্গালপনা ভুলতে চেয়েছেন কিন্তু কঠিন বাস্তব তাঁর চিন্তার জগতে দুর্ভাবনাকে সবলে হাজির করায়। তবু কোনো নির্মম বিষাদের ভিতর রোম্যান্টিক কবি তাঁর সুখটুকু নেড়ে চেড়ে বাঁচতে বিশ্বাসী।

রবীন্দ্রনাথ সর্বমানবিক লোকসমাজ প্রতিষ্ঠার কথা সপ্রত্যয়ে উচ্চারণ করেছেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন অখণ্ড জীবনের প্রতি কর্ত্তব্য-বিমুখ হয়ে কোন জাতিই সুস্থ সমাজের কথা ভাবতে পারে না। বঞ্চিত জন গনের স্বার্থরক্ষা ভিন্ন জীবন অসম্পূর্ণ। গণজীবনের মুক্তি সংগীত কবিতাটিকে অসামান্যতা দান করেছে।

ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান 'মুখ'--কে কেন্দ্র করে বাস্তবোচিত সকল অভিজ্ঞতার নির্মাল্য সাজিয়েছেন। সেখানে ভালমন্দ মিলে মিশে একাকার। কিন্তু কবি-প্রাণে তবু সংশয় বাসা বাঁধে। তাঁর জিজ্ঞাসা প্রতিধ্বনিময় : তিনি কি পরিতৃপ্ত ? বোধ করি তিনিও যথার্থ উত্তর খুঁজে পাননি। দর্শন করেও তুষ্টিলাভ হয় না। কারণ কোনো একটা পরিপূর্ণ প্রাপ্তি সম্ভব নয়। অমৃত গরলে মেশা এই জগতের স্বাভাবিক পরিবেশ। তারই বিচ্ছিন্ন ভাবনায় কবির চিত্তাকাশ আচ্ছন্ন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রত্যক্ষ রাজনীতিক কর্মী নন। তাঁর কাব্যের ভিতরেও সৌখিন গণচেতনা কখনো উঁকি দিয়ে যায় :

পাঁচ, তুমি আমি দুজনেই/ চোরা বালি—মগ্ন স্বপ্ন জেনেছি অনেক। বানচাল সংকল্পের/ এ ঘাটে হাল ভরা ডুবি।/ তবু ছুটি নিতে পারি কই?/ ফিরে ফিরে খেয়া বাই হাটে।/ (তোমাকে চিঠি ঃ সাগর থেকে ফেরা)

তবে, যন্ত্রণাকাতর মানুষকে দর্শন করেই কবির গণপ্রীতির জন্ম বিশ শতকের প্রথম লগ্ন থেকে সামাজিক সঙ্কট ও অবক্ষয় নিদারুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি শঙ্কিত, স্তম্ভিত। কারণ তিনি অরণ্যবাসী নন, জগতে মানুষের মাঝে ঘর বেঁধে রয়েছেন ঃ

ছয়/ক, সারাদিন ঘেষাঘেষি মানুষের ভীড়ে/ কত ছোঁয়া লাগে সারা হৃদয় শরীরে।/ খ, রাত হলে একা ঘরে এসে/ একে একে সব দাগ মুছে দেখি শেষে,/ একটি গভীর ছোঁয়া তবু লেগে আছে/ হৃদয়ের একেবারে কাছে। /(ছোঁয়া ঃ ফেরারী ফৌজ)/

প্রেমেন্দ্রের আত্মপ্রত্যয় মানব কল্যাণের এই সিদ্ধান্তে চালিত করে যে, স্বার্থ মগ্ন পরভোজী ঐশ্বর্যের চূড়া একদিন ভেঙে চুরে বিনষ্ট হবেই। চলতি পথে 'কচি কচি এই সব শিশুর কঙ্কাল, সজীব হয়ে কবির আবেগকে জনস্রোতে মিশতে প্রলুব্ধ করে। যাদের পরিচয় কবির কাছে নেই, অথচ সেই অসংখ্য মানুষের রক্তের 'পদচিহ্ন' ধরে তিনি অগ্রসর। এই অকপট তীব্র মনোচেতনা জীবনের আমেরু পার্থক্য ঘুচিয়ে দেয় ঃ

সাত, রক্ত এখনও দিতে হবে ঢের/ দিতে হবে আরো প্রাণ,/ মৃত্যুর তীরে জীবনের ধ্বজা ওঠাতে।/ সে—রক্ত কোন শোধ চায় না তো,/ শুধু দাবিহীন দান/ আগামী দিনের মুখে রক্তিমা ফুটাতে।/ (জীবনের জয়গান ঃ সাগর থেকে ফেরা)

জীবনের দাবী তিনি অস্বীকার করেননি। প্রেমেন্দ্রের কবি মন সেই সম্প্রতি কণ্টকিত সমস্যার বিচিত্র প্রকাশ ঘটিয়েছে কবিতায়। দৃশ্যক্ষেত্রে কবি মামসের দরদী—ছায়া। দুর্বল প্রাণীকুলের কথা তাঁর কবিতায় অজস্র। অচ্ছুত নয় বলেই, তাঁর অসামান্য অনুকম্পায়, এরা জীবনের মৌলিক অধিকারের চাহিদায় চঞ্চল ঃ

আট,ক ইঁদুরেরা সারারাত/ অন্ধকারে চরে।/ ঊর্দ্ধশ্বাস ছোটা আর রুদ্ধশ্বাস মাথা,/ দুরু দুরু বুক নিয়ে বিস্ফারিত চাওয়া/ইতস্ততঃ বিতাড়িত যেন সব/ ছোট ছোট হীন তুচ্ছ ভয়/ জীবনের সুবে গাঁথা তবু মৃত্যুময়/। খ, পাখিদের ঝাঁক/ সহসা ডানার শব্দে সচকিত করেছে প্রান্তর/ একবার চোখ তুলে ভীত এস্ত পায়ে/ এরা ফের খুঁজেছে বিবর/। (ইঁদুরেরা ঃ ফেরারী ফৌজ)//

জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষ সংখ্যায় অধিক। অজ্ঞান-তার অভিসম্পাত মাথায় নিয়ে এরাই 'চোরা-বালির' রাস্তায় প্রতি-নিয়ত কঠিন হোঁচট খায়। 'দল ছাড়া ঘুরে ফেরে দেশে আর কালে'। হৃদয়স্থ ক্ষোভ থেকেই সমষ্টির বিপ্লব, বিদ্রোহ। এরা জগতের রূপের বদল ঘটাতে সারে। এইসব 'পলাতকসেনা' জ্বলে উঠলে সুযোগ লোভী ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ বিহার এবং দুর্নীতি, স্বজন পোষণ কিংবা আরো কোন যত্নে লালিত দীর্ঘায়ত কৌশল পণ্ডশ্রম হবে।

চিরউপেক্ষিত জনগণ প্রেমেন্দ্রের কবিতায় প্রেম-চেতনার কেন্দ্রে-ভূমে বাসা বেঁধেছে। মহাকাল যেন নবীন সূর্যবীজ বপন করেছেন-তা অনগ্রসর জনজীবনের এক মহান প্রেরণা। তার তীব্র উজ্জ্বল আলোক ধারায় সকল ভাবনার মেঘ কেটে যাবে। তাদের বিষণ্ন দিন-গুলির জন্য কবিকে আর চোখের জল ফেলতে হবে না। তারই আভাস ঃ

নয়/ক, দেশে দেশে মানব-সত্যের যে সংশপ্তক কাহিনী/ আজও সাজছে নিঃশব্দে চরম সংগ্রামের জন্য,/ যুগে যুগে যারা সাজবে,/ তাদের মশালে সেই শিখারই আলো,/ তাদের পতাকায় তারই অম্লান দীপ্তি ।//

খ, মানবতার গভীর উৎস-মূলে/ অক্ষয় তার প্রেরণা/। হে হে মহাকাল, তোমার অনন্ত পারাবারে/ আমার ক্ষণিকের বুদ্ বুদ্/ তবু সেই সূর্য-শিখা যে আমাদের মাঝে/ প্রতিফলিত হয়,/ এই আমাদের গৌরম/। (সূর্যবীজ ঃ সাগর থেকে ফেরা)//

প্রেমেন্দ্রের নিত্রের 'প্রশ্নমনস্কতা' তাঁর গণপ্রেমের কবিতায়।

অখণ্ড জীবনের দুঃখ-কষ্ট কান্নায় অগ্নিস্ফুরিত কবিচিত্ত। অনির্বাণ ইচ্ছার কেন্দ্রীয় সুরে রয়েছে ভালবাসার স্পর্শ যা মনুষ্য প্রীতিকেই কবুল করে। 'রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ মজ্জা-' যুক্ত একটা বিশিষ্ট চরিত্র ধর্মী জীবন্ত মানুষ তাঁর কবি চেতনার জীবন কাঠি। মানবাত্মার সেই অর্থ উদ্ধারে প্রেমেন্দ্র সচেতন ঃ

দশ, মানুষের মানে চাই/ —গোটা মানুষের মানে। রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ মজ্জা,/ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসাসমেত— গোটা মানুষের মানে চাই। (মানে ঃ প্রথমা)

ভৌগোলিক জ্ঞান লাভের পর থেকেই মানুষ স্ব স্ব স্বার্থ দিয়ে নিজের সম্পদের চারিদিকে প্রাকার গড়ে। অথচ বিস্তৃত ভূখণ্ড অবাধ বিচরণের ক্ষেত্র হতে পারে, ভোগ-দখলের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। তবু নিরাপদ আশ্রয় কিংবা মাথা— গোঁজার স্থানের অভাব আজকাল অনেক হতভাগ্যের। মস্তিস্কের শক্তি-কৌশলে লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সুখ বস্তুটিকে আপন হাতের মুঠোয় ভরেছেন।ফলে গণজীবনে নেমেছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশংকা। এক-খণ্ড ভূমিও নির্দ্দিষ্ট গোষ্ঠীর একার দখলে।

অধিকার চিহ্নীকরণের এই কৃত্রিম বিধি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিমনে বিরাগ জাগায়। তিনি চ ন না কোন ব্রক সরল কিংবা বক্ররেখার ধারে মানুষ বিভক্ত হ'ক কিংবা মানুষের কাছ থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক। সেই বিশিষ্ট অনুভূতির প্রকাশ এখানে ঃ

এগারো, সেই অর্থ লাঞ্ছিত যে, তাই,/ আমাদের সীমা হলো দক্ষিনে সুন্দরবন/ উত্তরে টেরাই।/ (ভৌগোলিক ঃ ফেরারী ফৌজ)

প্রেমেন্দ্র মিত্র বাস্তব-অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ-কবি। তাঁর মনের দুঃখ ভাব-বিলাসের পলকে নিশ্চিহ্ন হয় না। আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় কবি এই সত্য কথাটিই গণজীবনের কানে বিনিদ্র রাত্রি শেষে পৌঁছে দেন ঃ

বারো/ক, তারা জানে পাকা পোক্ত যতখানি ভিত্/ জীবনের ততখানি জিত।/ খ, ওরা কেউ স্রোত চেনে, কেউ চেনে তীর,/ তারো চেয়ে আরো সুগভীর/ কে জানে পেয়েছে কিনা আর কোনো মানে।/ (নিঃসঙ্গ ঃ ফেরারী ফৌজ)

প্রেমেন্দ্রের কবিতায় নিঃসম্বল মানুষরাই বারবার এসেছে। এদের জীবনে মস্তিষ্কের শাসন মর্মান্তিক বিষ ছড়িয়েছে, হৃদয়ের শাসনে অগ্নি-মান্দ্য। আগ্রাসী শাসনের সেই প্রথা ভাঙ্গার প্রতিবাদ প্রেমেন্দ্রের কবিকণ্ঠে। 'রক্ত-পারাবার'-এর ফেনশীর্ষে 'আজ নতুন উষার' উদ্বোধন তিনি আশা করেন। এ কবির ভ্রান্তি নয়, ভূয়োদর্শীর ডুবুরী মনের শাশ্বত বিশ্বাস। **Romanticism** আর **Reahim**-এ মেশানো তাঁর অহংকেন্দ্রিক সতেজ চেতনা কবিতায় শরীরী হয়ে উঠেছে। পথচারী মানুষ চিরকাল নির্যাতনের শিকার হতে পারে না, চতুষ্পার্শ্বস্থ সংকটের মোকাবিলার পরিণামী শক্তি তাদের আসবেই। সুখের সঙ্গে বাসনার পরিচয় হবে, অবিকশিত কামনার কলি ফুটবে। এই আশাবাদ কল্পনা-গর্ভের ভ্রূণ নয়, এক আবির্ভূত সত্য। সেই ভাবনা শিল্প-সংশয়ের দেয়াল ভাঙ্গে। এই ঘোষণা প্রেমেন্দ্রের চূড়ান্ত বাণী। শব্দে দাহ নেই, জ্বালা আছে ঃ

১, একঘেয়ে ঘ্যানঘ্যানানিতে আসে সুপ্তি,/ হাত-পা এলিয়ে সময়ের স্রোতে ডুবদি। / মাঝে মাঝে তবু স্খলিত উচ্চারণ। / আর্ষ প্রয়োগে লঙ্ঘিত ব্যাকরণ। / অর্থ ছাড়ায় সনাতন সব ভাষ্য/, জীবন মানে না জৈব নীতির দাস্য। /
(ছক ঃ হরিণ চিতা চিল)

২, শিকারী চিতার মত; নয় শুধু শাণিত ব্যগ্রতা / ভীরু বিহ্বলতা এর সচকিত শাবকের মত/
(মেলা ঃ ঐ)

৩, তবু যেন দুরন্ত দুপুর/ একটি চোরাই সুখে নীলপদ্মে করে টলমল
(ট্রেনের জানালা ঃ ঐ)

৪, বজ্রগর্ভ মেঘ এক কালরাত্রে এসেছিল নগরের' পরে,/ ক্ষিপ্ত দানবের মতো ঘুরে ঘুরে কারে যেন করিল সন্ধান। (পলাতক ঃ ফেরারী ফৌজ)

৫, বার বার রাত্রি দিয়ে দিন যদি মুছি,/ হে পূষণ। কবে হবো শুচি ?
(পূষণ ঃ ঐ)

৬, প্রেম, হিংসা, ক্ষুধা—কিছু নয়/ –সীমাহীন শূন্যতার শব্দমূর্তি শুধু।
(কাক ডাকে ঃ ঐ)

৭, দুর্বল লোভের গ্রাসে লুঠ করে/ ভাঁড়ার ও মাঠ,/ তার পর কণা কণা রাত্রি মুখে করে,

ফিরে যায় আপন বিবরে।/ (ইঁদুরেরাঃ ঐ)

৮, এই তরবারি যার হাতে ঝলসায়/ ঘুম তার কেটে যায় সারা জীবনের,/ ঘুচে যায় সমস্ত বিশ্রাম। (ইস্পাত: ফেরারী ফৌজ)

৯, হিংসার ঝটিকা ওঠে/ ঢল নামে ভীতি আর মূঢ় বিদ্বেষের। (জনৈক: ঐ)

১০, অন্ন ছেঁকে তুলে নিয়ে/ ক্ষুধাশীর্ণ মুখে যেই টেনে দেই ফ্যান/ (ফ্যান: ঐ)

১১, সেখানে শরৎ নেই/ অর্থহীন হৃদয়ের সমস্ত সৌরভ। (প্রহসন: ঐ

১২, পৃথিবী এখনো ক্রূর/ ইতিহাস সঙ্কীর্ণ সর্পিল। (আছে: সাগর থেকে ফেরা)

১৩, হৃদয়ের শুষ্ক সরোবর/ ধুলো বালি জঞ্জালে ভরাট। শরৎ: ঐ)

১৪, আমার চোখের জল/ মোর দীর্ঘশ্বাস/ হতাশ, বেদনা/ (ফিরে যদি আসি: প্রথমা)

১৫, যে প্রলয়ে সব মহানগর যাবে ডুবে (কতরাত: সম্রাট)

১৬, যে পথ কুরুক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এল রক্তাক্ত।(কাঠের সিঁড়ি: ঐ)

রেখা চিহ্নিত শব্দগুলিতে তাপ বিকিরণ করেছেন কবি অথচ বিপরীত বেদনার প্রবাহে ভেসে চলেও নির্বাসন চাননি। একরোখা উগ্র মনোভাবের গোঁ নেই, কবিতা জুড়ে রয়েছে সমুদ্র প্রেমিক কবির প্রশান্তির ঝাঞ্ঝা। দরদী কবির মরমী সংগীত শোনা যাক:

তেরো ক, দ্বারা খোল, খোল দ্বার, রাত্রির প্রহরী।/ -কেঁদে কয় হতভাগ্য নিঃসম্বল মানবের দল/ কেঁদে কয় দিকে দিকে নিযুত জীবন।

খ, হে প্রহরী, হানো অসি নিশার মরমে/ যুগ যুগান্তের এই সঞ্চিত আঁধার কেটে যাক/ বেদনার উষ্ণ রক্তধারে;/ রক্ত-পারাবার হতে উদ্বোধন হোক আজ নূতন উষার।/ (দ্বার খোল: প্রথমা)

স্বাধীনতা-পূর্ব ভারত দেখেছেন কবি। দেখছেন স্বদেশী শাসকদের। যুগের লক্ষনগুলি বুঝে নিতে তিনি নিবিষ্ট। কবিতার পংক্তি

গুলো তাই একদেশদর্শী কোন শ্লোগানের উচ্চ-কণ্ঠ নয়। কখনো সংশয়-তিক্ত কবিমন মননধর্মী জিজ্ঞাসায় তির্যক ঃ

চোদ্দ/ ক, হে পৃথিবী, কোথায় যাব? ক্লান্ত। / আকাশে চাই, সেখানে উদ্ভ্রান্ত। / আমার মন, গহন বন, ফুরায় না।

খ, মেঘের রাত, মরুর দিন, তপ্ত / আঁধার আলো জেনেছি ভাবি সব তো। / ঝিমানো প্রাণ, কারো নিশান, উড়ায় না। /

(ক্লান্ত সাগর থেকে ফেরা)

পরাধীনতার গ্লানিতে প্রেমেন্দ্র পীড়িত। তাঁর অস্থি মজ্জায়, ঘৃণার হোবল। তাঁ সামর্থ্য সীমিত। দল নেই, তবু গণজীবনে একাই সমাজ চেতনা জাগাতে প্রয়াসী। ভাবছেন পরাধীনতার রাতটা কেটে যাক। অতীতে জমানো কলঙ্ক থেকে ভাবীকালের মানুষরা যেন মুক্ত থাকে। ভালবাসতে যেন তারা শেখে। হাসি যেন কৃত্রিমতার ঊর্দ্ধে ওঠে। সদর্থক উক্তি ঃ

পনেরো, পৃথিবীর ভাইবোন মোর/ এই বিলাপের গ্রহে, মোর কান্না রেখে যাই আজ/ একটি বাসনা আর। / পশ্চাতে আসিছে যারা/ তারা যেন ধরনীর এ কলুষ দেখিতে না পায়; / মোদের চোখের জলে শেষ হোক সব তাপ গ্লানি/ শেষ হোক মানব-আত্মার এই কাতর কাকুতি/ আমাদের বেদনায়। / তারা যেন সবে ভালবাসে। (প্রার্থনা ঃ প্রথম)

তাঁর অভিধানে তুচ্ছ বলে শব্দ নেই। পথের কাঁকর, খোয়া, পাথর সব কিছুই তাঁর মর্মের ধন। সাধের মানুষদের জন্য প্রাণ দিয়ে তিনি সেই কর্মে ব্রতী। এই পথ মানুষের মন মেলাবার সাঁকো। কবির প্রত্যয় জনগণমনে অনায়াসে চারিয়ে যায়। প্রেমেন্দ্রের মরমিয়া দ সমাজ চেতনার গর্ভজাত। অশান্ত হৃদয়ে হাহাকার নেই—বল্গাহীন চেতনার হিসেব দুর্মর প্রাণের চিত্রকল্পে মানবিক ঃ

ষোল/ ক, আজ এই রাস্তার গান গাইব-এই নগরের শিরা উপ-শিরাব। / এই রাস্তার ধূলি গান—। / -তার কাঁকর, তার খোয়া তার পাথরের/আজ কিছু তুচ্ছ নয়।

খ, যে মানুষ প্রথম পথ সৃষ্টি করেছিল মানুষের সঙ্গে মেলাবার জন্যে, তাকে নমস্কার।

গ, আমি পথ বানাই মর্ম দিয়ে—প্রাণ দিয়ে।

ঘ, এই পথ জীবনকে মুক্তি দেয়—অসমাপ্তির অসীমতায়।

(রাস্তা ঃ প্রথমা)

আভিজাত্য হল জাত বানানোর রুচিশীল কারসাজী। তাকে ঘিরে যারা স্বর্গ রচনা করেছে তারা মূঢ়, মানুষের শত্রু। কবির আধ্যাত্মিক চেতনা মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের চূড়ায় বিদ্রূপের বর্শা বিঁধিয়েছে। প্রেমেন্দ্র মনে করেন স্বয়ং সৃষ্টি কর্ত্তাই যেখানে গণজীবনের দলে নগ্নপদ সেখানে মানুষের বানানো গরিমা কোথায়। হতভাগ্যদের দু'হাতে ঠেলে রেখে সুখ নেই, কৃত্রিম লজ্জার মুক্তিও নেই ঃ

সতেরো, ওই কালিমাখা শ্রম—কঠোর ঘর্মাক্ত দেহখানি/ আলিঙ্গনের লোভে/ বহু যদি আপনা হতে প্রসারিত হয়/ সে কি লজ্জার কথা ?/ দেবতা যে পাঁওদল চলেছেন ওই/ নগ্নপদ কুলিদের সাথে ভাই—/ তিনি যে আজ আহ্বান করেছেন ওই পথের ধূলায়।

(পাঁওদল ঃ প্রথমা)

'গীতাঞ্জলি'—তে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রীতির সুর সর্বহারার 'ধূলামন্দির' রচনা করেছিল। শ্রমজীবী, কর্মীমানুষরা, ধূলিকাদা মেখে বারোমাস শ্রমদান করে। কবির বিশ্বাস ভগবানও কর্মযোগী ভক্তদের সাথে সহস্রবিধ কার্যে অংশ নেন। অন্যথায় তাঁর কর্মসূচি অর্থহীন হয়ে পড়বে। আত্ম-প্রেমিক স্বার্থপরদের গড়া কৃত্রিম চার দেওয়ালের ভিতর নির্মিত কোন দেবমূর্তির আড়ালে ভগবান নেই। তিনি প্রিয়জনের মধ্যেই সর্বক্ষণ উপস্থিত। সর্বজনের সেবার মাধ্যমেই ভগবৎসেবা সম্ভব। ভগবান বন্ধনহীন কর্মবীর। লোকসাধারণের শুভ সাধন ক্ষেত্রে তিনি নিত্য সঙ্গী। তাই কর্মবিমুখদের শুচিবস্ত্র ছেড়ে গণ জীবনের শরিক হবার জন্য কবি ডাক দিয়েছেন ঃ

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে/ করছে চাষা চাষ,/ পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ/ খাটছে বারো মাস।

(ধূলামন্দির ঃ গীতাঞ্জলি ১১০ নং কবিতা)

'পাঁওদল' এবং 'ধূলামন্দির' কবিতার সুরের সাদৃশ্যে ধরা পড়েছে মানব-সংহতির বাণী। আসলে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই! তবে দুর্বল শ্রেনীর প্রতি ভগবান যেন বেশী সদয়। উপেক্ষিত জনগণকে সাদরে গ্রহণ করাই তাঁর অপার করুণা লাভের একমাত্র পথ। শুদ্ধ শ্রমই জগৎ সৃষ্টির কারণ যেহেতু, সেখানে শ্রমজীবীকে আপন ভাবার সামাজিক ন্যায় **(Logic)**-কে ভগবান-ভাবনার অলৌকিক পথের মোড় ঘুরিয়ে এনেছেন রবীন্দ্র প্রেমেন্দ্র দুজনেই। গণচেতনা আর ভগবৎ বিশ্বাস মিশে গণবাদের একটা ভারতীয় সংস্করণ শাঁওদল কবিতায় প্রকাশিত।

মানুষের অবমাননায় বুভুক্ষুর ভগবান পীড়িত। তাই কবি সতর্ক করে দিতে চান। মিথ্যার প্রাসাদে নয়, ধূলিমাখা মানুষের মিলন-স্বর্গেই নিশ্চিত শান্তি। প্রেমেন্দ্রের বিশ্বাস সেই স্বপ্নে বিভোর। নবজন্ম লাভের প্রকৃষ্ট উপায় তিনি নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন। প্রীতির প্রতিফলন এইমিলন সংগমে উতরোল-ঃ

আঠারো, স্বপ্ন দেখি সে পথের/ অস্তাচল উত্তীর্ণ হয়ে আগামী কালের পানে/ স্বপ্ন যেখানে নির্ভীক/ বৃদ্ধের চোখে শিশুর বিস্ময়/ পৃথিবীতে উদ্দাম দুরন্ত শান্তি। (পথ ঃ সম্রাট)

কবিপ্রেমেন্দ্রের সাংবাদিক মন কথা সাজাবার দক্ষ যাদুকর। তাঁর সম্যক দেখার মধ্যে কথা তৈরীর অনেক তথ্য। ভালমন্দ সমানভাবে তাঁর চোখে পড়েছে। পুঁজির গাঁটছড়ায় বাঁধা এক শ্রেনীর শোষক কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। কিন্তু বঞ্চিত হতদরিদ্রদের 'কথা'-দিয়ে' এরা কি করতে পারলেন, এ প্রশ্ন তাঁর অন্তরের। দীর্ঘশ্বাসের ভিতর উপান্তর কবির গভীর অনুশোচনায় নিজেকে প্রত্যক্ষ করে নিজেই দগ্ধ। সমাজ না পাল্টালে দুঃখ মুক্তিগামী কবিত্ত এই দুঃসহ ভার হাল্কা হবে না ঃ

ঊনিশ, হাত দিয়ে হাত ছুঁই/ কথা দিয়ে মন হাতড়াই,/ তবু কারে কত টুকু পাই। সব কথা হেরে গেলে/ তাই দীর্ঘশ্বাস বয়।

(কথা ঃ ফেরারী ফৌজ)

মানব প্রেমিক কবি পর্যুদস্ত মানুষের কথা ভুলতে পারছেন না। পুর্ণজন্মকালে বিশ্বাসী কবি মনে করেন মৃত্যুতেই জীবনের শেষ নয়। তাই তিনি পরজন্মে এই মানুষদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হবার কথা ঘোষণা করেছেন। ভোগবিলাসের আকাঙ্খা তাঁর নেই, ইহা সচেতন কবি অস্ফুট আশার মুকুলগুলো পরজন্মে পুষ্পিত করে তুলবেন। আকণ্ঠপানে জগৎ ও জীবন কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। যদি ফিরে আসেন মর্ত্যজীবনে, তাহলে তিনি এবার আরও বেশি আলো, প্রেম নিয়ে আসবেন। প্রেমেন্দ্রের সেই চাপা বেদনা ঃ

বিশ, ফের যদি ফিরে আসি,/ আরো আলো চক্ষে যেন আসি নিয়ে/ বুকে আরো প্রেম যেন আনি;/ পৃথিবীকে আরো যেন ভালো লাগে। (ফিরে আসি যদি ঃ প্রথমা)

কবির প্রেম-তৃষ্ণার কথা শব্দ বন্ধে শোভন সুন্দর মাত্র নয়, পূর্বোক্ত কবিতার বাব্যে বাক্যে সুবোধ্য চিত্রগুলি আন্তরিক হয়ে উঠেছে ঃ

১, আমি পথ বানাই মর্ম দিয়ে—প্রাণ দিয়ে। অসীমতায়।

২ তবু যেন দুরন্ত দুপুর/ একটি চোরাই সুখে নীলপদ্মে করে টলমল

৩, চেয়ে চেয়ে দেখা যায়/ কত নিচে দূর সমতল।

৪, এ জোনাকি-মন যেন/ অকারণে ফোটে আর ঝরে,

৫, তবু নক্ষত্রেরা আর সমুদ্র সময়/ দিতে চায় যে প্রত্যায়/ সেই চোখে জানি মিথ্যা নয়

৬, তবু হে কালের অধীশ্বর/ হতাশ আমরা হব না।

৭, মানুষের সভ্যতার এ দুঃসহ ব্যর্থ প্রহসন/ কেন আর ?

৮, তবু জেনো আরো এক মৃত্যু-দীপ্ত মানে/ ছিলো এই ভূখণ্ডের —ছিলো সেই সাগরের পাহাড়ের দেবতার মনে।

৯, কোন দিন এ-হৃদয় হয় যদি একান্ত নির্জন,/ হয়তো পেতেও পারি পাখিদের মন/ —আর এক সূর্য সচেতন।

১০, অনো সব সূর্য কণা/ রাত্রি-মোছা চক্রান্তের প্রকাশ্য প্রান্তরে। —এবার অজ্ঞাতবাস শেষ হলো ফেরারী ফৌজের।

১১, সব কথা হেরে গেলে/ তাই এক দীর্ঘশ্বাস রয়।

১২, ইতিহাসের সমস্ত রক্তাক্ত অধ্যায়ের মতো/ প্রান্তরের ক্ষণিক কোলাহল/ রাত্রির অতল তিমিরে লুপ্ত।

১৩ রাজপথে কচিকচি এই সব শিশুর কঙ্কাল-মাতৃস্তন্যহীন,/ দধীচির হাড় ছিলো এর চেয়ে আরো কি কঠিন ?

১৪, চেতনার অন্ত্য পিঠে শুধু/ আজীবন বয়ে ফিরি সুগোপন এক অভিজ্ঞান ।

কবিতাকে এভাবে জনমনে পেঁছে দেবার সহজ সরল ক্ষমতা প্রেমেন্দ্রকে আধুনিক কবির পঙক্তিতে রেখেও স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। তাঁর কবিতার রাজ্য জীবনে যোগাযোগের সম্প্রসারিত পীঠস্থান। সাধারণের কবি হতে গিয়ে তিনি অসাধারণ হয়ে উঠেছেন। জনতাই তাঁর কাব্যে সম্রাট।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'গণ-ছড়া' কাব্য-কাননে' আর এক নতুন সংযোজন। ছড়া '~~Nuisance~~ Nonsense-Literature অথচ শিশু রাজ্য ছাড়াও এর আবেদন যে গণজীবনে ভাবান্তর আনতে সক্ষম, প্রেমেন্দ্রে-সুভাষ-র ছড়াগুলো তার উত্তম সাক্ষ্য। ছড়ার সুরে যেমন শিশু ভোলে, ছন্দের দোলায় নাচে, হাসে, আনন্দে আত্মহারা হয়, তেমনি এর কুচকাওয়াজী তালে লয়ে বয়স্ক মন কখনো প্রতিবাদী সঙিনের ইস্পাত ঝিলিকও দেখতে পায়। বিদ্রূপ-শ্লেষের মাধ্যমে ছড়ার এই সুর ধরে গণ-মনে প্রবল বিদ্রোহের তাপ ছড়ানো যায় :

একুশ/ক, ওপারে তিনটে দাঁড়কাক আর/ এপারে সাতটা শালিক/ মামলা লড়ছে—মাঝের নদীর/ কারা হক্কের মালিক।

খ, দু'দলে চেঁচায়, হেনকালে এক/ পান কৌটির ছা,/ মকদ্দমার ধার ও ধারল না।/ নদীর গভীরে/ আচমকা দিয়ে ডুব,/ মাছ নিয়ে যায়। জুলজুল চায়/ দু'পারে যত বেকুব।/

(মামলা : ছড়া যায় ছড়িয়ে)

বিচ্ছিন্নতা কিংবা বিভেদের শারীরী প্রতিমা এখানে সহজে নির্মিত। সুচারু ভাষায় উক্ত চিন্তার ফলাফল রক্ত মাংসের মানুষকে নিশ্চয়ই

ভাবায়। হেঁয়ালি শূন্য ছড়ার, গভীর অর্থ দ্বন্দ্ব-যন্ত্রনার চিত্ররূপ। লুঠেরা সুযোগ বুঝে চিরকাল চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করতে চায় এবং করেও। কালের সেই চরম সত্যসংবাদ কবির মনোভূমিতে স্থির এবং কল্যাণ চিন্তায় উন্মুখ।

ভুল পথে চলে আসল প্রয়োজন মেটে না। তাই আকাঙ্খা নির্নিমেষ চোখ মেলে রাখে। গণকবি সুভাষ মানব মনে অনুত্তোলিত বিশ্বাসকেই লাগসইভাবে ব্যবহার করেন প্রাণের টানে ঃ

ক/ক, বাড়া ভাতে ছাই দিল/ পাকা ধানে মই/ সেপাই এসে নিয়ে গেল/ বাপ দাদা কই/

খ, কেনরে সই কাঁদো/সাহসের বুক বাঁধো—

গ, ভরে গিয়েছে নৌকোয় নৌকোয়/ নদীর কিনার/ নিশান ওড়ে হাওয়ার তোড়ে/ মিছিল এগোয় শহীদ মিনার/ ফুলদানিতে ঠিকফুল/ হবে না আর দিক্ ভুল ॥ (দিক ভুল ঃ একটু পা চালিয়ে ভাই)

সুভাসের প্রত্যয়ের ভাষায় দৃঢ়তা এবং সংগত কামনা জীবনের গভীরে প্রবিষ্ট। আর প্রেমেন্দ্রে ছড়া এখানে উপোসী মানুষদের নিয়ে, মিথ্যা খেলায় মত্ত স্তাবকদের নগ্নরূপ দর্শন করায়। প্রথমটিতে অধিকার প্রতিষ্ঠার বিপুল সম্ভাবনা আর দ্বিতীয়টিতে রয়েছে দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অমানুষ তৈরীর করুন সমারোহ। ব্যঙ্গে বিদ্রূপে কবি প্রেমেন্দ্র দুর্জনের সক্রিয় প্রচেষ্টার ট্র্যাজিক চিত্র এঁকেছেন ঃ

বাইশ, পার করে দাও এই আকাল/ তিলের সুদে দেব তাল। খাজাঞ্চি যায় পালিয়ে/ টেঁকশালটা গালিয়ে। / যেতে যেতে খাজাঞ্চি বলে গেল খা আনছি। / কি খাওয়াবে ধান না তুষ ? / বললে,— শুধু খাবি ঘুষ। (আকালের ছড়া ঃ ছড়া যায় ছড়িয়ে)

ছড়া, গদ্যে বেমানান। প্রধান কারণ ছন্দ ভিন্ন এর সুর, তাল লোপ পায়। লিপি আবিষ্কারের পূর্বে ছড়া কাটা (**Cap verses**) হতো। সংগীতধর্মী বলে সব বয়সী মনকেই সহজে নাড়িয়ে দেয়। গণছড়া একটা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা। শিশু ভোলানো তার কাজ নয়, সামাজিক মানুষের কর্ত্তব্য নির্ণয় তার মস্তিষ্কের কাজ।

"শ্রমের চাকার সঙ্গে মানুষের সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে জুরে দেওয়ার

প্রয়োজন হয়, তার আবেগগুলিকে একত্রিত করে উপকারী, অর্থনৈতিক খাতে পরিচালিত করার প্রয়োজন হয়। যেহেতু এটা অর্থ নৈতিক অর্থাৎ সহজ প্রবৃত্তিগত নয়, সেই কারণে এই সহজ প্রবৃত্তিকে পরিচালিত করতেই হয়। যে উপকরণ সেগুলিকে পরিচালিত করে সেটা সেই কারণে মূলত অর্থনৈতিক।

এই আবেগগুলিকে একত্রিত করা যায় কি ভাবে? সাধারণ সামাজিক জীবনে শব্দগুলি প্রত্যেক মানুষের কাছে আবেগগত অনুসঙ্গ লাভ করেছে। এই শব্দগুলিকে সযত্নে নির্বাচন করতে হয় আর ছন্দোবদ্ধ বিন্যাস সম্ভব করে তোলে যাতে সেগুলিকে একত্রে সুর সহকারে আবৃত্তি করা যায় এবং যৌথ অস্তিত্বের সমগ্র সুস্পষ্টতা নিয়ে তাদের আবেগগত অনুসঙ্গগুলিকে মুক্তি দেওয়া যায়।" ১

সমাজ ছড়ার ঐ গতিশীল ভুমিকাকে প্রেমেন্দ্র মিত্র সার্থকভাবে সৃষ্টি করেছেন যৌথ কর্মপ্রীতি জাগাতে। বাক্যবাগীশদের মুখোশ খোলা দরকার। তাই কবির সতর্কবাণীঃ

তেইশ, বাকম্ বকম্ পায়রা বকম্/ আর কি বকম্? / উকিল বকম্,/ দালাল ফড়ে পাণ্ডা বকম্,/ বিধান সভায় দু-দল বকম্ মনুমেন্ট, গড়ের মাঠে/ নেতারা সব বকম্ বকম্। / বকম্ বকম্ নানান রকম্/ সব বকমের ওষুধ কি?/ বচন মেপে চুঙ্গি বসাও/ না হয় যদি সুবুদ্ধি। /

(বক্ বকম্ ঃ ছড়া যায় ছড়িয়ে)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছড়ায় তার সম্ভাবনা বিশদ। অন্তসার শূন্য প্রতিশ্রুতির কথাকে তিনি আরো তীব্র শ্লেষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের দরদী ছড়ায় মননের তির্যক কটাক্ষ তত ধারালো না হলেও সমকালের সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি সজাগ। তাঁর ছড়া যতটা আবেগে মেদুর, শ্লেষের কশাঘাতে ততটা উদ্যত নয়।

১, ক্রিস্টেফার কডওয়েল। ইলিউশ্যন অ্যাণ্ড রিঅ্যালিটি (বাস্তব ও বিভ্রম) অনুবাদকঃ রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ২৯। ১ম প্রকাশ ২৪শে নভেম্বর ১৯৮২। প্রকাশকঃ সুনীল কুমার ঘোষ, পপুলার লাইব্রেরী ১৯৫/১ বি, বিধান সরনি- কলি-৭০০০০৬

তুলনীয় অংশ ঃ

তুই, তুলছি চাঁদা/ বলছি, দাদা/ মুক্ত কণ্ঠে—/ সামনে চাঁড়া।/ আমি আমরা/ যুক্ত ফ্রন্টে। / ধরছি রফা/ বত্রিশ দফা/ কারণ উহ্য।/ কথার ঝুড়ি/ যাঁর নাই জুড়ি— / তিনিই পূজ্য।

(কথার ঝুড়ি ঃ একটু পা চালিয়ে ভাই)

অথবা— এ দুয়োরে যায় ঃ দূর দূর। / ও দুয়োরে যায় ঃ ছেই ছেই।/ সুয়োরাণী লো সুয়োরাণী তোর/ রাজ্যে দিল হানা/ পাথর চাপা কপাল যার সেই/ ঘুটে কুড়ুনির ছানা/ ঘেন্নায় মরি, ছি। / মন্ত্রী বলল, দেখছি/ কোটাল বলল, দেখছি/ ঢোল ডগরে পড়ে কাঠি/ রক্তে হয় রাঙা মাটি/ কাড়ে না কেউ বা/ ভাল মানুষের ছাঁ/ (ঠাকুরমার ঝুলি ঃ ঐ)

শুধু রোমান্সের স্বপ্ন নয় বৌদ্ধিক চেতনায় বিনিদ্র কবি প্রেমেন্দ্র গণ জাগরণের প্রতীক্ষা নিয়ে বাক্ নির্মানে মগ্ন। তাঁর কবি ভাবের কোমল ভাবনাগুলোকে তিক্ত সামাজিক অভিজ্ঞতা খুঁচিয়ে যুদ্ধ শিবিরে পাঠাননি সত্য, সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে চুরে নতুন অন্বয়ে গড়ে উঠুক সেই সদিচ্ছা প্রেমেন্দ্রকে গণকবিদের বেদনার অংশীদার করেছে নিঃসন্দেহে। প্রেমেন্দ্র জানেন বিবেককে হৃদয় থেকে পৃথক করা যায় না। তার উপযোগিতা পূর্ণ মতাদর্শকে কবিকর্মে প্রয়োগ একটা সামাজিক কর্ত্তব্য ঃ

চর্ব্বিশ/ক, সময় অনেক বদলে গেছে/ বদলে গেছে দেশ /। অচল নাকি সাবেক কালের/ চলন বলন বেশ।

খ, ছেলেরা সব অন্যরকম/ মেয়েরা সব ভিন্ন/ পুরানো সব রীতি নীতির/ পাবে না আর চিহ্ন। (মলাট ঃ ছড়া যায় ছড়িয়ে)

প্রেমেন্দ্রের এই হতাশা নতুন সমাজ থেকে উদ্ভূত। প্রগতির অর্থবিভ্রম মানুষের সুস্থতার পক্ষে বিপজ্জনক। রুচিবিকারে স্বাধীন দেশের অগ্রগতি বিঘ্নিত দেখে স্বাভাবতই কবির এ হাহাকার। এই যন্ত্রণা গণজীবন সম্পর্কিত নয় বলা যায় না; কারণ সমাজের বিশৃংখল আচার আচরণ শেষ পর্যন্ত **mass life**র- উপর গিয়েই বর্ত্তায়। এই ব্যাভিচারের জগৎ থেকে গণসাধারণের মুক্তির আশ্বাস নিশ্চিহ্ন। গণ শ্রেনীর লোক না হয়েও কবি প্রেমেন্দ্র লোক সমাজের সর্বনাশের-প্রাগ

চিন্তা ছড়ায় অনু প্রবেশ করিয়ে তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয়ে সাম্যশ্রয়ীদের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছেন। মনে পড়বে-ঐ পতনোন্মুখ সমাজের সর্বনাশের সামনে দাঁড়িয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও কত ঘৃণায় বিষোদ্গার করে ছিলেন ঃ

তিন, থু/ থু/ থু/····· এই একটি শব্দে/ গলা চিরে/
এবার আমি আগুন ওগরাব। (বাঘের আঁচড় ঃ একটু পা চালিয়ে ভাই)

অগ্নি-চেতনা থেকেই বিপ্লবীর আবির্ভাব। সুভাষের সেই বৈপ্লবিক প্রয়াস আঙ্গিককে বদলে নিয়েছে ছড়ার গভীর অভিব্যক্তিতে। হয়তো এর মধ্য দিয়ে একদিন প্রয়োজনে সংগ্রাম স্পৃহা বিস্ফোরিত হতে পারে

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছড়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কৌশলে দীপ্ত হয়ে ও একেবারে আবেগবর্জিত নয়। সমাজ জিজ্ঞাসার বক্রসীমার মধ্যে সে ছড়া শোষক বিরোধী গুঞ্জনকে একটা বিশেষ মনোভাবের ক্ষেত্র থেকে পাঠকমনে নিক্ষেপ করে। অবশ্য একমাত্র ঠিক, সাংগঠনিক সংগ্রাম বিষয়ক কোন পথ নির্দেশও তাঁর ছড়ায় নেই। ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে সে সব ছড়ার গাঁথুনি।

পঁচিশ/ক, কার চুল এলোমেলো,/ কিবা তাতে এলো গেলো। /
কার চোখে কত জল / কে বা তা মাপে ? /

খ, হাওয়া বয় সন সন/ তারারা কঁপে। / জেনে কিবা প্রয়োজন/ অনেক দূরের বন/ রাঙা হ'ল কুসুমে, না/ বহ্নি তাহে ?
হৃদয়ের মরচে ধরা/ পুরোনো খাপে। / (জং সাগর থেকে ফেরা)

প্রেমেন্দ্রে ছড়া চলতি শব্দের চমকি পাথরে জীবন জ্বালার ফুলকি ঝরানো। সাধারণ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর জীবন চর্চার মূলে। কবির সমাজ চেতনা সে দিক থেকে, যথার্থ আধুনিক। "লিফ্‌শিৎস বলেন- সাহিত্যে শ্রেনী সংগ্রাম হইতেছে জনগণের প্রবৃত্তির সংগ্রাম, প্রভুত্ব ও দাসত্বের ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে, ধর্মগত বন্ধ্যাত্বের বিরুদ্ধে, নির্মম নৃশংসতার বিরুদ্ধে, সভ্য অপমান ও মিষ্ট ভণ্ডামির বিরুদ্ধে।" **The class struggle in literature is the struggle of the Peoples tendences against the ideology of domination and slavery, against religious sterility, against cruelty,**

against polite insolence and suarity.,,১]

রাজনীতি থেকে দূরে অবস্থান করেও গণ প্রেমিক প্রেমেন্দ্র মুক্ত কণ্ঠে অন্তরের ভাষাকে মূর্তি দান করেছেন। প্রেমেন্দ্রের সুদীর্ঘ জীবনে চিন্তার সমস্যা থেকেই প্রগতিশীল মানসিকতার সূত্রপাত। ছড়ার ক্ষেত্রেও সেই সমস্যাকন্টকিত সমাজ প্রবাহ। তা কবির প্রাণে ভালবাসার বীজ থেকেই অঙ্কুরিত।

ক, এ-পারেতে কালো রং বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্/ ও-পারেতে গাছে শুধু লঙ্কা টুক টুক করে,/ কালা ধলা ভাই আমর মন কেমন করে/ মাঠে নাই পাকা ধান মই দেবো কি ? / কাস্তে কোদাল থাকে আনো শান দিয়ে দি । /

খ, ঘরে আছে খুদকুঁড়ো/ তাতে দিও নুনের গুড়ো/ লঙ্কা দুটো, ছিঁড়ে তাই- /চাঁদ-মুখে খাও।/ বাদল গেলে দেব তোমায়/ পুলি-পোলাও।

(কালাধলা ভাই আমার ঃ ফেরারী ফৌজ)

পুরানো দিনের ভাইবোনের পারিবারিক দুখ-সুখের ছড়াকে কবি কত দরদে সোহাগে গণমানুষের উপোসী যন্ত্রণার মোড় ঘুরিয়ে এনেছেন. উল্লিখিত দৃষ্টান্ত তার আলেখ্য।

১, নীরেন্দ্রনাথ রায় । সাহিত্য বীনা পৃঃ ১২৫ । প্রকাশকালঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ প্রকাশকঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ (পঃ বঃ সরকারের একটি সংস্থা) আর্যম্যানসন (নবম তল) ৬ এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলি- ৭০০০১৩

গ৹ মূল্য কবি-সংঘে : সমর সেন

সমর সেন সমাজবাদী চিন্তার কবি। তাঁর কবিতা সমাজ চেতনার কবিতা। তিক্ত বিষণ্ণতার মধ্যে তিনি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক কবিতা উপহার দিয়েছেন।

"সত্যেন দত্ত বিগত, নজরুল ইসলামের লেখনী বন্ধ। এ রকম সামাজিক ও সাহিত্যিক পরিবেশে একদল কবি নতুন করে, ভাবে ও ভাষায় আঙ্গিকে সম্পূর্ণ ভাঙচুর করে কবিতা লিখতে চাইলেন। বলতে দ্বিধা নেই, তাঁদের মধ্যে অন্যতম সার্থক কবি সমর সেন।" ১

এক* কলকাতার ক্লান্ত কোলাহল সকালে ঘুম ভাঙে/আমার সমস্তক্ষণ রক্তে জলে/বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

(একটি বেকার প্রেমিক : সমর সেনের কবিতা/১৯৩৪ - ৩৭)

কবি আশাবাদী, তাঁর জীবনবোধ গভীর এবং স্পষ্ট। আবেগের সংযম পালনে দক্ষ শিল্পী। জীবন নিয়ে খেলা নয়, ধনতন্ত্রের গলিতশব নিষ্পিষ্ট করে সংগ্রামী মননে উদ্বুদ্ধ সমর সেন। তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের সাক্ষ্য :

দুই তবু জানি/জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে, ভস্ম হবে/আকাশ গঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে/ততদিন/ততদিন নারী ধর্ষণের ইতিহাস/পেস্তা চেরা চোখ মেলে শেষ হীন পড়া/অন্ধকূপে স্তব্ধ, ইঁদুরের মতো/ততদিন গর্ভের ঘুমন্ত তপোবনে/বণিকের মানদণ্ডের পিঙল প্রহার।

(ঘরে বাইরে : সমর সেনের কবিতা/১৯৪০-৪২)

নির্ভীক কবি কণ্ঠে বলিষ্ঠ সমৃদ্ধ সংকেত। ঘুণধরা সমাজের প্রতি আস্থাহীন কবি শোষণযন্ত্র নির্মাতার কৌশল এবং কার্যাবলীর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। তাঁর বিশ্বাস অন্তঃসার শূন্য বণিক-সভ্যতার ধুঁকুনি বহুমুখী ব্যর্থতাকেই উন্মুক্ত করবে। সমর সেনের সমাজ-সজাগ চেতনা গণ-আন্দোলনকে এগিয়ে দেয় সেই প্রত্যয়ে। গণ-সংহতি কবির অবাধ বাণিজ্যবোধের কারণেই উচ্চারিত। তাঁর সমষ্টি-ভাবনা মৌল এবং আন্তরিক। এই রূঢ় প্রতিবেশ সমাজের দুর্গতি বৃদ্ধি করে বলেই কবির নাতিদীর্ঘ কবিতার অভ্যন্তরেও তীব্র শারীরিক যন্ত্রণার মহার্ঘতম প্রকাশ।

১* অরুণ ভট্টাচার্য। কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতু বদল/পৃঃ ১৫২/ ১ম প্রকাশ ১৩৬৫/প্রকাশক : শ্রীশ্রীশ কুমার কুণ্ডু/জিজ্ঞাসা, ১৩৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা—৯

তিন* হঠাৎ সূর্য ওঠে, বলিষ্ঠ প্রহারে/কুয়াশায় নদীর জল ঝলকায়—শাণিত হাতিয়ার !/মাঝে মাঝে বালুচর, কাদা খোঁচা জলে নামে,/ধান ক্ষেতে কাস্তে হাতে কিষাণ,/হাতুড়ি বাজে কামার শালে/সবুজ আগুন জ্বলে অনেক মাঠে।

(ইতিহাস (খুচুকে)/ : সমর সেনের কবিতা ১৯৪২-৪৩)

আত্ম সচেতন কবি প্রতীকে প্রতীকে বিদ্রোহের অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। গদ্যের সংহতি দিয়ে গড়া বাক্ রীতির চমৎকার প্রয়োগে তাঁর কাব্যশরীর জীবন্ত। জন্ম-সূত্রে কর্ম-পন্থা নির্ব্বাচনের মূঢ়তা এদেশের মানুষের সামনে এক চরম পরিহাস। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-বাসনাকে, প্রয়োজনে 'শাণিত হাতিয়ার'—হাতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বিহ্বল মানুষের কর্ণে সেই 'কামারশালের' হাতুড়ির গর্জন। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুজগত রীতিমত ঘনবদ্ধ। কবিতার পরিবেশ সাম্প্রতিক কালকে প্রত্যক্ষ করায় নরক যন্ত্রণার বিরুদ্ধে আজ পৃথিবীব্যাপী প্রতিবাদ। অসাম্যের ধ্বংস স্তূপে সূর্যালোক সবুজ চেতনার জাগরণ ঘটাতে সক্ষম বলে কবির আত্ম-প্রত্যয়। অস্থির চেঁচামেচির চেয়ে 'বলিষ্ঠ প্রহার' কবির প্রার্থিত। তাঁর কবিতার শব্দগুলো যেন ঝাণ্ডা হাতে তালে তালে অগ্রসর। কবির দুঃসাহসিক শব্দ গ্রন্থন যেন কোনো সামরিক বাহিনীর নিয়মানুবর্তী শক্তি। সমর সেনের Self-reliance, Musicalband এর মতো স্বাতন্ত্র্যে দৃঢ়, কবি তাঁর এই বিপ্লবী প্রেরণার বোধ নিয়ে মিলিত হতে চান, আদর্শ কোনো 'লোকের বসতি' তে :

চার* আশা রাখি একদিন এ কান্তার পার হয়ে পাবো/লোকের বসতি,

(২২শে জুন : তিন পুরুষ)

অথবা পাঁচ* রাত নেই, দিন নেই, বারে বারে চমকে উঠি,/আমার মনে শান্তি নেই, আমার চোখে ঘুম নেই,/স্পন্দমান দিনগুলি আমার দুঃস্বপ্ন।

(চার অধ্যায় : সমর সেনের কবিতা/১৯৩৪-৩৭)

শৌর্যই সৌন্দর্য—এই বামপন্থী মনোভাবের কাব্যমূল্যে সমর সেনের কবিতা নিষ্ঠুর বৈষম্যের ভিত্ কাঁপুনি তোলে। জন জাগরণ স্মরণে রেখে কবি বিশ্বাস করেছেন :

ছয়* বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর/ভাগ্যবান এ-কবিকে বিপুলা যশোদা/নিশ্চয়ই দিবেন বলে আমার বিশ্বাস।

(সাফাই : তিন পুরুষ)

যশোদা এখানে জননী পৃথিবী। আর কবি নিজে সেই যশোদা দুলাল গোপাল, উৎপাদনের ননী-ছানায় যার অবিভক্ত অধিকার। পুরাণের কল্প

কাহিনী কবির আশ্চর্য জীবন দরদ ও বৈষম্য যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে আধুনিক সত্যের অভাবিত দৃষ্টিকোন্ চিনিয়ে দিচ্ছে। সংহত গণশক্তি একদিন বুর্জোয়ার সকল আস্ফালন নিঃশেষ করবে। শ্রেণী বা বর্ণ বিভেদের বিষদন্ত উৎপাটন করবে আর এক শক্তির যাদু-দণ্ড। কারণ সমাজের এই পিছিয়ে-পড়া জনস্রোত উপেক্ষার বাঁধের সামনে ফুলতে ফুলতে এভাবেই প্রবলাঘাত সৃষ্টি করবে যখন আর কোন বাধাই সেই অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না। এরূপ একটা নিটোল আত্মপ্রত্যয় কবিকে বাস্তব বোধের ভিতর দিয়ে সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। পক্ষপাত-ঘেঁষা শাসক—গোষ্ঠি জনগণের সম্মিলিত ক্ষোভের তোড়ে ভেসে যেতে বাধ্য। অন্যায়, অত্যাচার, উপেক্ষার ভার দুর্বহ। সহ্যেরও একটা সীমা থাকে। সমষ্টির সেই সমস্যা আর সমাধানের উজ্জ্বল সম্ভাবনা কবি লক্ষ্য করেন :

সাত* ঘৃণ্য শূদ্র যত শত হস্ত দূরে রেখে/গৌরবে পড়েছি গীতা শ্রীমদ্ভাগবত/
দুর্দান্ত যৌবন কালে ধরেছি উপনিষদ/ভাগ্যক্রমে ইংরাজ এলো, স্বাগতম।
(বাবু-বৃত্তান্ত ঃ তিন পুরুষ)

কবির যৌব-ক্ষোভ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার অভিপ্রায়ের মতো ছাপিয়ে উঠেছে। সংস্কারবাদীর সামনে এ একটা জ্বলন্ত স্পর্দ্ধা। সমষ্টির জন্য নিবেদিত কামনার অঙ্কুর বিশ্বাসের পূর্ণাবয়ব কোনো ভবিষ্যতের আভাস দিচ্ছে সমর সেনের পরিচ্ছন্ন ভাষায়। বিনিদ্র-রাত্রির মাঝে একাকী কবি খুঁজে বেড়ান বর্বর-সভ্যতার কুটিল শাসন যন্ত্রে পিষ্ট নিঃসঙ্গ মানুষদের। মানুষের ধর্মকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর এই মনোযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় :

আট* গভীর রাত্রে অনেক লোক জাগে/বিপুল বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর/হৃদপিণ্ডে এখনো গরিয়ান/কত বর্বরের গোরস্থান এ শহরে/রাত্রে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর মুখে জীবনের জয়গান বাজে,/দূরে নদীর ওপারে হঠাৎ কেউ ডাকে ; হুঁশিয়ার।
(স্টালিনগ্রাড (কে. আহমেদকে) : সমর সেন কবিতা—)

সমর সেন মানবাত্মার কবি। সামাজিক বিশৃংখলতাই তাঁর কাব্যের যন্ত্রণা।

"নিজের মুক্তির জন্য সমর সেন ব্যস্ত নন, আর বিধাতাকে, অভিশাপ দেবার জন্যও, কখনো তাঁর কাব্যে টেনে আনেননি। সৌন্দর্যের উপলব্ধির পথে যে-বাধা সেটা তাঁর পক্ষে ভিতরকার নয়, বহিরের ; আত্মবিরোধ নয়, বৃহৎ সমাজ-স্বার্থের সঙ্গে ক্ষুদ্র শ্রেণী—স্বার্থের বিরোধ। সৌন্দর্যের শত্রু, তাঁর মতে, মানুষের আত্মার কলুষ নয়, সামাজিক দুর্ব্যবস্থা। তাকে মেরেছে ধনিকের লোভ, নষ্ট করেছে রোগ ও দুর্ভিক্ষ, তাকে পঙ্কিল করেছে স্থূল, নির্বোধ মধ্যবিত্ততা,

তাকে বিক্ষত করেছে আধুনিক জীবনে বনিক—শক্তির ব্যভিচারী প্রতাপ—এক অনিপুণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বর্ত্তমান মানবজীবনের ভারসাম্য গেছে নষ্ট হয়ে। এখানে সৌন্দর্য আসবে কেমন করে ?"১

নয়* আমার রক্তের ছন্দে আজো বাজে জাতির ধমনী, আমাকে ডাকে/ অসংখ্য সহোদর সেখানে প্রাণ দেয় লাখে লাখে/ফসলহীন শকুনের মাঠে।

(পোড়ো মাটি (অশোক মিত্রকে) : সমর সেনের কবিতা) ১৯৪২-৪৩

কবির প্রখর উপলব্ধি কবিতার শব্দ গাত্রে খোদিত। এর মর্মবেদনা গভীরভাবে নাড়া দেয় সামাজিক মানুষদের। সমর সেনের স্বদেশ প্রেম প্রণিধানযোগ্য। তিনি মনে করেন পরাধীন দেশে ক্ষণকালের জন্যেও সুখ নেই। সভ্যজগতে সাম্রাজ্যবাদীর নীতি ভ্রষ্টতার মর্মন্তুদ ঘটনাপুঞ্জ শৃংখলিত মানুষদের মনে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিদ্ধারণের সুর জোগাতে বাধ্য। বেদনা সঞ্জাত এই প্রত্যয়ের ভিতর দিয়েই তিনি গণজীবনের সহমর্মী কবি। সমর সেনের ভাষায় ছিন্নমূল সেই মানুষের কণ্ঠস্বর :

দশ* বুড়ো মজুর বলে : হমারা হিন্দুস্থান নেহি দেঙ্গ ।/হিম্মৎ হ্যায়, জানোয়ার মারনেকে লিয়ে মরণেকে লিয়ে তৈয়ার/ভাই আনোয়ার, হাতিয়ার চাহিয়ে, তেজ হাতিয়ার।

(পঞ্চম বাহিনী : সমর সেনের কবিতা/১৯৪০-৪২)

অথবা এগারো/ক* তখন কারো কারো মুখে শুনেছি/গণ-আন্দোলনের তত্ত্ব কথা/ শুনেছি, মহাত্মাজীর অহিংসা পণ্ডশ্রম/ভণ্ডামী মাত্র।

খ* বিশাল ভারত/জন্ম আর জরা ; জীর্ণ জাল /জন্ম আর জরা/প্রতিষ্ঠিত বৃন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন/লক্ষহীন কত লোক/মগজ স্মৃতির জাবরে ভরা, চা আর ধুমপান/ নিষিদ্ধ গান।

(রোমন্থন : সমর সেনের কবিতা/১৯৪০-৪২)

প্রতিরোধ স্পৃহায় মাত্র সমর সেন ক্ষান্ত থাকেননি। তাঁর অখণ্ড বিশ্বাস ইতিহাসের বুকে অবিকৃতভাবেই স্বার্থান্বেষীদের কলঙ্কের ছবি আঁকে। উপনিবেশিক শাসন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। পরভোজী দস্যুদের সাময়িক সুখ আত্মঘাতী বিপর্যয় বয়ে আনবে :

১* বুদ্ধদেব বসু/কালের পুতুল/পৃঃ ৫৮/১ম প্রকাশ : ১৯৪৬/পৃ: দ্রষ্টব্য।

বারো* অসংখ্য বর্গীর গোরস্থানে/পুঁজিবাদ চূর্ণ হবে সারা দুনিয়ায়, লুপ্ত হবে এ হিন্দুস্থানে,/হে সরকার, হুজুর সরকার/হুজুর বুড়োলাট, জঙ্গী লাট, বর্মাবীর আলেকজাণ্ডার,/আমরা বান্দা এখনো, তবু বন্দী তোমরা নিজেদের জালে/ইতিহাসের জাঁতা কলে, আত্মঘাতী নসীবের ফলে।

(খোলা চিঠি (চঞ্চলকে জবাব) : সমর সেনের কবিতা) ১৯৪২-৪৩

কতখানি ব্যথা বাজলে শব্দ প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে, তারই সজীব দৃষ্টান্ত নিম্নরেখ শব্দগুচ্ছে। এ প্রত্যক্ষ উপলব্ধিজাত মনের গর্জন। মমত্ব থেকেই এরা জন্ম নেয়, বেড়ে ওঠে। বিদেশী কবি 'নাজিম হিকমতের' (ক) কবিতায় গণজীবনের সেই সব শত্রুর রূপ :

এক* ওরা দুশমন্ বার্সার জোলা রেজেপের/দুশমন্, কারাবুক কারখানার ফিটার মিস্ত্রী হাসানের।/ওরা দুশমন্ গরিব চাষী মেয়ে হাট্‌চে—র/দুশমন্ ওরা ক্ষেত মজুর সুলেমানের।/ওরা তোমার দুশমন্, আমার দুশমন্/প্রত্যেক বুঝদার মানুষেরই ওরা দুশমন্।

(দুশমন : নাজিম হিকমতের কবিতা) অনুবাদক : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

দুই* ওরা ভয় পেয়েছে, নিগ্রো ভাই আমার,/আমাদের গান ওদের আতঙ্ক, রোবসন।

(পলরোবসন-কে : নাজিম হিকমতের কবিতা) অনুবাদক : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

এখানে নিগ্রো কবি ল্যানস্ জেফারস-র (জন্ম : ১৯১৯) কবিতার মর্মধ্বনি একই সুরে রণিত। কবিরা জীবন-চিত্রকর। পৃথিবীর সকল প্রান্তের কবি একই জিজ্ঞাসার অভ্যুদয় ঘটান। তাঁদের জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মমুখী। কল্যাণ বিধানের তাগিদ

ক● তুরস্কের কবি (নাজিক হিকমতের জন্ম ১৯০২)..... পরে আত্ম জীবনীতে তিনি লিখেছিলেন : "আমার ঠাকুর্দা ছিলেন একজন পাশা, আমার বাবা ছিলেন উচ্চ পদস্থ রাজ কর্মচারী, আর আমি নিজে হলাম কমিউনিষ্ট।" "১৯১৮ সালে কিয়েলে জার্মান নৌ-বিদ্রোহীদের সঙ্গে তুরস্কের যে কয়েকজন সিপাহী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছিলেন তাঁরা মার্কসবাদী ভাবধারা নিয়ে দেশে ফেরেন।... এ যাবৎ বিভিন্ন অভিযোগে হিকমতের যে পরিমানে সাজা হয়েছে, তা একত্রে যোগ করলে দাঁড়ায় ৫৬ বছর জেল। তার নিজের বয়সের চেয়েও অনেক বেশি।... পরে যখন তাঁকে আনাতোলিয়ার জেলে বন্দী করা হয়, তখন তিনি বন্দী কৃষকদের সংস্পর্শে আসেন।"—সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

তাঁদের সৃষ্টিকে সমাজ-মনের মুকুর করে তোলে। আসলে জীবনকে তাঁরা নেড়ে চেড়ে দেখেন এবং অবিশ্রাম শ্রম দিয়ে সমষ্টিগত রূপকে সত্যসুন্দর করে আঁকেন। সামাজিক মানুষ বলেই মনুষ্যত্বের অবমাননায় তাঁরা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন না। তাই তাঁদের উদ্বিগ্ন মমতা সর্ব্বমানবের উদ্দেশ্যে:

এক/১* ওখানে সম্রাট। চাবুকের তলায় ক্ষুধার্ত আমি/এখানে শীতল,/ আমার পাঁচ বছরের ছেলে ভোর হতে না হতে/সূর্যাস্ত পর্যন্ত তুলোর বাগানে।/ আর মালকিন্ বাড়িতে না থাকলেই মালিক/আমার বউকে ডেকে পাঠায়/উপভোগ করে যথেচ্ছ ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। তারপর/এক ডলার ছুঁড়ে দেয়।

২* আমার পচাগলা রুটিতে পেশী বেড়ে ওঠে।/আমি দাসত্বের জমিতে হাত বুলাই,/সংগীতের শক্তিশালী রঙে নূতন/স্বর্গের জন্ম হয়।/কোন ঈশ্বরের ক্ষমতা নেই সে রকম সৃষ্টি করার।

(এখানে সম্রাট: ১০০ বছরের শ্রেষ্ঠ নিগ্রো কবিতা) (১৮৬৮-১৯৬৮) সম্পাদিত ও অনূদিত: শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মুকুল গুহ।

সমর সেনের কবিতার চেহারায় অনিবার্য হয়ে ফুটে ওঠে, দেশ, কাল ও সাধারণ মানুষ। আর পরিণত বিশ্বাস থেকেই বিদ্রোহের তাপ বিকিরণ এবং জীবন দর্শন:

"এ প্রান্তর আমাদের উত্তরাধিকার"—এই দাবীর গৌরবে কবি বাঙ্ময়। স্বাধীনতা হরণকারীকে নির্দিষ্ট করে তিনি বলেন: তাদের অবিচারে "গ্রামে গ্রামে বিপর্যয়/রাস্তায় নিরস্ত্র লোক হৃদপিণ্ডে আহত/সন্ধ্যা রক্তক্ষরা।"

প্রতিবন্ধকতার দরুণ দেশময় কারাগার। হামলায় জন-ঢেউ স্তব্ধ। দুর্ভিক্ষের কবলে নিশ্চিহ্ন অগণিত জীবন। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষদের নিয়ত অভাব কবি আপনার জীবন দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই লঙরখানার ভিড়ে অংশ গ্রহণ করে 'আধো-ঘুমে' 'আধো-স্বপ্নে' রাত্রি যাপন। প্রগতি ভাবনায় সমর সেন দেশী-শোষক এবং সাম্রাজ্য—লোভীর ঘৃণ্য মুখোস গুঁড়িয়ে নতুন জীবন দর্শনের সদিচ্ছা পোষণ করেন:

তেরো* তোমার দুর্দান্ত আমলে/নরহন্তা বিদেশীরাজ, রক্ত জোঁক স্বদেশী বণিক, সর্পিল পঙ্কিল বাহিনী/জীবন সংকীর্ণ করে, শহরে, বন্দরে, গ্রামে/প্রাচীন সভ্যতা ধোঁকে ঘেয়ো কুকুরের মতো।

(ক্রান্তি: সমর সেনের কবিতা/১৯৪২-৪৩.)

দারিদ্র্য কখনো কখনো জীবনে উদ্দীপনা এবং নতুন আলোর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তে শক্তি যোগায়। স্বাধীনতা-পূর্ব দেশে, প্রজাপুঞ্জের শ্রমের দৌলতে শাসক ঐশ্বর্যশালী, গণ-ভাগ্যে চরম দুর্দশা। উত্তরকালে শাসক পাল্টেছে, শোষণের প্রকৃতি অপরিবর্তিত। দুর্বল শ্রেণী মানসিক দ্বন্দ্বে দিশাহারা। পুরোনো দৃশ্যই কবির চোখে যন্ত্রণার নৈবেদ্য। তবু তিনি মনে করেন, দেশের মাটিতেই খুঁজতে হবে অশান্ত হৃদয় ক্ষতের নিরাময়ী বীজমন্ত্র। কবিতার এই অংশে সমর সেনের সেই সংগতির সন্ধান :

চোদ্দ* অকাল মরণ শেষে একাল সমরে!/তোমাকে জানাই বন্ধু:/পথে বাধা পর্বত আকার/ঘুনঘরা আমাদের হাড়/শ্রেণী ত্যাগে তবু কিছু/আশা আছে বাঁচবার।/যারা মাঠে খাটে/উদ্দাম নদীতে জাল ফেলে/মাছ ধরে যারা আনে হাটে,/ধান জল বিদ্যুৎ কয়লা/আনে যারা নগরিয়া ঘরে ঘরে/সরায় ময়লা, দুধ দেয় যে গয়লা/তাদের মিতালি খুঁজি।

(গৃহস্থ বিলাপ : সমর সেনের কবিতা/১৯৪৩-৪৪)

'শ্রেণী-ত্যাগে'ই বাঁচার ভরসা। কবির সচেতন উক্তি :

"কিন্তু জড়বাদী সুবুদ্ধির জোরে আজ/আমি/দু'নৌকায় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি।" নির্ভয়ে বলার এই দুঃসাহস গণ-সংহতি-কামী-কবির বুকের বল। কবির দৃষ্টি পথে এতদিন পর বিপ্লবের ঝড় উপস্থিত। তিনি শূন্যগর্ভ আকাশের নীচে সোনালী রোদ্দুরের ঝর্ণায় 'লোকের হাট' দেখেছেন। জোয়ারী— আবেগে রক্ত মাংসের ছাপোষা মানুষগুলো পা নামিয়ে দিয়েছে উদ্ভ্রান্ত প্রবাহে।

মন্বন্তরে এদের দিন কেটেছে, শকুনের অশুভ সংগীতে এদের শ্রুতিপথ রুদ্ধ। বাঙলা, উড়িষ্যা, বিহার, মালাবার, রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স সর্বত্র পাশব শক্তির ঘৃণ্য কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে ক্লান্ত দেহ, মন নিয়েই তাদের এই সর্বশেষ যাত্রা শুরু। শঙ্কিত বুকে তাদের উচ্ছল কর্ম-বেগ, স্নায়ু শিরায় অদম্য প্রাণের অঙ্গীকার। বাঁচার কামনা নিয়ে সরল বিশ্বাসে শকুনি— চক্রান্ত ব্যর্থ করতে তারা আজ কৃত-সংকল্প। এ ইজ্জতের লড়াই। কবির অফুরন্ত বিশ্বাস, শিশুর কান্না, উলঙ্গনারীর লজ্জা নিবারণ হবেই। ফের ইলিশের অতীত স্বাদ জিভাগ্রে মানুষ ফিরে পাবে।

ভারত পুরাণের বৃত্তান্ত আধুনিক মননে বিপর্যস্ত সাম্প্রতিকের প্রতীক মূর্তি ধরেছে :

পনেরো* শকুনি-চক্রান্ত শেষ, শঙ্কিত সঞ্জয়/বিবর্ণ প্রাসাদে ফিরে, সঞ্চিত স্বার্থের প্রতীক/লয়ে জান ধৃতরাষ্ট্রকে সভয়ে জানায়/পুনরুজ্জীবনের বার্তা সাধারণ লোকের।

(লোকের হাট : সমর সেনের কবিতা/১৯৪৪-৪৬)

অথবা ষোলো* আমাদের স্বাধীনতা আসন্ন প্রায়/মন্ত্রী সভার বিলিতী দূতেরা আগত প্রায়/জয়হিন্দ।

(জয়হিন্দ : ঐ / ঐ)

ভিন্‌দেশী কবির কবিতায় প্রত্যয়বাহী ঐ সত্যাশ্রয়ী চড়া—সুর। তুলনীয় অংশ :

তিন/১* কেঁদে কেঁদে চোখে আর কান্না নেই/আমাদের খানিক বিষণ্ণ, খানিক রুক্ষ করে রেখে/চোখের জল শুকিয়েছে।

২* রক্তের নদী উজিয়ে/আমাদের নিশানা/দাঁত আর নখ দিয়ে/ছিনিয়ে নিতে হবে জয়/কিছুই আমরা ক্ষমা করব না।

(ক্ষমা করব না : নাজিম হিকমত) অনুবাদক ; সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কবি উপলব্ধি করেন, ত্রিশঙ্কু সমাজে চিরকাল দুটি শ্রেণীই থাকতে বাধ্য। মাঝখানে কেউ টিঁকে থাকতে পারে না। উপরের চাপে এবং নিচের উর্দ্ধমুখী উত্তোলনের মুখে লুকিয়ে কেউ স্বার্থ মগ্ন থাকতে পারে না। ফলে নিচের সারিতে মিশে যাওয়ার প্রশস্ত সুযোগ। অণুর সংঘবদ্ধ রূপ যে পরমাণুর অটল শক্তি গড়ে তোলে, তার গতিরোধ সত্যি এক দুঃস্বপ্ন। চেতনায় সেই ঐক্যের জাগরণ কবির দৃষ্টি জুড়ে আলোক বিকিরণ করছে। তারই সুবাদে বহুচিন্তিত প্রস্তাব :

সতেরো* সমাজের মধ্যপদ ধীরে ধীরে লোপ পায়/বণিকেরা প্রাকার বানায়—/দিনে দিনে চক্রবৃদ্ধি হারে/নিরন্ন বেকারের মজুরের ভিখিরির সংখ্যা বাড়ে,

(নববর্ষের প্রস্তাব : সমর সেনের কবিতা/১৯৪০-৪২) "সোমেন চন্দের স্মৃতিতে"

সমর সেনের কবি-চিত্তে অন্ধকারের মতো নিঃসীম ভাবনার পৌনঃপুনিক অবস্থান। বিষণ্ণতার ছোঁয়াচ কাটিয়ে উঠতে পারেননি বলেই তাঁর কবিতায় বারংবার বেহিসাবী সাধারণ মানুষের দল তাদের মনোকষ্টকে মুদ্রিত করেছে। নিষ্ঠাবান কবি মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ, তাই নীরবে নিজস্ব সুখের জন্য স্বগরাজ্য

নির্ম্মাণ করে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেন না। গণজীবন তাঁকে নিশ্চেষ্ট থাকার সুযোগ না দিয়ে দুঃখেরখনি খুঁড়ে-বের-করা যন্ত্রণাকে তাঁর মনে জাগিয়ে দেয়। স্বভাবতই সর্ব্বজনের বিপদ মুক্তির চিন্তায় উদ্বিগ্ন সমর সেন একটি রাত্রের অ-সুখ থেকে দুঃস্বপ্নে বিভোর।

'অন্ধকারে' 'হাহাকারে' মিশে জীবনে অপচয়ের মর্ম্মান্তিক আর্তি সমর সেনের কবিতায় বুদ্ধি শাণিত স্পষ্টতায় রূপ ধরেছে :

আঠারো* অবাক হয়ে দেখি ;/দেখি আর শুনি/গন্ধ-স্নিগ্ধ হাওয়ায় কিসের হাহাকার/অন্ধকার ধূসর, সাপের মতো মসৃণ,/দীর্ঘ লৌহ-রেখার সহসা শিহরণ—/ আর অস্ফুট শীর্ণ, বহুদূর, কিসের আর্তনাদ,/কঠোর, কঠিন।/বাতাসে ফুলের গন্ধ/ আর কিসের হাহাকার।

(একটি রাত্রের সুর : সমর সেনের কবিতা/১৯৩৪-৩৭)

উনিশ* কান পেতে শুনি/কোন সুদূর দিগন্তের কান্না ; /সে-কান্না যেন আমার ক্লান্তি,/আর তোমার চোখের বিষন্ন অন্ধকার।

(দুঃস্বপ্ন : সমর সেনের কবিতা/১৯৩৪—৩৭)

নিষিদ্ধ পল্লীর বারবণিতার অন্তর্বেদনা কবি-মন স্পর্শ করে। সর্ব্বস্তরের মানুষের জন্য শুধুমাত্র তিনি ভেবেই ক্ষান্ত থাকেননি। তাদের বন্ধন-মুক্তির জন্য বিশুদ্ধ—ইচ্ছায় তাঁর কবিতা রচনা। বিংশ শতাব্দীর প্রগতি ধারায় স্নাত কবি রোম্যান্টিক-বিলাসে মত্ত না থেকে নতুন পৃথিবীর জন্ম-ভাবনায় কাতর। বুর্জোয়া কীর্তির প্রতি বিপরীত মানসিকতার পরিচয় তাঁর কবিতায় অগণিত মানুষের কল্যাণ কামনায় সঙ্ঘবদ্ধ।

শাসকের শতছিদ্র ব্যবস্থাপনায় সমর সেন খুশি নন। কারণ তিনি জানেন তাঁদের অকাল পক্কতা সাম্যবাদের ধার ধারে না। আশাবাদী কবির গণ-নেতৃত্বের সাধ নেই সত্য তবে সজ্ঞান আন্তরিকতা প্রকাশের উদ্যম নিঃসন্দেহে গণকবির আখ্যায় তাঁকে ভূষিত করবে। দুর্গতজনের জন্য তাঁর কবিতার শব্দচয়ন যেমন সজোর তেমনি যন্ত্রণাজীবী। কিছু উদাহরণ :

ক* "রাত্রি—জাগরণ- ক্লান্ত আমার দীর্ঘশ্বাস/স্তব্ধ রাত্রে/হাহাকার/সুকঠিন নিঃসঙ্গতায়/আর্তনাদ/অশান্ত সূর্য্যাস্ত/করুণ আকাশ/তীক্ষ্ণতায় তারাগুলি ক্ষুধার্ত দীপ্তি/ বিপুল শূন্যতা/চাঁদ রক্তে ম্লান/প্রহরের ক্রন্দন/নিঃসঙ্গ আকাশে/নিঃশব্দ কান্নার মতো/ বিকৃত বিলাস/উদ্দাম বসন্ত/স্যাকারিনের মতো মিষ্টি/তিক্ত রাত্রি/অসহ্য সৌন্দর্য।

খ* অলস উত্তাপে/শীতের শকুনের মতো/জলন্ত খড়্গের মতো আকাশে/ধূসর শহর/কুসুমের কারাগার/আলকাতরার মতো রাত্রি/নারী ধর্ষণের ইতিহাস/গলিত গর্ভ/কাবুলীরা আসে/মড়কের কলরোল/ক্ষয়রুগীর কামার্ত প্রার্থনায়/বন্ধ্যাভূমি/শবাহারী শৃগাল/গণিকার প্রেম/ভিখিরী কুকুরের ঝগড়া/করুণ চোখ/সরস কেরানী/সাধনা—সড়িন দিনগুলি/যুবতী—সঙ্কুল আসরে/বিকলাঙ্গ দিনের প্রসবে/বিচলিবুদ্ধি।

গ* ইজ্জতের গোলাম/ঘুনধরা আমাদের হাড়/গঞ্জনা/যন্ত্রণা/লাঞ্ছনা/রাক্ষস—নাকাল/নির্ব্বান্ধব প্রান্তর/দুঃসহ জ্বালা/কুবের দুলাল/বর্ধিষ্ণু মেদে/নারকীয় অন্ধকার/ক্ষুধিত কিষাণ/রক্ত জোক স্বদেশী বনিক।

ঘ* ইস্পাতের ঈগল/হুঁশিয়ার/শাণিত হাতিয়ার/সম্মিলিত বীর্যে/অক্লান্ত আত্মদানে/গুপ্তঘাতী হাতিয়ার/প্রতিবিপ্লবের ব্যভিচার/কদাকার—কৌতূহলে/ঘুঘু ডাকা বিষণ্ণতা/বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক/পুরুষ বিলাপ/সংসারকে তুড়ি মারি/তুখোড়/মহাজন/লাঙল যার জমি তার!''

এ প্রয়োগকে 'শ্লোগ্যান' ভাবলে ভুল করা হবে। কাব্য-বেদী থেকে প্রতারক উচ্ছেদের এইটিই মোক্ষম উপায়। তিনি নির্যাতিত মানুষের মুক্তির কথা ভেবেছেন। তাদের জীবনের সাথে নিখাদ সহমর্মিতার এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে 'সমর সেন' নতুন কালের কবি।

প্রগতির দুশমনদের কবি স্বচক্ষে দেখেছেন। লুট-করা ঐশ্বর্যের সোহাগ এইসব কুবের-দুলালদের ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারে, কিন্তু বন্ধ চটকলের শ্রমিকদের নিদ্রাহীন চোখের জ্বালা কবির চোখের ঘুম কেড়ে নেয়। সদা সচেতন সাহসী কবি তাঁর কাব্য জুড়ে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলেননি, সচল বাসনাকে প্রতিরোধের চূড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। স্তরে স্তরে তির্যকে সাজানো সেই চিন্তার ফসল :

কুড়ি/ক* ঘুম আসছে না, হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে অস্পষ্ট শুনি/দূরের কোন কুটিরে কান্নার শব্দ;/ঘুঙুরের ধ্বনি/মাতালের স্খলিত চীৎকার/ঘুম আসছে না,/রাত্রি শেষে কালের বাঁশির তীব্র হাহাকার/ধ্বণিত হল দিগন্ত থেকে দিগন্তে।

খ* পিচের পথে অন্ধকার, দীর্ঘ গাড়ি/মন্দিরের বিবর্ণ দুঃস্বপ্ন,/লজ্জা হীন গণিকার সলজ্জ প্রণয়।

(মৃত্যু : সমর সেনের কবিতা/১৯৩৪-৩৭)

সমর সেন ভাবুক এবং দ্রষ্টা। সমাজ সচেতন কবি বেনিয়াবৃত্তির বিস্ময়কর নীচতা দর্শনে উদাসীন থাকেননি। লোক—হিতৈষণা তাঁর কবিতায় মীড় ও

মূর্ছনা রচনা করেছে। নগ্ন দারিদ্র্য প্রকাশ করতে তাঁর লেখনী নির্বিকার থাকেনি। নিজস্ব উপলব্ধি দিয়ে দেশ কাল সমাজের অনেক চিত্র নমুনারূপে অঙ্কড় করেছেন, ভূমিকার সাজসজ্জা ব্যতিরেকেই। কবি কর্ম্মের ভিতর বিদ্রোহী-মনের মহড়া এবং জয় ঘোষণার সবল প্রয়াস অর্থহীন প্রলাপ নয়। রাজনীতির উর্দ্ধে থেকেও কথার হাতুড়ী চালিয়ে সংগ্রামী মানুষের প্রতি আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছেন। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক-প্রাকার ধ্বসিয়ে গণমুক্তি মন্ত্রে বেসামাল নারী পুরুষদেরও কবি একত্রিত করতে চেয়েছেন। দীর্ণসমাজে এই নতুন ভাবধারা অভিনন্দনযোগ্য।

সর্বহারা কল্যাণ যে পথে সম্ভব নয়, তা কবির মতে বর্জনীয়। তিনি অতিবিপ্লবীও নন। প্রতিক্রিয়াশীলদের ব্যভিচার দীর্ঘস্থায়ী হলে জন জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে বাধ্য, তাই মাত্র Revived thought দিয়ে প্রমাণিত করতে চান 'নিঃস্বার্থ কারবার'। সামাজিক কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হলেও তিনি সত্যবিরোধী নন ঃ

একুশ/ক* মহাত্মা স্তব্ধ প্রায়, ওয়ার্ধায় ঊর্ধ্ববাহু ;/এদিকে আসর জমায় অন্যান্য বোনয়ার দল ।/যদিও দিগ্বিদিকে লোকক্ষয়, শহর গ্রাম উজাড়/তমাম দুনিয়ায় চলে প্রতিবিপ্লবের ব্যভিচার/তবু আমাদের স্বার্থ শুধু নিঃস্বার্থ কারবার।/ সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ অনেক দিনই করেছি বরবাদ/শুধু সংগোপনে রসদ জোগানোয়/ মিলে মিলে অন্ধকার বোম্বাই, আমেদাবাদ।

খ* গ্রহণ লেগেছে প্রাচীন সূর্যে ;/এ করাল সংক্রান্তি নিঃসন্দেহে পার হব/ যে মৃত্যুপ্রাণ আনে তার ফিনিক্স গানে প্রগতির সম্মিলিত বীর্যে, অক্লান্ত আত্মদানে।

(বসন্ত ঃ সমর সেনের কবিতা/১৯৪০-৪২)

মানবতাবাদী মানুষ সমর সেন। আমলাতান্ত্রিক সমাজ থেকে গণতান্ত্রিক সমাজ দেখছেন। কবির মন তৃপ্ত নয়, নিরাপদও নয়। দুশ্চিন্তা কবির মনের গভীরে আতঙ্ক জাগায়। এখন 'man' নয়, 'money'ই জীবনের 'measure'। অগ্রাসী ধনিক শ্রেণীর মুষ্টিতে সে অর্থের স্ফীতি দেখে সাধারণের জন্য কবির এতো ব্যথা। বাস্তব চেতনার সেই অভ্যন্তর থেকে দ্বিধাহীন শ্লেষ নিক্ষেপে তাঁর কবিতা অর্থবহ। স্মরণীয় অংশ ঃ

বাইশ* তবু সরল চরম কথাটি এই বলে মানি/ভারি ট্যাঁক ছাড়া কিছুই টিঁকে না/সবার উপরে আমি সত্য/তাহার উপরে নাই।

(একমাত্র তোমাকে সত্য বলে মানি ঃ সমর সেনের কবিতা) ১৯৩৭-৪০

"বলাবাহুল্য, বক্তব্যের অন্তর্দ্বন্দ্বের জীবন্ত প্রকাশ এবং শেষ সামঞ্জস্য বিধানেই কবি কর্মের সার্থকতার নির্ভর। আর এ-সমস্যা আজকের প্রত্যেক সক্ষম কবির। এবং সমরবাবুর সামনেও আজ এই মৌল প্রশ্ন: কাব্যবস্তুর অন্ত-র্বিরোধের গোলক-ধাঁধায় তিনি জীবনের এই ক্রমিক ধারাবাহিকতার যোগ সূত্রটি খুঁজে পাবেন, না মাত্র কয়েকটি উজ্জ্বল Expression—এর কবিরূপেই তাঁর দুর্লভ কবিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে?"১

নিসর্গ-সৌন্দর্য সমর সেনের মন ভোলাতে পারেনি। আজকের পৃথিবীর যে বড় সমস্য সমাজ-জীবন-তারই উপাদানের বিষম প্রাচুর্য তাঁকে ক্লিষ্ট করেছে। নগর চেতনায় তাঁর কবিতার দেহ নির্মিত। তিনি বিপ্লবী কবি না হয়েও গণ-যন্ত্রণায় বিক্ষত। গদ্য-প্রভা তাঁর কাব্যরীতির শ্বাস রোধ করেনি। বাক্‌ছন্দের সঙ্গে কাব্য-ছন্দের অপূর্ব মিলন কবি ব্যক্তিত্বে স্বাতন্ত্র দিয়েছে। একার জগতে বাস করেও দশের সুখ শান্তির কথা ভাবতেন বলেই তাঁর কবিতার চিত্রকল্প এত জীবন্ত।

ভাষার ক্ষেত্রে তাঁর মুন্সিয়ানা,/গদ্য-ভঙ্গিতে পদ্যের বিরাম, প্রিয় ছন্দকেই মনে করিয়ে দেয়: 'স্তব্ধ অর্ধরাত্রে আমাকে তুমি ছেড়ে যাও/মিলনের মুহূর্ত থেকে বিরহের স্তব্ধতায়/কিংবা—'ভবলীলা সাঙ হলে সবাই সমান—/বিহারের হিন্দু আর নোয়াখালির মুসলমান/নোয়াখালির হিন্দু আর বিহারের মুসলমান।'/কিংবা—'হে শহর, বিষণ্ণ শহর!/সূর্য অস্ত গেলে,/কোনো কোনো পথে/ছায়া পড়ে মন্থর উটের/ মরুভূমির ক্লান্তি গায়ে লাগে/হে শহর, বিষণ্ণ শহর।

কবির স্বীকৃতি: আমার ঐশ্বর্য নেই, নেই রঙ, নেই রোশনাই—
শুধু মাত্র ছন্দ আছে, তাই দিয়ে শুভেচ্ছা পাঠাই॥

সূক্ষ্মভাব প্রকাশের উপযোগী সমর সেনের চকচকে সুবোধ শব্দে গাঁথা ভাষা দুর্বোধ্যতাকে সহজভাবেই ঠেকিয়েছে। চলিত ভাষাকে সাধু-সঙ্গদানে তাঁর জীবনের কৃতিত্ব শুধু মার্জনা শক্তিরই পরিচয় নয় এদিয়ে কবি যেন গণ্য এবং গণ্যের মধ্যে সম্পর্কের কোন নতুন শিল্পমাত্রা সৃজন করেছেন। উপলব্ধির গাঢ়তা থেকেই শব্দানুষঙ্গে এই ধরনের প্রতিরূপ গঠিত হয়েছিল: বলা বাহুল্য

---

১৯ ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত। মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক—৩য় খণ্ড। পৃঃ ২৫—২৬। (কাব্যদৃষ্টিও সমর সেনের 'তিনপুরুষ'—মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়) ১ম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৫ এপ্রিল ১৯৭৮। প্রকাশক: বুক মার্ক/৬ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রিট, কলি-১২।

তিনি কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সাধ্যাতীতভাবে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। অতীত এবং বর্ত্তমানের কোনো কবির বাঁধা পথে না এগিয়ে অত্যন্ত সাধারণ শব্দ, ভাষা, ছন্দ, পদ্ধতি এবং প্রতিবাদ উৎক্ষেপনের কৌশল ভেঙেচুরে কবিতার জগতে নতুন ব্যঞ্জনার বৈচিত্র্য আনলেন সমর সেন। কবি প্রচারক কিংবা গণ আন্দোলনের উদ্বোধকও নন। কথার বাঁধুনিতে উপলব্ধিকে মাত্র সাজিয়েছেন। তাঁর উপমার সার্থক নির্ব্বাচন, নিপীড়িত জনগণকে দুর্ধর্ষ হবার আশা যোগায়। নগর চেতনা, কথ্যরীতি, কাব্যরীতি, বাক্-ছন্দের সঙ্গে কাব্য ছন্দের মিলন কবি ব্যক্তিত্বে অনুকরণহীণ বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ, এ-সবই তাঁর কবিতার আঙ্গিক-সম্পদ :

উদাহরণ :

১* শুধু কিসের ক্ষুধার্ত দীপ্তি, কঠিন ইশারা,/কিসের হিংস্র
হাহাকার সে চোখে।—('নাগরিকা')

২* আকাশে ধোঁয়ার ক্লেশ, চারিদিকে ধোঁয়ার গন্ধ/আর হাওয়ায়
অসংখ্য ধুলোর কণা/জীবন্ত বীজাণুর মতো।— ('ঝড়')

৩* এখানে কি কোনদিন বসন্ত নামবে/সবুজ উদ্দাম বসন্ত !—('চার অধ্যায়')

৪*ক) মাতালের স্খলিত চীৎকার/ঘুম আসবে না/রাত্রি শেষে কলের বাঁশির
তীব্র হাহাকার/
খ) রিকশার উপরে ক্লান্ত চীনে গণিকা যখন চোখ বোজে/
গ) সময় কাটে ট্রামের অবিরাম মুখর শব্দে/অধ্যাপকদের বক্তৃতায়,
ঘ) একটি ক্লান্ত শ্বেতাঙ্গিনী আলোয় থমকে দাঁড়ালো/
ঙ) লজ্জাহীন গণিকার সলজ্জ প্রণয়/
চ) মধ্যরাত্রে/ধাবমান ট্রেনের মন্থর শব্দ/—('মৃত্যু')

৫*ক) ট্রাম লাইন শেষ হলে, শেষ হলে ধূসর শহর/রাত্রে চাঁদের আলোয়
শূন্য মরুভূমি জ্বলে/বাঘের চোখের মতো
খ) কয়েক টাকায় কয়েক প্রহরের আমার প্রেম/তারপর সামনে শূন্য
মরুভূমি জ্বলে/বাঘের মতো।—('স্বর্গ হতে বিদায়')

৬* রাত্রে নিবির প্রেম : কুসুমের কারাগার।—('মদন ভস্মের প্রার্থনা')

৭* ভিজে ফুলের মতো নর্তকীর নরম শরীর/প্রতীক্ষায় স্পন্দমান কত
স্ফীত উজ্জ্বল বুক/তবু আজ মৃত্যু এলো আষাঢ়ের মেঘের মতো/হে
অগ্নিবর্ণ !—('অগ্নিবর্ণ')

৮**ক) মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি/
খ) আর কত লাল শাড়ি আর নরম বুক, আর টেরিকাটা মস্তন মানুষ/আর হাওয়ায় কত গোল্ডফ্লেকের গন্ধ/হে মহানগরী।—('নাগরিক

৯*ক) সকালে কলতলায়/ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে/
খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি;
খ) আর শহরের রাস্তায় কখনো বা প্রাণপণে দেখি/ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।/আর মদির মধ্যরাত্রে মাঝে মাঝে বলি :/
মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও/পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো/
হানো ইস্তপাতের মতো উদ্যত দিন।/—('একটি বেকার প্রেমিক')

১০* তোমার ক্লান্ত উরুতে একদিন এসেছিল/কামনার বিশাল ইশারা।/
ট্যাঁকেতে টাকা নেই/রঙিণ গণিকার দিন হল শেষ/আজ জীবনের কুঁজ দেখি তোমার গর্ভে/সেদিন লুপ্ত হোক, যেদিন পুরুষ
পৃথিবীতে আসে।/—('ঘরে বাইরে')

১১* গ্রামে গ্রামে মাঘ মাসে দীর্ঘ দেহ কাবুলীরা আসে/ঘুরে ফিরে হানা দেয় ঘরে ঘরে/বর্বর ভাষায় কাঁচাপাকা দাড়ি হাওয়ায় নড়ে/
চায়ের দোকানে বিনষ্ট দল/শুধু মনান্তরের কর্কশ কোলাহল/—
('কয়েকদিন')

১২* শোনো, শিশুর কান্নার মতো পাখির শব্দ/তবে চল, তুমি আর আমি/যতদিন ক্লান্তি না আসে ততদিন/স্নিগ্ধ বুকের মধ্যরাত্রে বন্দী রাখ/—('চিত্রাঙ্গদা')

১৩* উচ্ছিষ্ট নিয়ে ভিখিরী কুকুরের ঝগড়া/—('বিরতি')

১৪* আমি মাত্র/মেছুনীর সামনে সরস কেরানী/ফিরে যাই ঘরে;
ভাবি, এখনো সময় হয়নি;/—('অজ্ঞাতবাস')

১৫* আপন চর্চায় শুধু শূন্য ফানুস ফাঁসে,/বিধি হলে বাম/আপনি বাঁচালে বাপের নাম/সে দিন নেই/—('একটি কবিতা')

১৬* সখি, শেষে কি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরে/ব্রহ্মচারী বেশে পণ্ডিচারী যাব।—('বক ধার্মিক')

১৭* ক) বয়ঃসন্ধির সময়/মহাত্মাজীর আন্দোলন শুরু হল/

খ) বন্ধ সংবাদপত্র, রাস্তা নিষিদ্ধ পোষ্টার :/জার্মানরা বুঝি বা বঙ্গোপসাগরে এল ।/লাল পাগড়ির লাঠির সামনে/(বঙ্কিমী সে লাঠি)/দেশবন্ধু পার্কে এলোমেলো পলায়ন/আজো মনে পড়ে ।

গ) গণ আন্দোলনের তত্বকথা/শুনেছি, মহাত্মাজীর অহিংসা পণ্ডশ্রম/ভণ্ডামী মাত্র ।—('রোমন্থন')

১৮*ক) প্রেম ও পলিটিক্সের বিচিত্র গতি/হৃদয় বিষাদে ভরায় ।

খ) নেপথ্যে অহরহ আশ্বাসবানী/গণতন্ত্র আসন্ন ;—('হৃসন্তিকা')

১৯* অত্যধিক পরিশ্রমে হাহুতাশ চাপি/কেননা ব্যক্তিগত গান গাওয়া কর্ত্তব্য নয় ;/যদিচ পৈত্রিক আশ্রয়ে এখনো বসবাস/যদিচ বেকার, নিঃসঙ্গ, মনে মনে প্রেমিক/তথাপি বামপন্থী পত্রিকায়/আসন্ন বিপ্লবের গান অবশ্য উচিৎ ।—('পরিস্থিতি')

২০*ক) সঙ্গীহীন বুড়ো ভাবে সন্ধ্যায়/সমাজ বদলেছে অনেক, নিরুপায়,/ নইলে হে হরি/এ বয়সে মন্দ লাগত না আর একটি কিশোরী ।

খ) আজকাল ঘরে ঘরে সমাজ ধার্মিক অনেক/মুখে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বুলি/মনে রোমান্টিক বুলবুলের অবিরত গান/তুমি ছিলে তারি একজন/এ অধমও তারি একজন ।—('কয়েকটি মৃত্যু')

২১* তাই অনেক কিষাণ আজ জমায়েত, সরবে হাঁকে/লাঙল যার জমি তার ।—('সন্ধ্যানামে')

২২* বহুদিন আশা ছিল—আশার ছলনা—/মনোমত সঙ্গিনী, সঙ্গে কিছু টাকা ;/ছেলে পিলে বেশি নয়, মোট দু তিনটি/অন্তরঙ্গ দোস্ত একটি ।—('নানাকথা')

২৩* নবজাত শিশুর সহজ কান্নায়/শতাব্দীর যন্ত্রণার পর/নতুন দিন আসুক সভ্যতার পরম চিত্তশুদ্ধিতে ।—('পঞ্চম বাহিনী')

২৪* চোরে চোরে মাসতুতো ভাই ;/নিবিড় মিতালি মহাজন ও শকুনে ।—('২২ শে জুন')

২৫* অনেক ফিরেছি ধনীর পিছনে,/দরিদ্রে কেহ না সম্ভাষে ।/বড়লোকে আস্থা নেই আর/দেখেছি দেশের দুর্যোগ/কী উপায়ে কাঁচা টাকা ভাঁড়ু দত্ত করে ।—('গৃহস্থ বিলাপ')

ক

সমর সেনের উল্লেখ যোগ্য এই কবিতা গুচ্ছ থেকেও : ৯ই 'আগষ্ট ১৯৪৫' ; খ 'অকাল' ; গ 'নানাকথা' ; ঘ 'সন্ধ্যানামে' ; ঙ 'দেওয়ালী' ; চ 'যকবার্মিক' ; তার গণ-প্রেমের উষ্ণ প্রকাশ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে :

ক : লাটের ভেলকিতে পরম শত্রু আজ দোস্তে পরিণত,/স্বজন শত্রুতে ;/ এখানে রাজনীতি শুধু পরনিন্দা, পরচর্চা, বুড়োর ঝামেলা/ইজ্জতের গোলাম যারা,/ এক রোখা অন্ধরাগে আত্মঘাতী যারা/এ দুর্দিনে তাদেরি আসর, রাজনীতি তাদেরি পেশা।

খ : বিকল অন্তরে যেন বিদেশী বাঙাল/বিচ্ছিন্ন শহর প্রান্তে/দূরে দেখি মাঠে কত ধানের দুলাল/কিষাণের চষা ক্ষেত নিমক হালাল।

গ : জানি, ওরা নয় বৈশ্য সভ্যতার জারজ সন্তান,/গলিত ধনতন্ত্রের চতুর বিভীষণ ;/তাই সক্রিয় আশা মৃত্যুহীন জাগে অনেকের মনে,/অপরের শস্যলোভী, পরজীবী পঙ্গপাল/পিষ্ট হবে হাতুড়িতে, ছিন্ন হবে কাস্তেতে।

ঘ : আমার এ স্তব্ধতা ভেঙে দাও/মাঠে সকালে সবুজ ফসল জাগো/শূদ্রের অসমাপ্ত বৃত্ত সম্পূর্ণ কর/তোমার দানে।

ঙ : এখানে শুয়েই আমি কানে শুনি আর্তনাদ খালি,/মুমূর্ষু কলকাতা কাঁদে, কাঁদে ঢাকা, কাঁদে নোয়াখালি,/সভ্যতাকে পিষে ফেলে সাম্রাজ্য ছড়ায় বর্বরতা : এমন দুঃসহ দিনে ব্যর্থ লাগে শুভেচ্ছার কথা।

চ : আবার আড়চোখে চেয়ে দেখি আমার মানস পৃথিবীতে/বিরোধের বীজ পুঁজি, কত স্বর্ণবণিক ঢোকে,/কী অপরূপ প্রশান্তি মুখে !/এরোপ্লেনের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় ওড়ায়/বকমুখ মন্ত্রীর নাম।/গাত্রদাহ শুধু নিস্ফল আক্রোশ।

এই উদ্ধৃতাংশগুলিতে নগর জীবনের কুশ্রীতা, ক্ষয়িষ্ণু মানুষের হাহাকার, রাজনীতির ক্লান্তিকর অন্তর্বিরোধ, সাম্প্রদায়িক-দাঙ্গায়-রক্তক্ষয়, প্রভৃতি অত্যন্ত স্থূল মানসিকতা প্রসূত সৃষ্টিধ্বংসী কার্যকলাপ, সমর সেন অকপটে পাঠক চিত্তে পৌঁছে দিয়েছেন। নিয়মভঙ্গকারী অসামাজিক মানুষ যুগ সংকটকে জনজীবনে দুর্বহ করায় কবি চিন্তিত এবং অসহায় বোধ করেন। তবু তিনি আশাবাদী। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং ক্ষোভে জ্বালায় 'ঐতিহাসিক-পৌরাণিক প্রতীককে সাম্প্রতিক জীবনে প্রবিষ্ট করিয়েছেন। তাঁর বিচার রশ্মি যথার্থভাবেই আলোকে উজ্জ্বল করেছে সচিত্র জীবন :

১) আলেকজাণ্ডার/হিটলার/মীরজাফর/মেকলে/মহম্মদীবেগ,ক্লাইভ/ডালহাসী প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী এবং আত্মসুখ লিপ্সুর চিত্রে রঞ্জিত। আর

২) শকুনি/সঞ্জয়/ধৃতরাষ্ট্র/বিভীষণ এঁদের কেউ শঠ, বন্ধুপ্রেমিক, কোমল-কঠোর, সত্যান্বেষী।

আসলে এঁরা কেউ নামজাদা আদর্শপুরুষ নন। ইতিহাস সচেতন কবি গণ সংযোগের সেতু রচনা করে কবিতাকে হাল আমলের চড়া রাজনীতির ময়দানে দাঁড় করিয়েছেন। তাতে কবিতার নিয়ম ভাঙেনি, বরং গাম্ভীর্যের বৃদ্ধি ঘটেছে। ফলে জীবন যন্ত্রণার মধ্যে কবিতার বিশুদ্ধ বিচরণ থেমে যায়নি।

"ছোটবেলা থেকেই আমি একটু বারমুখো এবং শিশুকে প্রকৃতির। গল্প গুজবে খেলাধুলোয় হৈ চৈ তে নিজেকে ছেড়ে দিই।" ১

এই বাক্যাংশটি গণজীবনের কবি-কুলের মুখ্য ব্যক্তিত্ব সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনস্মৃতির মূলমন্ত্র। মধ্যবিত্ত সমাজ ডিঙিয়ে সাধারণের শরিক হবার দুর্বার বাসনা তাঁকে সহস্র মানুষের দলে মেশার, কপাট খুলে দিয়েছে। রাজনীতি এবং লেখা দুটোই তাঁর সমসাথী। সাম্যবাদে বিশ্বাসী কবি তাই অতিমাত্রায় সমাজ সচেতন। চির উপেক্ষিত মানুষের জমাট-দীর্ঘশ্বাস তাঁকে চালিত করে। এদের জীবিকা এবং মাথা গোঁজার আশ্রয়ের জন্য তাঁর দীর্ঘস্থায়ী অটল সংগ্রাম। তাঁর কবিতা শ্লোগান নয়, আর্তের বুক ফাটা জীবনবেদের অবিকৃত রূপ। মানুষকে কাছ থেকে দেখার গুণেই তা সম্ভবপর। দু'হাতে দূরত্বের ভারী ব্যবধান সরানোই তাঁর দ্বিধা-দ্বন্দহীন-চিত্তের একটা প্রচণ্ড প্রয়াস। সেখানে সকল বাধা সঙিনে গাঁথতে হলেও সুভাষ মিছিলের সারি নিয়ে এগোতে এগোতে প্রতিবাদের ঝড়ে সব ভেঙে চুরে দেন।

বুদ্ধদেব বসুর প্রণিধানযোগ্য উক্তি :

"সুভাষ মুখোপাধ্যায় দুটি কারণে উল্লেখযোগ্য : প্রথমত, তিনি বোধ হয় প্রথম বাঙালী কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্যজীবন আরম্ভ করলেন না। এমনকি, প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও তিনি লিখলেন না; কোনো অস্পষ্ট মধুর সৌরভ তাঁর রচনায় নেই—কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে যে এখন আমরা ইতিহাসের এমন একটি পর্যায়ে পৌঁচেছি যখন বাঙালি কবির হাতেও কবিতা আর শুধু বীনা হয়ে বাজছে না, অস্ত্র হয়েও ঝলসাচ্ছে।" ২

১। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। পরে এসে আগে চলে যাওয়া। বর্ত্তমান সম্পাদক : বরুন সেনগুপ্ত ০১৮-৭-৮৫ ; বর্ত্তমান প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ৭৬, এ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড কলিকাতা—১৪।

২। বুদ্ধদেব বসু। কালের পুতুল। পৃঃ ৮০-৮১। ১ম প্রকাশ ১৯৪৬ নিউজ সংস্করণ মাঘ, ১৩৬৫ জানুয়ারী, ১৯৫৯। প্রকাশন জে, এন, সিংহ রায়, ২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১

২১৮

গড়নের দিক থেকে সুভাষবাবুর কবিতার শব্দেরা শোষক-শোষিতের পক্ষ-প্রতিপক্ষ তৈরী করে লড়াইয়ের ময়দানে দুই শিবিরে দণ্ডায়মান। শক্তি পরীক্ষার নিশ্চিত পরিবেশ কবির অভিপ্রেত পথ ধরেই কবিতায় রূপবান (প্রথম দুটি দৃষ্টান্ত)। শেষ দুটি দৃষ্টান্ত জীবনের আশা-আদর্শ নিয়ে সংগ্রামী মানুষের আলাপচারী :

এক* কঃ কে যায় ?
খঃ আমরা।
আমরা গাঁয়ের
আমরা শহরের
হাড়কালি মানুষ
চলেছি মিছিলে।
কঃ হাতে কী ?
খঃ নিশান।
কঃ কোথায় যাও ?
খঃ দমন রাজার
দরবারে।
কঃ থামো—
খঃ —না।
কঃ বাধা দিলেও
খঃ —না।
কঃ সঙ্গিনে বিঁধলেও
খঃ —না।
রাস্তা দাও।
আমাদের যেতেই হবে
মিছিলে।

(যেতেই হবে : ফুল ফুটুক)

অথবা দুই* কঃ শিকড়ে টান লাগছে
খঃ লাগুক—
কঃ শিকড়গুলো শক্ত ;
শুকনো পাতাগুলো ঝরে পড়েছে
খঃ পড়ুক—
(সন্ধ্যামণি : ঐ)

অথবা তিন• ১ কঃ তুমি ভাবতে ঃ
খঃ হয়ত
কঃ পুড়ে পুড়ে ছাই হবে সেই আত্মক্ষয়ী আগুন
খঃ হয়ত
দাউ দাউ দাবাগ্নিশিখায়
জনারণ্যকে পুড়িয়ে মারবে।
২ কঃ কে যেন ভেকেছে আমায়। কে ?
খঃ মিছিলের সেই মুখ।
(জয়মণি, স্থির হও ঃ ঐ)

অথবা চার• কঃ সোনা আমার, মাণিক আমার
বাছারে,
কী পেলে তুই খুশি হবি
কী নিবি
নতুন এই বছরে ?
খঃ আমাকে দিও খেতে
এক বাটি দুধ দিনে
মাটির ভুটো খেল্না দিও কিনে
বরং
এক বাক্স রং
আকাশে দিও ঢেলে
এবং
বালাই মুছে মাটিতে দিও পেতে
অফুরন্ত স্বপ্ন দেখার
শান্তির পৃথিবী।
(নতুন বছরে ঃ ফুল ফুটুক)

লক্ষ্য স্থির বলেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য এমন সংহত। স্বপ্রকাশিত ইচ্ছার তাগিদ থেকেই তাঁর শব্দের প্রত্যক্ষ আবেদন এত বেশি যুক্তি নির্ভর। অবক্ষয় উত্তরণের অমোঘ প্রয়াস কবিতার শব্দাস্ত্রে অনুরণিত। নতুন শপথ সৃষ্টির বুঝি এইটি মোক্ষম উপায় বা অনিবার্য কৌশল। আর সে কারণেই পাঠকের মনে সরাসরি অসংকোচে প্রবেশা-

ধিকার পায় তাঁর কবিতা। কথার পিঠে কথা আদায়ের অসাধারণ এবং মৌল স্বাতন্ত্র্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঃ

(পাঁচ) ক. আমি চাই কথাগুলোকে/পায়ের উপর দাঁড় করাতে/ খ. আমাকে কেউ কবি বলুক/আমি চাই না। গ. ভাই আমাকে একটু আগুন দাও।/(আমার কাজঃ কাল মধুমাস)/ (ছয়) হে জননী/আমরা ভয় পায়নি/যারা তোমার মাটিতে নিষ্ঠুর থাবা বাড়িয়েছে/আমরা তাদের ঘাড় ধ'রে/সীমানা পার করে দেব।/(জননী জন্মভূমি ঃ ঐ)/(সাত) ডেকে ডেকে আমরা বললাম;/ভুল রাস্তায় এখনও যারা ঘুরছ/যারা এখনও ভুল বুঝছ/ভাই বন্ধুরা আমরা —/এসো!/দেখ, এই মিছিল/এই রাস্তা॥/(এই মিছিল এই রাস্তাঃ ঐ)/ (আট) শত্রুপক্ষ যদি আচমকা ছোঁড়ে কামান—/বলবো, বৎস! সভ্যতা যেন থাকে বজায়।/চোখ বুজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাবো কান।/(প্রস্তাব ঃ পদাতিক)/ (নয়) আসমুদ্র হিমাচল/ আমার বিশ্বাসের জমি।/আমাকে কথায় ভুলিয়ে/সে জমি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না॥/(এই জমি ঃ কালমধুমাস)/ (দশ) শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না/প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা/মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না—/পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।/(মে দিনের কবিতা ঃ পদাতিক)/ (এগারো) আমার প্রিয় রং লাল;/আমার প্রিয় ফুল/গোলাপ।/লাল গোলাপের জন্যে/সাহসে বুক বেঁধে/এখন আমাদের লড়াই॥/(লাল গোলাপের জন্য ঃ কাল মধুমাস)।

'আমার কাজ'—কবিতায় ধ্বংসের সাধে কবি উত্তেজিত নন। আত্ম প্রকাশের ক্ষেত্রে কবির ভাষা স্নায়ুতে উত্তাপ ছড়িয়েও জ্বালাহীন। তাঁর বক্তব্যের প্রশান্ত স্পর্শ আন্তরিক। মানুষের অন্তরে স্বচ্ছন্দ প্রবেশের পরিবেশ সৃষ্টির তাগিদে কবি সুভাষের আর এক আশ্চর্য পদক্ষেপ। গণমানুষের অনুকূল তাঁর রচনা। সাম্রাজ্যবাদীর প্রতিচ্ছায়া কবি দেখেছেন শস্য-লালসার ভিতর। মজুর কিষাণের জীবন যেখানে গতিহীন, অনাদরে ম্লান। ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে কবির আগমন। অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়নের বিপ্লবী মন নিয়ে সাম্যবাদীদের সামিল তিনি। গণের নিজস্ব সাহিত্য না হলেও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনা ওদের জীবন থেকে খুব বেশি দূরের নয়, হয়তো বা স্তরের ব্যবধান অমোঘ সহমর্মিতার টানে একদম মুছে গেছে।

'জননী জন্মভূমি'-র বন্ধন মুক্তিই কবির কামনা। কোন বিতর্কে প্রবেশ না করে সোজাসুজি পরসম্পদগ্রাসীর সমুচিত জবাব নির্মিতিতে তাঁর স্বতন্ত্র কবি ব্যক্তিত্ব।

'এই মিছিল এই রাস্তা,' 'প্রস্তাব' 'এই জমি' 'মে দিনের কবিতা' এবং 'লাল গোলাপের জন্য'—কবিতায় কবি আপন স্বপ্নলোক বিসর্জন দিয়ে মানুষের জন্য নিজেকে সৈনিক কর্মীরূপে উপনিবেশ প্রেমীদের সম্মুখভাগে দাঁড় করান। প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের বাসনায় কবি দৃঢ় প্রতিজ্ঞঃ বারো) তাই এই কৃষ্ণপক্ষে উপবাসী প্রার্থনা জানাই,/আমারে সৈনিক করো তোমাদের কুরুক্ষেত্রে, ভাই। (আর্ষঃ পদাতিক)

কারণ কামনাকে বেদনায় রাঙ্গানো পুনরাবৃত্তিরই পরিচায়ক। বন্দীশালার অসংখ্য নিষেধ লঙ্ঘন করে প্রতিবাদী কবিতার অমোঘ প্রকাশ তাঁর শক্তির সাক্ষ্য। রক্তরাঙ্গা গোলাপ কবির অন্তঃচেতনার অনুষঙ্গ। লাল রং-এর প্রতি তাঁর আকর্ষণ। লাল রঙে আবেগ, উদ্দীপনা, ভয়ঙ্করতা, 'রক্ত' শব্দে শক্তি সংগ্রাম সংঘাতের পরিচয়। কঠোরতার তাপে গালিয়ে আত্মধ্যানকে রীতিমত মনোরম করেছেন কবি: **লালরঙ ঃ**

১) আমারও প্রিয় রং লাল ;/আমারও প্রিয় ফুল/ গোলাপ।/**লাল** গোলাপের জন্যে/ সাহসে বুক বেঁধে/এখন আমাদের লড়াই॥/(লাল গোলাপের জন্য : কাল মধুমাস)/২) **লাল** উল্কিতে পরস্পরকে চেনা—/দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে,/কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?/(সকলের গান ঃ পদাতিক)/৩) কৃষক, মজুর ! তোমরা শরণ—/জানি, আজ নেই অন্য গতি ;। যে-পথে আসবে **লাল** প্রত্যুষ/সেই পথে নাও আমাকে টেনে।/ (কানামাছির গান ঃ ঐ।/৪) পশ্চিমের **লাল** লাল মেঘ অন্ধ হয় পৃথিবীর আশ্চর্য খামারে,/হলুদ ঘাসের প্রান্তে ট্রামের নিষ্ফল সুর দীর্ঘমান তারে।/ (পলাতক—ঐ)/৫) চীনা **লাল** সৈনিকের শরীরে এখন/নিবিড় নির্বাণ-বিদ্যা বীক্ষণ করে কি বেঅনেট?/(পদাতিক ঃ ঐ)/৬) রেখো বিপ্লব, **লাল** ঝাণ্ডার করো নিপাত;/হে দীনবন্ধু, নইলে সমূহ কড়ি বেহাত।/(শ্রেষ্ঠ বিলাপ ঃ ঐ)/৭)/**লাল** নিশানের নিচে উল্লাসী মুক্তির ডাক/রাইফেল আজ শত্রুপাতের সম্মান পাক।/(চীন ঃ ১৯৩৮ ঃ ঐ)/৮) রাজায় রাজায় যুদ্ধ ; (কারণ তারা তো জানতো—/আঠারো ঘা **লাল** বাঘা ছুঁলে!)/এদিকে বেড়েছে বৈরী

কলির গোকুলে ।/(প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার : চিরকুট)/৯) পালাবার পথে ধুলো-ওড়ানোর দঙ্গলে, ভাই/আমিও ছিলাম একজন; আজ প্রাণ-পণে তাই/ভীরুতার মুখে লাথি মেরে লাল ঝাণ্ডা ওঠাই ।/(দীক্ষিতের গান: ঐ)/ ১০) লাল অক্ষরে লিখে রাখলাম/যেন কিছুতেই না ভুলি ।/ পনেরোই ফের আসবো ।/(ফের আসবো : চিরকুট)/১১) আমাদের দাবী কে রোখে ? কে রোখে/লাল ঝাণ্ডাকে ?/ (জবাব চাই : ঐ)/১২) দুধের শিশুকে বুকেতে আঁকড়ে ধরে/ মরে শত শত শহর গাঁয়ের/অগ্নিকোণের মানুষ ।/সে আগুনে পথ চেনে/বঞ্চিতদের দিগন্তজোড়া মিছিল ।/রক্তে রক্তে ভিজে ওঠে লাল নিশান ।/(অগ্নিকোণ : অগ্নিকোণ)/১৩) রক্তের লাল দর্পণে মুখ দেখে/ভস্মলোচন ।/একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে ।/ (একটি কবিতার জন্য : ঐ)/১৪) রাস্তার মোড়ে লাল বাতি জ্বেলে/শকু-নেরা দেয় সঙ্কেত/জোড়া বলদকে দেয়ালে লটকে/ঠোঁট চেটে বলে,/ভোট দে ।/(রাস্তার গল্প : ফুল ফুটুক)/১৫) কালো রাত্রির বুক চিরে,/চলো/ দুহাতে উপড়ে আনি/আমাদেরই লাল রক্তে রঙীন সকাল ।/(বাঁয়ে চলো, বাঁয়ে : ঐ)/১৬) তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেয়ে/আনতে চলেছি/ লাল টুকটুকে দিন ।/(লাল টুকটুকে দিন : ঐ)/১৭) লাল কালিতে ছাপা হল্‌দে চিঠির মত/আকাশটাকে মাথায় নিয়ে/এ-গলির এক কালো কুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে/রেলিঙে বুক চেপে ধরে/এই সব সাত-পাঁচ ভাবছিল—/ (ফুল ফুটুক না ফুটুক : ঐ)/১৮) আমাদের লাল নিশানে/রাতকে দিন করার শপথ গর্জে উঠল /(এই মিছিল এই রাস্তা : কালমধুমাস) ।

রক্ত : ১) যাদের রক্তে উড়ছে আকাশে/মিলের ধোঁয়া,/মুষ্টিমেয়ের খেয়ালেই এই/ভরা ভুবনে/তাদের ভোলা/(এখানে : পদাতিক)/২) নিদ্রিত বন্ধুকে ডাকো, রক্তে তার জ্বলুক আগুন;/শৃঙ্খলিত সেনাপতি,/তাই বলে আমাদের শূন্য নয় তূণ ॥/(অহ্বান : চিরকুট)/৩) রক্ত চোষা দিগ্বিজয়ে ফেরে—/বন্দরে বাজায় ডঙ্কা/চরাচর মৃত্যুজালে ঘেরে ./এই আশ্বিনে : ঐ)/ ৪) ফেরে লুব্ধ পশু;/মিটেছে রাজ্যের ক্ষুধা;/প্রাণ তার বিশ্বময় মৃত্যু আতঙ্কিত,/স্টালিনগ্রাডের মাটি রক্তে তার হয়েছে উর্বর; (স্টালিনগ্রাড : ঐ)/ ৫) ষ্ট্রাইক ! ষ্ট্রাইক ! এক পাও পিছু হটবোনা কেউ/ করুক রক্তারক্তি ।/ উনত্রিশ জুলাই : চিরকুট)/৬) রক্তের ধার রক্তে শুধবো/কসম ভাই/ ব্রেথওয়েটের গোয়ালিয়রের জবাব চাই ./(জবাব চাই : ঐ)/৭) ~~দেয়ালে~~

৭) দেয়ালে গুলির দাগ,
ভাঙা শ্লেট, ছেঁড়া জুতোয়,
ছত্রাকার রাস্তা
পায়ে পায়ে ছিটিয়ে যাওয়া রক্ত।
(এখন ভাবনা : ফুল ফুটুক)

৮) আমি চাইনা—
রক্তে
সংঘাতে
সবাই আমাকে বাজিয়ে নিক।
(এই জমি : কাল মধুমাস)।

মাত্রা রেখেই কবি লঘু শব্দ-শেল ছুঁড়েছেন কোকিল-প্রেমীদের দিকে। তাৎপর্যবাহী এ ইঙ্গিত যুগ-মানসের নিকট অবক্ষয় উত্তরণের সোপান :

তেরো : কাছে থাকব
দূরে গেলেও
কাছে থাকব
দূরেও গেলেও
ফিরে এসেছি দেখ।
(কাছের লোক : কাল মধুমাস)

'কাছের লোক'—এ সর্বহারার আশে পাশে থাকা কবির বাসনা। সাধারণের প্রতি এই মমত্ব বোধ কখনো দূরে সরে যাওয়ায় আরো গাঢ়। অন্তরের আকর্ষণে ছিন্নমূল জনজীবনের স্রোতে মিশতে কবিচিত্ত ব্যাকুল। হয়তো নিছক ব্যক্তিগত সুখের টানে বিচিত্র জগতে প্রবেশ করেছিলেন কবি। কিন্তু সেখানে এই ফেলে আসা মুখগুলো স্মৃতির অতলে কবি প্রাণে হয়তো নিঃসঙ্গতার দাহ সৃষ্টি করেছিল। তাই ভালবাসার নিবিড় আকর্ষণে জনগণেরই উচ্চকণ্ঠের সাড়া মেলে তাঁর কবিতায়।

বিচ্ছিন্নতার ভুল ধরা পড়ায় কবি অনুশোচনায় দগ্ধ। নিশ্চিত বাক্যে সর্বসাধারণকে এবার তাঁর অভিলাষের কথা সুভাষ

জানান। প্রয়োজনের প্রবাহে পুরনো মানুষদের ছেড়ে কবি কোথাও গেলেও, জনগণমন-কে ভুলে যাবেন না। তাঁর এই অঙ্গীকারের মধ্যে সকল অভিযোগ খণ্ডনের এক নিখাদ আবেদন।

নিগ্রোকবি ল্যাংস্টন হিউজেস-র (জন্মঃ ১৯০২) তুলনীয় উদ্যোগ এখানে স্মরণযোগ্য। আশাহত হয়েও কবি তাঁর স্বাধিকারে সোচ্চার :

ক/১. স্বাধীনতা কোনদিনই আসবে না
আজ নয়
কোনদিনই নয়
ভয় অথবা সমঝাওতার মধ্যে
আমারও তো অন্য সকলের মতন
অধিকার রয়েছে
দুপায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকার
দুকাঠা জমির মালিকানার

২. মৃত্যুর পরে তো আমার কোন
স্বাধীনতার প্রয়োজন হবে না
আগামীকালের রুটি
দিয়ে কি বাঁচা যায়

৩. স্বাধীনতা আমার প্রয়োজন
তোমার যেমন

* (স্বাধীনতা : ১০০ বছরের শ্রেষ্ঠ নিগ্রো কবিতা)

---

* শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও মুকুল গুহ সম্পাদিত ও অনূদিত/১০০ বছরের শ্রেষ্ঠ নিগ্রো কবিতা (১৮৬৮-১৯৬৮)। ১ম প্রকাশ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ নভেম্বর, ১৯৮০ প্রকাশক : শ্রীসুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা — ৭০০০৭৩

রাজনীতির নানা কথার কবি সুভাষ তাঁর কবিতার ডালি সাজিয়েছেন। কবি দেখেন, হিংসা গণকর্মীদের মনকেও অব্যাহতি দেয়নি। পালটপুরাণ রাজনীতির অভিধান। শ্রমজীবী মানুষের কোন হাত নেই। শাসক পালটালেও সর্বজনীন ভোটপর্বেও চালাকির দৌরাত্ম্য। নিজেকে শাসন কেউ করে না।

"বুর্জোয়ারা শাঁসটা নিজেরা নিয়ে লোকের পাতে যেটা দেয় সেটা গণতন্ত্রের খোসা। সবাই ভোট দিতে পারে, জোট বাঁধতে পারে চোটপাট করতে পারে। কিন্তু অধিকার যা সবই ওপরসা।" ১

মোট কথা কবির বিশ্বাস প্রকৃত গণতন্ত্রের সুখ সামাজিক মালিকানার ভিতর। পেট এবং মন তবেই তার রসপুষ্টি থেকে বেঁচে থাকার শক্তি পাবে। পাখি পড়া কটি বাঁধা বুলি দিয়ে লোক শিক্ষা হয় না; প্রয়োজন নির্ভেজাল আন্তরিকতা। স্বাধীন দেশে এসবের অভাব কবি মনে বিরাগ সৃষ্টি করেছে। গণজীবন যে তিমিরে সেই তিমিরেই। কবির উক্তি ঃ

"রং করা দেয়ালের তলায় ফুটপাথ নোংরা করে কাঙালীরা মরতেই থাকবে। শুধু গাড়ির রাস্তা বড় করে আর শোবার ফুটপাত ছোট করে তা ঠেকানো যাবে না। যে হিংসে থেকে দেয়ালের বর্ণ কালি হয়, সেই হিংসেকে কবে কিভাবে কারা বরবাদ করবে?" ২

সুভাষের কবিতার বিষণ্ণসুর সাম্য সংহতির ঈপ্সিত লক্ষ্যে স্থির। সেই কারণেই তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রূপকে শাণিত অর্থে কবিতায় প্রতিষ্ঠিত করতে বিচিত্র বিশেষণ, কথ্য বাংলা, পৌরাণিক ব্যক্তি, প্রচলিত বিদেশী শব্দের পাশে রোম্যান্টিক শব্দ মাধ্যম গড়েছেন। 'ইতিহাসের গলিত গর্ভ থেকে' নতুন সমাজ ভূমিষ্ঠ হওয়ার বিশ্বাস রাখেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যও সমাজ-রচনার দায়িত্ব পালন করে, করাও উচিত। বিষয়-মহিমার কথা মননে রেখে সাহিত্যকে গণতন্ত্রমুখী করে তোলার অন্য দিকটি সৃষ্টিক্ষেত্রে কখনই অবাস্তব নয়। যদিও সমাজের তলকুঠরি থেকে সুভাষ আসেননি, তবু তাঁর কবিচিত্তে গণ মনোযোগ মৌলিক।

১* সুভাষ মুখোপাধ্যায় | আহ্লাদী-পেল্লাদী দেয়াল | বৃহস্পতিবার ২৫/৭/৮৭

২* ঐ | ঐ | ঐ

বর্ত্তমান পৃঃ পৃঃ দ্রষ্টব্য

আর তাঁর ধারালো কলা কৌশল জনগণকে চেতিয়ে তুলতে পারবে বলেই এসব কবিতার সার্থকতা। বক্তৃতা ধর্মী কবিতার উচ্চরব সমাজ বিপ্লবের হাতিয়ার। ধনের নেশায় বুঁদ গণ্য শ্রেণীর পাশে অনাহারীদের শীর্ণ দেহ-মনে লজ্জা নিবারণের দাবীর উদ্বোধক সুভাষ।

লেনিন বলেছিলেন ঃ

"All Social-Democratic literature must become party literature. Every newspaper, journal, Publishing house, ete. must immediately set about reorganising its work, leading up to a situation in which it will in one form or another, be integrated into one party organisation or another. Only then will Social—

Democratic' literature really become worthy of that name, only then it will be able to fulfil its duty and, even with in the frame work of bourgeois society, break out of bourgeois slavery and merge with the movement of the really advanced and thoroughly revolutionary class." 1

"Self Status' থেকেই একদিন মুমূর্ষু মানুষগুলোকে বাঁচার ভরসায় মরীয়া হয়ে উঠতে দেখেছেন জীবনদর্শী সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁদের দুর্বল দেহে অদম্য শক্তির জোয়ার। শিক্ষা দীক্ষায় অজ্ঞান হলেও এরা গ্রাম, বন্দর, শহর জুড়ে ঐক্য বন্ধনে দীর্ঘ। সুতরাং ভয় বস্তুটার অন্তর্ধান কাল তখন। মিলেমিশে তারা সজ্জিত সৈনিক। কোন বাধাই তারা মানবে না বলে কবির বিশ্বাস। লোক ভাষায় এইসব মানুষদের চরিত চিনিয়ে দিচ্ছেন সুভাষ ঝরঝরে শব্দের সজোর আঘাতে ঃ

চোদ্দ ॥ কে যায় ?/আমরা। /আমরা গাঁয়ের/আমরা শহরের/হাড়-কালি মানুষ ।/চলেছি মিছিলে ।/থামো—/—না।/ বাধা দিলেও/—না।/ সঙীনে বিঁধলেও/—না ।/রাস্তা দাও ।/আমাদের যেতেই হবে/মিছিলে।

(যেতেই হবে ঃ ফুল ফুটুক)

কবিতার প্রথমাংশে সাধারণ লোকের প্রত্যয় প্রতিধ্বনিময়। সাম্রাজ্যবাদের কঠিন কালোমেঘ জ্বলন্ত সূর্যতেজে ফুরিয়ে যাবার দিন

1 * Lenin /Selected works/Page 152/Third printing 1975/Moscow

গুণুক ; বনেদিয়ানায় উদ্ধত ভাগ্যবানরা শোষণ, শাসনের কথা ভুলে যাক, ঘরভাঙা মানুষের সবেগ প্রাণস্রোত সেই সঙ্গীতে মুখর। কবিতার শেষাংশে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার ঋজু বাসনা বলিষ্ঠ। বুর্জোয়া সমাজে শ্রমজীবীর ব্যথার খবর কে রাখতে চায়? মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের কান্নায়, অভিশাপে শুধু কাতর হয়ে লাভ কোথায়? সত্যিকারের উপশমই বা কী? আজ নৈরাশ্য মুক্তির দেশজ প্রবল ভাবনায় উদ্দীপ্ত সিদ্ধিকামী কালো মানুষ। বর্ণ-ও যে গাত্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। শ্বেতাঙ্গ-নিগ্রো বিরোধ বিংশ শতাব্দীর অস্ত-কালে এখনো রক্তাভ। নিরুপায় নিগ্রো মানুষের দাসত্ব-মুক্তির ইচ্ছা চৈত্র জ্বালায় ফুঁসে ওঠে। তাই গণজীবন থেকে উঠে আসা নির্যাতনের অভিজ্ঞতায় আজ ভিনদেশী কবির চোখে ঘৃণার বক্র তাপ আর ঠোঁটে উচ্চারিত খাটুনি-অন্ত-প্রাণের দাবী। জন হেনরিক্ ক্লার্ক (জন্মঃ ১৯১৫) শোনান ঃ ক)১. দেশবিদেশের স্পর্শ আমার শরীরে/বহতা নানান ঝর্ণার জলপান করেছি আমি/আজ আমি বৃদ্ধ চলৎশক্তি হীন। ২. কিন্তু আমি বেঁচেই চলব দীর্ঘ সময়/পৃথিবীর নির্যাতন, নির্মমতার চাইতে/বেশি-দিন বেঁচে থাকব/নির্যাতনকারিদের চাইতে বেশিদিন।/(সংকল্প ঃ ১০০ বছরের শ্রেষ্ঠ নিগ্রো কবিতা)/কিংবা মারগারেট ওয়াকার-র (জন্ম ঃ ১৯১৫) স্ফীতফণা-সর্পিনীর মতো ফুঁসে ওঠা চৈতন্য-ঝাঁকানো কবিতা ঃ ক)১. অধিকার চাই আমার/অন্য সকলের মতনই ব্যবহার/করতে হবে আমার সঙ্গে।/ ২. আমি ভালই আছি এইখানে/জামিনের/প্রয়োজন নেই আমার/ (জামিন ঃ ১০০ বছরের শ্রেষ্ঠ নিগ্রো কবিতা)/।

সরল ঢঙে নিকানো কবিতা সহজেই ঘুম ভাঙ্গায়। কোটি মানুষের প্রাণ করাল ব্যাধি-মুক্তির প্রেরণা পায়। এই সব কবির কবিতা একদিন কিংবদন্তীর মর্যাদা পাবে। এর নির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যা আমেরু প্রভেদ রচনার তথ্য পরিবেশন করে গণজীবনের অনিবার্য দ্যুতি ছড়াবে।

নিক্কি জোভান্নি-র কবিতায় আরো সহজ বিশ্লেষণ। অতিশয়োক্তির রঙ নেই, অর্থবোধের কষ্ট নেই, সরলরেখার কথাচিত্র মর্মস্পর্শ করে বিবেক জাগিয়ে দেয় ন্যায়বোধের মাত্রায় ঃ ক) ১. আমার বয়স পঁচিশ আমি/ কালো, কবি একজন/কবিতা লিখে জিজ্ঞাসা করি "ওহে/কালো কুকুর তুমি কি হত্যা করতে পারো"/আমাকে হত্যা করলেও আসলে/বিপ্লব

থেমে থাকবে না/ ২. বিপ্লব ছড়িয়ে গেছে পথে পথে/আমি যদি ছ'তলার উপর বসে থাকি/সারাক্ষণ। কোন কিছু নাও করি/তবু বিপ্লব চলতেই থাকবে তার/নিজস্ব গতি পথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিয়মিত/(আমার কবিতা : ১০০ বছরের শ্রেষ্ঠ নিগ্রো কবিতা)/সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় কান পাতলে এর প্রতিধ্বনি শোনা যাবে : পনেরো. পেট জ্বলছে; ক্ষেত জ্বলছে/হুজুর, জেনে রাখুন/খাজনা এবার মাপ না হলে/জ্বলে উঠবে আগুন/(চিরকুট : চিরকুট)/মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ-নজরুল বিদ্রোহের অগ্রজ কবি। তাঁদের কবিতায় পর্যাপ্ত আবেগ। তবু গণ-আন্দোলনের কর্মসূচীতে প্রস্তুত সচেতনতার ভাব-শরিক তখনো তা হয়ে ওঠেনি। সেই সুর কল্লোলিত ভিন্ন প্রেক্ষিতে প্রেমেন্দ্রের সমর সেনের কবিতায়। কামার-কুতোর-মুটে মজুরের কবি প্রেমেন্দ্র শোনালেন : 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে/কাঁদে কোটি মার কোলে অন্নহীন ভগবান মোর।'

সমাজনিষ্ঠ গণ-কবি সুভাষ ও সুকান্ত। নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্লিষ্ট স্বপ্নে বিভোর সুকান্ত। আর আটপৌরে ভাষায় চিত্রকল্পকে তাঁর নিজস্ব ছন্দে আবেগ থেকে মননে নিয়ে গণজীবনকে শিল্পিত করলেন সুভাষ, পথ চিনিয়ে দেবার জন্য।

গণসংগ্রামের কবি তৃপ্ত নন। শ্লেষ বিদ্রূপের দুঃসহ বেদনার আঘাতে ভাষায় তাঁর কবিতার ভাবনা বিশ্ব কবিতার-নিকট প্রতিবেশী। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থ-নৈতিক অন্তর্বিরোধ সমষ্টির জীবনকে নিদারুণ অনিশ্চয়তার ডামাডোলে ছুঁড়ে দিচ্ছে। এই নির্মম আত্মক্ষয় দেখে গণ কবির পক্ষে সুস্থির থাকা সহজ হয়নি। 'ছোট প্রাণ' 'ছোট ব্যথা' তাঁর কবিতার ভিত্তিভূমি : ষোলো. জমি জমা গেছে; শেষে বন্ধক থালা বাসন;/যমের দুয়োরে একে একে যায় আপনজন।/বাল্যবন্ধু ছিল যারা, গেছে নিরুদ্দেশে—/অখ্যাত ফুলে রাস্তা ঢেকেছে কাঁটার বন।/(রোমন্থন : চিরকুট)/মানুষের জীবনে সংগতি রচনার উদ্দেশ্যে কবি আবেগ জড়ানো অলস শব্দ গুচ্ছের বদলে সোজা পথে শক্ত অথচ মজবুত মাপা কথায় শিল্প শৌর্যের অভিনব ইতিহাস রচনা করেছেন চিরকুট' কাব্যে। সতেরো. গ্রাম উঠে গিয়েছে শহরে—/শূন্য ঘর, শূন্য গোলা/ধান বোনা জমি আছে পড়ে।/(স্বাগত : চিরকুট)/আঠারো. কোটি কণ্ঠে গান স্তব্ধ; নিরুদ্যম নিস্তেজ ধমনী—/ ডাক দেয় রুদ্ধদ্বার ক্ষমতার খনি,/ এখনো

ঘরের কোণে বসে আছো ?/নিদ্রিত বন্ধুকে ডাকো, রক্তে তার জ্বলুক অগুন;/শৃঙ্খলিত সেনাপতি,/তাই ব'লে আমাদের শূন্য নয় তূণ ॥/(আহ্বান ঃ চিরকুট)/উনিশ. বিপ্লবের রক্তপথে জানি আসে উজ্জ্বল আগামী;/শয়তান যদিও আনে অনশন, দুঃখের প্লাবন—/হে চীন ! তোমার পাশে আমি ।/(চীনঃ চিরকুট)/কবির বিশ্বাসের পূর্বাভাস সহসা মিলছে অন্য দিগন্তের জীবনভাবুকের রচনায় ঃ

"ভেবেছিলাম, আমেরিকা শ্রমিক-সমস্যার সমাধান করবে। ভেবেছিলাম, সেখানে মানুষের অধিকার সাম্য রয়েছে। কিন্তু সে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। ধনীদের স্বার্থপরতা, বিশেষাধিকার বজায় রাখার চেষ্টা, একনায়কতা আমেরিকাকে গ্রাস করেছে। পাশ্চাত্ত্য সমাজ নরম বলে মনে হচ্ছে। ভাবী অভ্যুত্থান ঘটবে রাশিয়ায় বা চীনে। বলতে পারি না, ঠিক কোথায়।

আমাদের শ্রমিক-সমস্যার সমাধান আমাদেরই করতে হবে। কিন্তু কী ভয়ংকর সংক্ষোভ, কী ভীষণ আলোড়নের মধ্য দিয়ে তা ঘটবে। জাতি বর্ণ একাকার হয়ে যাবে।" ১

কবি কর্তৃত্বকামীদের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার শব্দ-ঝড় তুলেছেন। শাসিতের ভাষায় মেহনতী মানুষ ঝাণ্ডার নিচে সমবেত। শক্তি-অভ্যুদয়ের প্রত্যয়ে দৃপ্ত কবি ঃ কুড়ি. রক্তের ধার রক্তে শুধবো কসম ভাই /ব্রেথওয়েটের, গোয়ালিয়রের জবাব চাই ।/লাখো লাখো হাত এক হলে বলো পরোয়া কাকে ?/আমাদের দাবী কে রোখে ? কে রোখে লাল ঝাণ্ডাকে ?/(জবাব চাই ঃ চিরকুট)/একুশ. স্ট্রাইক! স্ট্রাইক ! সাদাকে করবো কালাপানি পার, তবে যুদ্ধের শান্তি/স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! শৃঙ্খলে চিড় ধরে, ভিৎ টলে, মাথা উঁচু করে ক্রান্তি ॥/(ময়দানে চলো ঃ চিরকুট)/বাইশ. রুখবে কে আজ ? চলে বেপরোয়া ক্ষ্যাপা জোয়ার/ছুটে আসে যারা বঞ্চিত, কাঁধে কাঁধ মেলায়/ হতাশ জীবনে ধরে হাতিয়ার, কেয়ার কার ?/ওঠে আগুনের ছলকা, ক্ষিপ্র ছুটে চলায় ॥/(স্ফুলিঙ্গ ঃ চিরকুট)/তেইশ. এ দেশ আমার গর্ব/এ মাটি আমার কাছে সোনা ।/এখানে মুক্তির লক্ষ্যে

---

১. স্বামী বিবেকানন্দ/জনগণের অধিকার/পৃঃ ৮/চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ ঃ এপ্রিল ১৯৮৩ প্রকাশক ঃ শ্রীচণ্ডিচরণ দাস/অখিলভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল; 'ভুবন-ভুবন' পোঃ বলরাম ধর্মলোপান, খড়দহ, ২৪ পরগণা।

হয়, মুকুলিত/ আমার সহস্র সাধ, সহস্র বাসনা।/(ঘোষণা : চিরকুট)

প্রতিটি কবিতা নির্ভীক কবি-হৃদয়ের উচ্চকণ্ঠ ঘোষণায় আশ্চর্য সরব। আক্রমণাত্মক শব্দবাণ লক্ষভেদ করবেই। দেশ ব্যাপী নির্দেশ-পত্রের মতো গভীর স্বদেশ-আস্থা কবিতায় কবিতায় ছড়ানো।

বাঙলার বাতাসে সাম্যবাদের সুর পূর্বেই অনুরণন তুলেছিল। কিন্তু সুভাষের কবিতা আর একটু বেশি উত্তাপ বিকিরণ করে অনুষ্ণ শোণিত প্রাণে। তাঁর 'পদাতিক' কাব্য সেই শক্তির উত্তুঙ্গ প্রকাশ : চব্বিশ. প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য/এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা,/ দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য/চিনে নেবে যৌবন-আত্মা ॥/(মে দিনের কবিতা: পদাতিক)/

পঁচিশ, কমরেড, আজ নব যুগ আনবে না ? / কুয়াশা কঠিন বাসর যে সম্মুখে। / লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা—/ দলে টানো, হত বুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে / কমরেড, আজ নব যুগ আনবে না ?

(সকলের গান : পদাতিক)

এ-দুটি কবিতাপ্রসঙ্গে কবিবুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য মূল্যবান :

,, এ-সব চটুল ছন্দ শুনিয়েই সত্যেন্দ্র দত্ত একদা আমাদের মন মজিয়েছিলেন, কিন্তু সুভাষের এ-ধরণের রচনাগুলিতে একটি **lilt** আছে যা একান্তই তাঁর নিজস্ব। এ-সব ছন্দ প্রায়ই এলিয়ে পড়তে চায়, একঘেয়েমির দুর্মূল্যে এদের মধুরতা কিনতে হয়, কিন্তু মাঝে—মাঝে যুক্তাক্ষর ছড়িয়ে সুভাষ এদের বাঁচিয়েছেন। এ-কবিতা দুটি আমার নিজের খুব পছন্দ নয়, কিন্তু এ-দুটি পড়ে মনে হয় যে 'জনগণের কবি' হবার প্রায় সমস্ত উপাদান এই তরুণ কবির আছে। অতীতের যে সব কবির সঙ্গে পাঠক সমাজের যোগ ছিলো প্রত্যক্ষ, তাঁদের কথনভঙ্গিতে একটি অকুণ্ঠিত ঋজুতা পাওয়া যায়, কেননা সাধারণ লোক নিয়ে গঠিত একটি শ্রোতৃমণ্ডল মনের সামনে রেখেই তাঁরা লিখতেন। কবিতাকে বক্তৃতা বা কথকতার কাজে লাগাতে তাই তাঁদের লজ্জা ছিলো না, বরং আনন্দ ছিলো। শ-র 'ক্যাণ্ডিডা' নাটকের কবি যখন বলেন, **All poets speak to themselves, the world only overhears**, তখন আধুনিক সমাজে কবির অবস্থার বর্ণনা করেন তিনি, কিন্তু যে-সমাজের কবির শ্রোতা ছিলো জনসাধারণ,

মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী নয়, সে-সমাজে কবি নিজের মনে গুনগুন করতেন না, বেশ চেঁচিয়ে সকলের শোনবার মতো করেই কথা বলতেন।" ১

ছাব্বিশ, কৃষক, মজুর ! আজকে তোমার পাশাপাশি/ অভিন্ন দল আমরা। বন্ধু' আগে চলো— / সবাই আমরা নিজ বাস ভূমে পরবাসী ; / এই দোলাচল দলকে কেবল পথ বলো॥

২

কৃষক, মজুর ! তোমরা শরণ জানি, আজ নেই অন্যগতি ;/ যে-পথে আসবে লাল প্রত্যুষ / সেই পথে নাও আমাকে টেনে। (কানামাছির গান ঃ পদাতিক)

সাতাশ, হা-ঘরে আমরা ; মুক্ত আকাশ ঘর, বাহির। হে প্রভু ; তুমিই শেখালে পৃথিবী মায়া কেবল-/ তাইতো আজকে নিয়েছি মন্ত্র উপবাসীর ; / ফলে নেই লোভ ; তোমার গোলায় তুলি ফসল। (প্রস্তাব ঃ ১৯৪০ঃপদাতিক)

আটাশ, তবে যুদ্ধ আজ। / রাজন্যের অনুকম্পা নেই, / প্রজাপুঞ্জের স্বপ্ন-ভঙ্গ / বণিক প্রভু চোখ রাঙায় / কারখানায় বন্ধ কাজ/ (ইতিহাস আমাদের দিক নেয়) ।-(পদাতিক ঃ পদাতিক)

সাম্যবাদী কবিরা ব্যক্তি প্রেমী নন, তাঁরা অখণ্ড জীবণের মুক্তি কামনায় অধীর। সুভাষ, এই দলভুক্ত। তাঁর কবিতায় কণ্ঠস্বরের দীপ্তি তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, বিদ্রোহ-ঘোষণার সৈনিক করেছে।

স্বাধীনতা-পূর্ব-মানসিকতা আজকে বেমানান। তবে যাদের সুখের জন্য মাথা ব্যথা—তারা কি সাম্প্রতিক কালে সুখী ? এ প্রশ্নের উত্তর অপরিচিত নয়। তাই কবি বিস্মিত। তিনি দেখেছেন শাসকের যন্ত্র অপরিবর্ত্তিত। সাধারণ মানুষের স্বপ্ন সত্য হওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই তবু রাজনীতি মানুষের জন্যই—এই কথা কাব্যায়িত করে সুভাষ জন গণকে শুনিয়েছেন ঃ

ঊনত্রিশ, ধানের জমিরা পাশাপাশি শুয়ে/ দিগ্বিদিকে—/ খাড়া করে কান কাস্তের শাণ/ শুনছে নাকি/ কামার শালে ?— (এখানে ঃ ঐ)

১, বুদ্ধদেব বসু। কালের পুতুল। পৃ ঃ ৮৩। পৃ ঃ দ্রষ্টব্য।

'ছেঁড়া জুতেটায় ফিতেটা বাঁধতে বাঁধতে' কবিতার নতুন চিত্র কল্পে সুভাষ উজ্জীবনের কথা বাঁধেন, লড়াই—এর ডাক দেন। সে ডাকে কানে তালা লাগে না। জন সভায় জমায়েত হওয়া যায়। সেই কারণে সুভাষ মুখোপাধ্যায় পীড়িত মানুষের কবি। পরাধীন দেশে মানুষের দুঃখ দেখেছেন বলেই রাজনৈতিক চেতনায় তিনি বেশী উদ্বুদ্ধ চোখ ফেরান আত্মসুখ থেকে। সমাজ সচেতন কবির চোখে স্বাধীন ভারত নতুন কিছু নয়। শাসক পাল্টেছে, পদ্ধতি অপরিবর্ত্তিত। বিশ শতকের অপরাহ্নেও তাই কবি হতাশ ঃ

" জীবন জটিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চেয়েও জটিল এই সময়। ধর্মের বাবাজীরা আজকাল বহুরূপীর ভূমিকা নিয়ে রাজনীতি আর অর্থনীতির আসরও মাত করতে চাইছে। একে রাস্তা পিছল তায় নেতারা অনেকেই রাতকানা। ফলে পদে পদে আছে আছাড় খাওয়ার ভয়। 'সাধু, সাবধান।" ১

সুভাষ মুখোপাধ্যায় শঙ্কিত কিন্তু নির্ভীক। আশংকা নীচতার কর্দম থেকে উদ্ভূত বলেই বিদ্রোহী-জনতার-কবি মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠীত করার জন্য বিশিষ্ট শব্দের অঙ্গারে গড়া কবিতায় অগ্নিসংযোগ করেন ঃ

ত্রিশ, এমন জায়গায় বসবি যেন কেউ বলে না-সর্।
এমন কথা বলবি যেন কেউ বলে না-মর্॥

* (মানভমি ঃ বর্ত্তমান পত্রিকা)

" গান্ধীবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রতিবাদ এসেছিল মার্ক্সপন্থী বিশেষত ঃ সাম্যবাদীদের তরফ থেকে। ১৯১৯ সালে তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ভারতবর্ষে সাম্যবাদ বিস্তারের চেষ্টা আরম্ভ হয় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে। ডাঙ্গের সম্পাদক সোস্যালিস্ট পত্রিকা (১৯২৩) এবং মুজফ্ফর আহ্-

---

১, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। কুড়িরে (জীবনে আর লেখায় গাঁটছড়া)। তাং ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ (৮ই ফাল্গুন ১৩৯২) বর্ত্তমান পত্রিকা পৃঃ ৬ষ্টব্য

* সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কুড়িয়ে কুড়িয়ে (জীবনে আর লেখায় গাঁটছড়া) তাং ২০।২৮৬ পৃঃঋ ঃ

মদের সম্পাদনায় বাংলা জনবাণী পত্রিকা (১৯২৩) প্রকাশিত হতে থালে। ১৯২৪ সালে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মানবেন্দ্র রায়ের মনোমালিন্যের ফলে ভারতে সাম্যবাদ প্রচারের দায়িত্ব রজনীপাম দত্তের হাতে পড়ে। ১৯২৭-২৮ সালের মধ্যে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯২৯ সালের মধ্যে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁদের কার্যকলাপ প্রথম জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম থেকেই কম্যুনিস্ট পার্টি অসহযোগ আন্দোলনের অসারতা প্রতিপাদন করে গণ-ধর্মঘট প্রভৃতি মাধ্যমে বৈপ্লবিক চেতনা সঞ্চারের চেষ্টা করেন। অহিংস আন্দোলন তাঁদের মতে বুর্জোয়া-আন্দোলন এর মূল লক্ষ্য সাম্রাজ্যদের ধ্বংস; নয়, বরং তার কাছ থেকে কিছু আদায় করে ধনতন্ত্রকেই শক্তিমান করা। এঁরা অহিংসার পথকে প্রত্যাখান করলেন এবং গ্রামোন্নয়ন, কুটির শিল্প ও চরকা আন্দোলনকে সামাজিক ধন-বৈষম্য এবং শোষণ ব্যবস্থা রক্ষার্থ বুর্জোয়া চাতুরী বলে ঘোষণা করলেন। সন্ত্রাসবাদেরও তাঁদের অনাস্থা ছিল। কারণ তাকে কৃষক ও শ্রমিকের বিশেষ কোন ভূমিকা ছিলনা এবং শ্রেণি সংগ্রামের কোন প্রস্তুতি ছিল না" ১

নিরন্তর যুগসংকটে ক্লিষ্ট সুভাষের অসুখী মন স্বার্থের চেয়ে জন-কল্যাণের ইচ্ছায় অধীর। শ্রেনী-বন্ধন থেকে উত্তরণের নিরলস সাধনা জন-কবিকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে স্বৈরতন্ত্রের অলিগলি পেরিয়ে একেবারে সোজা গণ-সমুদ্রে। সেখানে আত্মদর্শন থেকে সমষ্টি দর্শনের মধ্যে কবি খুঁজে পেয়েছেন জীবনের লক্ষ্যবস্তু। তাই উচ্ছাসহীন কর্তব্যের কঠিন ডাকে বিপুল প্রাণময়তায় তিনি কর্মমুখী।

নিগ্রো কবি সোনিয়া সানচেজ (জন্ম ১৯৩৫) আত্মপ্রত্যয়ে স্পষ্ট। পরিত্যক্ত? মানুষের আত্মবিনাশের ভীতি অপসারণ করতে কবিতায় চাবুক চালিয়েছেন তিনি সমর্থ শব্দখানি থেকে তুলে আনা তাঁর বাণী বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় বিস্ফোরক ঃ

১। দীপ্তি ত্রিপাঠী। আঃ বাঃ কাব্যপরিচয়। পৃঃ ১৩-১৪। ১ম প্রকাশ শ্রাবন ১৩৬৫ আগষ্ট ১৯৮৫। প্রকাশ দে'জ পাবলিশিং ৩১/১ বি মহাত্মাগান্ধীরোড। ফোন-৭০০০৯

ক/১, ওদের মরে যেতে দিও না,/ ওই বৃদ্ধ/কালো/ লোক-জনদের/ ওদের দাসত্বের/ অস্তিত্বে স্মৃতিটুকু নিয়েই/ শুধু চলেযেতে দিও না

২, তুমি জানো ; আংশিক/ আফ্রিকান ।/ আংশিক/নিগ্রো/ আংশিক ভৃত্যশ্রেণীর/

৩ এই সব গল্প গাথাগুলো লিখে রাখো আগামীকালের জন্য ।

৪, যাতে/ আমাদের মন সমতা ফিরে পায়/ দৃঢ় হয়ে উঠতে পারে-

(এখন কবিতা। আমাদের জন্য ঃ ১০০ বছরের শ্রেষ্ঠ নিগ্রো কবিতা)

সুভাষও সফলতা অর্জনের বিশ্বাস নিয়ে 'সকলের গান' শোনান কমরেডদের । নতুন যুগ সৃষ্টির সময় উপস্থিত । 'বাস-ভূমে' 'পর-বাসী,' এর চেয়ে লজ্জাকর গ্লানি আর কি হতে পারে। মনে এই জ্বালা প্রকট হয়ে উঠলে ভাঙাগড়ার নেশায় মেতেছেন তিনি। অব-শেষে নতুন দিন এলো বটে তবু কবি-হৃদয়ে সেই সুখ কোথায় ? তাই সুভাষের কবিতার মর্মে—সর্ব-জন-সুখ আদায়ের প্রসারিত সূর্য-কর। ফুল নিয়ে খেলার অবসর নেই কবির। সুন্দর জীবনের অপচয়ে কবির যন্ত্রনা। তিনি দুর্যোগের নিষ্ঠুর সত্যের মধ্যে বিশ্বগত ব্যথা অবসানের কিনারা খুঁজেছেন। গভীরতর স্বার্থে সবার মনে সেই বাসনা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

আন্দোলনে আন্দোলনে পরাধীনতার শৃংখল জীর্ণ করে যেভাবে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া হলো, অনুরূপভাবে 'লাখো লাখো হাত' এক করে 'মানবাধিকার' বিশেষ শ্রেণীর মুঠো থেকে কেড়ে নিতে হবে প্রয়োজনে 'রক্তের ধার রক্তে' পরিশোধ করতে হবে। 'অবরুদ্ধ ক্ষমতার খনি' খুঁড়তে নিদ্রিত বন্ধুকে' ডাকতে 'হবে, রক্তে তার' আগুন জ্বালাতে হবে ।

সাধারণের জন্য সুভাষের অসাধারণ ভাবনা। 'পেট-জ্বলছে' অথচ 'গ্রাম উঠে গিয়েছে শহরে'। এদৃশ্য কবি-প্রাণে আসন্ন বিপদের ইঙ্গিত দেয়। অবশ্য কৃষক মজুর স্বেচ্ছায় ঘর ছাড়া হয়নি। প্রাণ ধারনের মতো সংগতির একান্ত অভাবে জমিজমা বেচে, 'থালা-বাসন' বন্ধক রেখে মাত্র জীবন বাঁচানোর সামান্যতম আশা নিয়েই সেদিকে ছুটে চলেছে। তাদের ফিরিয়ে না আনলে কবি সুভাষ মনে করেন, সকলের সর্বনাশ।

তাই তাঁর কবিতার পদে পদে প্রতিবাদী শব্দ ফেটে পড়েছে। অগ্রসর এই ধ্বনি-বিপ্লব ইন্‌টেলেক্‌চয়াল মানুষের হৃদ-কম্পন। পাষাণ-হৃদয় বাতাসে নড়ে না, ভাঙতে গেলে ধাক্কা দিতে হয়, ছেনি হাতুড়ির ঘা-য়ে। সেই দক্ষতা সুভাষের কবিতায়। তাঁর লেখা নিরাপদ সুখের হিল্লোল নয়। পাঠকে ভাবায়, জাগায় এবং পরিশেষে জীবনের বিরাট শূন্যতার কেন্দ্রে মুক্তির বাস্তবতা চিনিয়ে দেয়।

একত্রিশ, ভোট পর্ব চুকে গেলে, চেয়েছেন যা যা/ সব দেব। মাটি থেকে নিতে হবে খুঁটে/ চাইবেন কী? আপনারাই তো রাজা/ দেয়ালে লেখা ঢেকে অতপর দেওয়া যাবে যত ইচ্ছে ঘুঁটে।/ (অর্থাৎ: 'দেশ-পত্রিকা ৩রা নভেম্বর ১৯৮৪। ৫২ বর্ষ ১ম সংখ্যা।

সুভাষের শ্লেষের-টবে কবিতার ফুল জনতার উদ্দেশ্য সযত্নে ফোটানো। ভোটের লড়াই থেমে গেলে কোন দলই তাঁদের আহুরে কথাগুলো আর মনে রাখেন না। মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী কবি ভ্রান্ত জনগণের সামনে আর এক শক্ত হতাশার বাণী উচ্চারণ করেন। তাঁর মন পাল্টাতে শুরু করলেও আদর্শকে হত্যা করেননি। ক্লান্তিহীন মস্তিষ্ক ও লেখনী চালনা জন স্বার্থে এখনো বহমান। সময়ের শাসন উপেক্ষা করার সাধ্য মুক্তি সাধক সুভাষের ছিল না।

সম্প্রতি কংগ্রেস প্রার্থীদের প্রচার সভায় কবি যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন সে সম্পর্কে দীপঙ্কর চক্রবর্তীর উক্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে:

".....সুভাষবাবু কখনও তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা কখনও বা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নানা ইতিহাস, অ্যাঙ্গোলা ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার লড়াই, ভারতের জাতীয় সংকট, মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র ও তার নৌবহরের উপস্থিতির ঘনঘটা এসবের মাধ্যমে শ্রোতাদের বোঝাতে চাইছেন দেশকে বাঁচাতে, সংহতিকে বজায় রাখতে একমাত্র কংগ্রেসী সক্ষম। নির্বাচনে কংগ্রেস যদি হারে তাহলে কংগ্রেসের যত না ক্ষতি হবে তার থেকে অনেক বেশী ক্ষতি হবে কমিউনিস্ট দের। এ সব কথার সঙ্গে বক্তা সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্বীকার করে নিচ্ছেন তাঁর যৌবনের ভুল।

যখন তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী হিসাবে বিদ্রোহী কবি হিসাবে নেহেরু গান্ধী কংগ্রেসকে নিন্দা ধিক্কার সমালোচনা করেছেন।

" ক্রমরেড আজ নবযুগ আনবে না? কুয়াসা কঠিন বাসর যে সম্মুখে/ লাল উল্কিতে পরস্পর কে চেনা/ দলে টানো হৎবুদ্ধি ত্রিশংকুকে" বা/

" চিমনির মুখে শোনো সাইরেন শঙ্খ/ গান গায়/ হাতুড়ি ও কাস্তে/ তিল তিল মরণে ও জীবন অসংখ্য/ জীবনকে চায় ভালোবাসতে—"

...... ঐ কবিতা গুলির স্তবক তাঁর দীর্ঘ জীবনের পথ-বিপথের মাইল স্টোন হয়ে আছে, থাকুক। সে প্রসঙ্গে খুব যেতে চান না আপাতত। একবার বললেন, যখন লিখেছিলাম তখন ওইসব কথায় বিশ্বাস করতাম। আজ করি না। আবার আর একবার বললেন, পার্টি তখন যা বোঝাতো। তাই বুঝতাম, তাই লিখতাম। নিজের চোখে দেখতাম না।

— —আমি এই প্রথম কংগ্রেসকে ভোট দেব। কংগ্রেসের জন্য নয়। দেশের কথা ভেবে। অনেকটা সেই চাঁদ সওদাগরের মতো অবস্থা আমার। বিপাকে পড়ে যাকে বাঁচাতে হলেও মনসার পূজা দিতে হয়েছিল।

— —কংগ্রেস আর সেই রাজার ছেলে, আমীর ওমরাও আর ক্যাপিটালিস্টদের কংগ্রেস নেই। পার্লামেন্টে এখন কংগ্রেসে অনেক মেঠো মুখ দেখা যায়। — —কবির ধারনা হয়েছে দেশের সংহতি রাখতে কংগ্রেসই এখন এক এবং অদ্বিতীয়।"১

১৯৮৫ সালে ১৫ই আগষ্টের 'বর্তমান দৈনিক কবির অবস্থাটা আরও গভীর ভাবে উপলব্ধি করা যাবেঃ

"প্রজাতন্ত্র হল। তখন বললাম, ওটাও ভাঁওতা। কমনওয়েল্থের গাঁটছড়াটা তো যেমন তেমনি আছে। ক্রমে ঠেলায় পড়ে মানতে হল যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা হয়েছে বটে। তবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তো আর হয়নি।

ক্ষমতাসীন সরকারকে আমরা বললাম, শুধুই পুঁজিপতি আর জমিদারের সরকার। এ সত্বেও আইন করে জমিদারী প্রথা তুলে দেওয়া হল। তখন বললাম, ওটা কথার কথা। আইন করলেই কি আর হয়? তাছাড়া আইন আদালত তো বড়লোকদেরই ভোগে লাগে।

১, সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কংগ্রেসকে ভোটদের দেশের স্বার্থে। পৃঃ আট। আনন্দবাজার পত্রিকা। ৯ পৌষ ১৩৯১ সোমবার ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৮৪। সম্পাদক—অভীক সরকার। কলি—৭০০০০১

— —যোজনা পরিষদ হল। এল পালাক্রমে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। আমরা বললাম, মিশ্র অর্থনীতিতে পরিকল্পনায় খুব একটা ফল হবে না। আমরা তখন চাইছি সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে নেহরু সরকারকে উৎখাত করতে। নেহরু তখন আমাদের চোখে ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল। কেউ কেউ বলছে ফ্যাসিস্ট আধা—ফ্যাসিস্ট।

— —নেহরুরপররাষ্ট্রনীতিকে তখন আমরা ভুমুখো বলে মনে করছি। সাম্রাজ্যবাদ আর সমাজতন্ত্রের দুই শিবিরকে তিনি ল্যাজে খেলাচ্ছেন। ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্ব ভালো জিনিস। কিন্তু স্বাধীন ভারতকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর জন্যে সোভিয়েতের অকাতর সাহায্য গোড়ায় আমাদের ভালো ঠেকেনি।

এতে তো বুর্জোয়াদেরই পোয়াবারো হবে। কমিউনিস্ট শিবিরের সবাই যে একভাবে ভাবত তা নয়। কিন্তু আমরা যারা নিচের তলার লোক, ছাঁকা মার্ক্সবাদ আমাদের কপালে জোটেনি। ফলে তলানিটুকুই গলাধঃকরণ করতে হয়েছে।

* * *

আজ স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যলগ্নে একথা অকপটে বলা দরকার। সমাজতন্ত্রের বিশ্বরূপের এই পর্বে জাতীয় স্বাধীনতার মর্ম বুঝতে না পেরে আমরা যে ভুল করেছি তার কারণ মার্ক্সবাদের খেই হারিয়ে আমরা কেবলি বাস্তবের জট পাকিয়েছি। একদিকে রণচণ্ডী সাম্রাজ্যবাদ আর তার চেলা চামুণ্ডার দল, অন্যদিকে সুখে শান্তিতে বাঁচতে চাওয়া এই গ্রহের সমস্ত মানুষ।

নেহরুর হাতে গড়া আজকের স্বাধীন ভারত। সমাজতন্ত্রের দিকে ফেরানো মুখ। সমস্ত ভুলের বোঝা কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে নবীন ভারতের রূপকারদের হাত শক্ত করে ধরি কিনা দেখার জন্যে দুনিয়ার মানুষ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

সময় বয়ে যাচ্ছে। আমরা যেন দেরি না করি।"[১] সুভাষের এই কথার প্রতিধ্বনি তুরস্কের কবি নাজিম হিকমতের কবিতাংশে ঃ

১, সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সময় বয়ে যায়। ১ম বর্ষ ২৪৮ তম সংখ্যা বৃহস্পতিবার ৩০ শ্রাবন ১৩৯২। ১৫ই আগষ্ট ১৯৮৫ c/o বর্ত্তমান পত্রিকা। দ্রষ্টব্য

আমি বিংশ শতাব্দীর মানুষ/ আমার গর্ব/ আমি এখানে আছি/ আমার দেশের মানুষের মাঝখানে/ নতুন পৃথিবীর মুখ চেয়ে আমি লড়ছি/ আবার কি চাই······ (বিংশশতাব্দী : নাজিম হিকমতের কবিতা) ॥ অনুবাদক : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ॥

বিশ শতকের শেষ ধাপে পা রেখে প্রবীণ কবির মত পরিবর্ত্তণের তড়িত-সিদ্ধান্ত এক নতুন চিন্তার স্বাক্ষর। স্বপ্নকে আগলে রেখে নতুন পথে অগ্রসর কবি জীবন সত্যের দর্শনার্থী। এ তাঁর চ্যুতি কিনা, সে বিচার কালের হাতে, তবে আপন আদর্শেরই এক পৃথক সোপান তাঁর স্বজ্ঞায় উদ্‌ভাবিত, এই মাত্র বলতে পারি। সুভাষ কবিতার শব্দ-গাত্রে পোশাকী অলংকার পরাননি। তাঁর কবিতার প্রতিটি শব্দ গণ-পরিচয়ে গড়া। ঠাণ্ডা মাথায় সমবেদনা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার কামনা কবিতার গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করেছে। যেমন :

দিশাহীন ঝড়ে তুমি যুগাবিপ্লবী মেঘ/ তড়িৎ কাটুক তোমাদের দ্রুত চলবার বেগ। উজ্বল ইতিহাসে নিষ্ফল পশ্চাৎ শোক।

শব্দ-দল অসংলগ্ন নয়। প্রয়োজনের টানেই সারিবদ্ধ। চিত্রকল্পের সরল আবেদনে উষ্ণ প্রেরণা মন টানে।

বড়ই ধাঁধায় পড়েছি মিতে/ ছেলে বেলা থেকে রয়েছি গ্রামে/
বারবার ধান বুনে জমিতে/ মনে ভাবি বাঁচা যাবে আরামে।

নির্ভূষণ ভাষায় তাপ ও বেগের সংযত পথে অনুযোগের শর বিঁধে আমলা শাসক শ্রেণীতে যেমন লজ্জায় রাঙাতে পেরেছেন, অপর দিকে আন্তরিকতার সারল্যে অখণ্ড জীবনকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আশ্বাস দিয়েছেন।, সুভাষের কবিতা সাবেক প্রসাধনের সাজঘর থেকে শব্দের অব্যাহতি।

'একটু পা চালিয়ে, ভাই'-* কাব্যে বিদ্বন বয়স্ক সুভাষ নিম্নোদ্ধৃত কবিতা গুচ্ছ বাক্‌-নৈপুণ্যে, সচেতন শব্দে শব্দে নিটোল ভাবের সমাবেশ ঘটিয়ে রচনাকে বহুগুণ অর্থবাহী করেতুলেছেন। ছায়াছায়ার মধ্যে কবির সঞ্চিত মমতা জীবনের কথাকে শিল্পর রসে ও রূপে

২৩৯ করায়। নিষ্ঠা করে শ্রবণ গোচর।

* সুভাষ মুখোপাধ্যায়। একটু পা চালিয়ে, ভাই। ১ম সং মে ১৯৭৯। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা : কলি—৯

১, রাস্তার ছোট ছোট গর্তে/ জমানো ছিল/ আমাদের চোখের জল (আনন্দ ঃ একটু পা চালিয়ে ভাই)

২, এখন আমি বাড়ি করছি/ গাড়ি করছি/ মদ খাচ্ছি/ মেয়ে মানুষ রাখছি/ গড়াগাড়ি দিচ্ছি/ ঘুরছি/ উড়ছি (আজ আছি কাল নেই ঃ ঐ)

৩, কবিরা চান ?/ মাপ করবেন/ ধৃষ্টতা এই-/ আপনি চান গয়না/ হয়না না, তাই/ হয় না ॥ —— (হয় না ঃ ঐ)

৪, আমার কলম নামিয়ে রেখেছি মাটিতে/ এখন তোমরা তোমাদের চোখ/ সরিয়ে নিতে পারো। —— (এখন ঃ ঐ)

৫, যে আমাকে চায় আমি তার কাছে যাব/ গলায় খেলে না সুর/ তবু আমি গাইব গান মৃদঙ্গ বাজাব — (যাব না সভায় ঃ ঐ)

৬, আমার যে বন্ধুরা পৃথিবীকে বদলাবে বলেছিল/ ত্বর সইতে না পেরে/ এখন তারা নিজেরাই নিজেদের বদ্‌লে ফেলছে। (ঝুলতে ঝুলতে ঃ ঐ)

৭, থু/ থু/ থু-/ এই একটি শব্দে গলা চিরে/ এবার আমি আগুন ওগরাব। (বাঘের আঁচড় ঃ ঐ)

৮, রোজই ঘুম ভাঙলে ভাববার চেষ্টা করি/ আমি কোথায় ॥ (কোথায় ঃ ঐ)

আঙ্গিকে ঘটা নেই, গদ্য গদ্য শব্দে ছড়ার দোলা দিয়ে কবিতা ভাষার নতুন গাঁথুনি, জ্ঞানের গহনে। অভিনবত্বের চেষ্টা নেই কিন্তু সত্য উন্মুক্ত। প্রগল্‌ভতা নেই, রমনীর গূঢ় তৃপ্তির মধ্যে অর্থ মূল্য বিদ্যমান। প্রখর জিজ্ঞাসা কবিতার পত্রে পত্রে প্রতিক্ষীত। সমকালীন কোন কবিই সুভাষের মানবপ্রেমকে হার মানাতে পারেননি। কবির অনন্য শক্তিতে কাল সংকট নতুন মল্যে চিহ্নিত।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার একটি ভিন্ন বিষয় এবার আলোচনা করব। নারীকে নিখিল সৌন্দর্য চেতনার মানসী মূর্তিরূপে অনুভব ও দর্শন করা আধুনিক রোমান্টিক গতি কবিদের একটি বিশেষ মানস লক্ষণ। বাংলা সাহিত্যে এর প্রথম অস্ফুট আভাস মিলেছিল মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৬০) কাব্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) উপন্যাসে সমুদ্রতীরে বিহ্বল নবকুমারের সামনে কপালকুণ্ডলার যে প্রথম আবির্ভাব, তাতেই প্রথম এই রোমান্টিক কবিমানসিকতার

পরিপূর্ণ প্রকাশহয়েছে। আখ্যায়িকাকাব্য 'উদাসিনী' (১৮৭৪) তে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, পরে 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯) কাব্যে বিহারী লাল চক্রবর্ত্তী তাঁদের লেখায় এই চেতনাটিকে আর বেশী পরিণতি দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনা 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮) 'বনফুল (১৮৮০) এ অক্ষয়চন্দ্রের এবং বিহারী লালের প্রভাব আছে। পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্রনাথের পরিণত কবিতা সৃষ্টির (মানসী, সোনারতরী, চিত্রা) ভিতর দিয়ে এই আধুনিক রোমান্টিক সৌন্দর্য-চেতনা পূর্ণবিকশিত হয়েছিল।

"উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কবি **keats** কাছাকাছি সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি **ode**-কবিতা লিখেছিলেন। সেই ওড্‌গুলির তিন-চারটি **keats**-এর সৌন্দর্য চেতনার প্রকাশক। — **Grecian urn** ওড্‌টিতে উড্ডীন পাখির ঊর্দ্ধাগত গীত মূর্ছনার (—**Nightingle**) অথবা বেদিহীন দেবতার বরণ অমর্যাদার বেদনা পটে (.....**Psyche**) রমনীয় রূপ বিলাসের কোনো আয়োজন নেই। বরং 'প্রস্তরমূর্তি' কবিতার মতো স্মৃতি-নিকষিত অতীতের প্রতি মুগ্ধতা থেকে সুন্দরের বোধ ঘনিয়ে এসেছে —**Grecian urn-এ**। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য মানব-সম্বন্ধ—মুক্ত। কোন বিশেষ ব্যক্তির, স্থানের অথবা কালের নয় বলেই তা চিরন্তন।" ১

কবি **John keats** এর- "**Grecian urn**'-এ সেই ব্যাকুল সৌন্দর্য চেতনার পরিচয়ঃ

And, little town, thy streets for evermore
will silent be; and not a soul to tell
Why thou art desolate, can e'er return.

— — — — — — — — — —

'Beauty is truth, truth beauty;- that is all
ye know on earth, and all ye need to know;

খোদিত পাষানী রূপিনীর মান-ভঞ্জনের প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের

১, ডঃ শিবচন্দ্র লাহিড়ী। মানসী প্রতিমা (রবীন্দ্র কবিতার প্রতিমান) ১ম প্রকাশ নববর্ষ ১৩৮৯ পৃঃ ২৩৬। গ্রন্থনিয়ল, ৫৯/১ বি পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা—৯

'প্রস্তর মূর্তি' (চিত্রাকাব্য) সনেটে। জীবন্ত প্রেমিকাকে অনন্তকাল নয়ন-বদ্ধ রাখা দায়। শিল্পের প্রেমিকা রূপে যেমন অনির্বাণ, প্রেমিক পুরুষটিরও প্রেমাকৃতি তেমনই অবিনশ্বর।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রস্তর মূর্তি' কবিতায় তারই প্রতিধ্বনি ঃ

'সংসারে কোলাহল/ তোমারে আঘাত করে নিয়ত নিষ্ফল—/ জন্ম মৃত্যু দুঃখ সুখ অস্ত—অভ্যুদয়/ তরঙ্গিত চারিদিকে চরাচর ময়/ তুমি উদাসীন। / মহাকাল পদতলে/ মুগ্ধ নেত্রে উর্ধ্বমুখে রাত্রিদিন বলে/ কথা কও, কথা কও, কথা কও প্রিয়া। / কথা কও মৌন বধূ, রয়েছি চাহিয়ে। / তুমি চির বাক্যহীনা, তব মহাবাণী/ পাষাণে আবদ্ধ ওগো সুন্দরী পাষাণী।

রবীন্দ্রনাথ এবং কীট্স রোমান্টিক কবি। তাঁরা নারীর মধ্য দিয়ে যে সৌন্দর্য দর্শন করেছেন তা ছায়া লোকের ভিতর দিয়ে গলে পড়া চাঁদের শীতল কান্তি তুল্য। এস্থলে **Truth beauty** **Bea-uty truth,**

keats—র বিশ্বাস পাষাণী সুন্দরীর মানভঞ্জনের জন্য যুগ যুগ ধরে সাধ্য সাধনা অব্যাহত রেখেও তাঁর নীরবতার অবসান ঘটানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই তপস্যার মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত আত্ম প্রসাদই পরম প্রাপ্তি এবং সন্তুষ্টি বিধানের ঐ পথই বোধ হয় নির্মম সত্য।

P.B.shelley আক্ষেপহীন চিত্তেই মেনে নিয়েছেন কল্পিত মানস সুন্দরীকে—। ভোগের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ তৃপ্তি আসে বটে কিন্তু তিনি উপলব্ধির মধ্য দিয়ে রূপাতীত সৌন্দর্য দর্শনকেই শ্রেয় মনে করেছেন ঃ

'Spirit of Beauty, that dost consecrate/ with thine our hues all thou dost shine upon/ of human thought or form when art thou gone ?' (Hym to Intellectual Beauty)

এই Intellectual অনুসন্ধান কালে তিনি স্পষ্টই বলেন ঃ 'The awful *shadow of some unseen power/ Floats, though unseen, among* us visiting/ This various world with as constant wing/ As summer winds that creep from flower to flower.'

পবিত্র সৌন্দর্য একাকী নির্জনতার মধ্যে উপভোগের আশায়

Shelley জগৎপ্লাবিনী রূপবতীর দেহী মূর্তি সৃজন করেছেন রূপক কাহিনী **'Alastor,** কাব্যে। বস্তুত: অবাস্তব হলেও এই নতুন পৃথিবীতে কবি আদর্শ প্রেমিকের মনো অতৃপ্ত বাসনাকে পর্যাপ্ত সুখ দানের জন্য সারা জীবন বাহিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞঃ

'And my heart ever gazes on the depth/ of the deep mysteries— He would linger long/ In lonesome vales, making the wild his home';

কিন্তু এই রোমান্টিক সৌন্দর্য- উপলব্ধির মানসিকতার বিপরীতে মার্ক্সীয় সৌন্দর্য চেতনার জগতে একটা ভিন্ন রূপ চোখে পড়বে। এইটিই বুঝি কবিদের নতুন সুর।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় শোষকের লালসার বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রামের আবহপটে নারীকে শক্তির নতুন সৌন্দর্য প্রতীক রূপে দেখতে চাইলেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অক্ষুন্ন রেখেই নারীকে সংকোচ উত্তীর্ণা রূপে কবিতায় যথাযোগ্য করে এঁকে দিলেন। রোমান্টিক এবং গণকবির সৌন্দর্য আস্বাদনের পথ তাই ভিন্ন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আলোচ্য কবিতা লক্ষ্য করা যাক ঃ

বত্রিশ, যখন তোমার আঁচল দমকা হাওয়ায় একা একা উড়ছিল/ তখনও নয়/ বিকেলের পরন্ত রোদে বিন্দু বিন্দু ঘাম/ তোমার মুখে যখন মুক্তোর মত জ্বলছিল/ তখনও নয়/ কী একটা কথায় আকাশ উদ্ভাসিত করে/ তুমি যখন হাসলে/ তখনও নয়/ যখন ভোঁ বাজতেই/ মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র/ একটি করে ইস্তাহারের জন্যে/ ঔত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিলো/ যখন তোমাকে আর দেখা গেল না/ তখনই/ আশ্চর্য সুন্দর দেখালো তোমাকে।— (সুন্দর ঃ ফুল ফুটুক/ ১৯৫১—৫৭)

মার্ক্সীয় সৌন্দর্য চেতনার বিশিষ্টতা সম্পর্কে নীরেন্দ্রনাথরায় বলেন ঃ 'মানুষের মনে সৌন্দর্য অনুভূতির বিকাশ হয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রভাবে, উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। আমরা যে পরিমাণে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছি সেই অনুসারে আমাদের সৌন্দর্যবোধও বিবর্তিত হইয়াছে। পর্বতমালাকে মানুষ যখন অধিকার করিতে পারে নাই তখন পর্বতের দৃশ্য ছিল মানুষের

নিকট ভয়েরও ঘৃণার কারণ। সাহিত্যের ও দৃশ্য চিত্রের ইতিহাসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ, ও সেই সঙ্গে সামাজিক জীবনের বিকাশ—ইহারই ফলে মানুষ পৃথক করিতে শিখিল কোন্‌টি সুগঠিত কোন্‌টি কদাকার; তাহা হইতে আসিল সৌন্দর্য, সুষমা ও সমন্বয়ের বোধ। এক্ষেত্রেও মার্কসের প্রতিজ্ঞা প্রযোজ্য যে মানুষ বাহ্য প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করিতে গিয়া নিজের প্রকৃতিকেও বদলাইয়াচ্ছে। —সাহিত্যের প্রধান বৃত্তি—শিক্ষা দেওয়া, আনন্দ দেওয়া। নাড়া দিতে পারা বিচলিত করিতে পারা, ইহাই মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ।'১

সমর সেনের 'উর্বশীর'-র কাছেও অ-রোমান্টিক নতুন প্রার্থনা নিবেদিত:

'তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে/ দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো।/ কিংবা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে/ হে ক্লান্ত উর্বশী;

এই কাব্যসত্য সম্পর্কে ক্রিস্টোফার কডওয়েল-র যুক্তি-তথ্য উপস্থাপন যোগ্য:

১, 'কাব্য সত্য এক সমগ্র নতুন জগৎকে প্রকাশ করে-তার আবেগ তার বন্ধুত্ব, তার পরিশ্রম, তার দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও আনন্দময় পরিণতিকে। আর এই রূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে এই কারণেই যে ফসল তোলার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটি সহজ প্রবৃত্তিগত ও অন্ধ নয়; সে সম্পর্ক হল অর্থনৈতিক ও সচেতন। অতএব কাব্যের বিমূর্ত উক্তিটা নয় তার তথ্যের বিষয়বস্তু নয়—সমাজে কাব্যের গতিশীল ভূমিকা—তার যৌথ আবেগের বিষয় বস্তুই (Content) হল কাব্যের সত্য।'

২, 'যে সমাজের মানুষের বিশিষ্ট কার্যকলাপ থেকেই কাব্যের জন্ম সেই সমাজ থেকে কাব্যকে আলাদা করা যায় না। মানুষের কার্যকলাপের ভিত্তিহীন সহজ প্রবৃত্তি।'

৩, 'কাব্য হল মানুষের এক উৎপাদনকারী বা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ।'

১, নীরেন্দ্র নাথ রায়। সাহিত্য বীক্ষা। পৃঃ ১০৬। প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ১৯৮৩। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। আর্যম্যানসন (নবম তল), ৬—এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার। কল—৭০০০১৩

৪, 'ইতিহাসের দিক থেকে অর্থাৎ গতির মধ্য দিয়ে না দেখলে আধুনিক কাব্যকে বুঝতে পারা অসম্ভব। — —যে ক্ষেত্রে কাব্য হল প্রচণ্ড ভাবে গতিশীল এক সমাজের জৈব-উৎপন্ন সে ক্ষেত্রে একথা বিশেষ ভাবে সত্য।' ১

কবি সুভাসের 'সুন্দর' কবিতায় এই বাণীই মূর্ত।

প্রগতি সংকীর্ণতা মুক্ত। সমাজ সচেতন ভাবেই পাল্টায়। শিল্পও সংশয়, আনন্দ-বিদ্রোহের রাসায়নিক ফল। উৎপাদনক্ষম সমাজ-বিচ্ছিন্ন নয় বলেই কবিতাও আত্মবিদ্রোহ ও সৌন্দর্যের পাশে যন্ত্রণাদগ্ধ বঞ্চিত মানুষের অন্যতম সাথী। তাই কলাকৈবল্যে মুগ্ধ না হয়ে গণচিত্তের আর্তনাদ সত্যিকার মার্ক্স-ইজম-এর আদর্শে জীবনবাদী শিল্পকলার সন্ধানী। দমকা হাওয়ায় উড়ন্ত আঁচলের বৈচিত্র্যে, নারীর মুখে পড়ন্ত রোদ হতে ঝরে পড়া মুক্তোর মতো বিন্দু বিন্দু ঘামে, অথবা খেয়ালি মনের কথায় আকাশ ব্যাপী হাসির ছটায় গণজীবন প্রেমিক কবি ভোলেন না। বরং জীবন রক্ষার ডাক যখন ভোঁ বাজার সঙ্গে সঙ্গে ইস্তাহারের বৃত্তি নিজেকে বিশদ করে দিল-তখনই যেন মানব বেদনায় কবি সচেতন। অপূর্ব সুন্দর মনে হল সেই নারীকে। গণ-শক্তির এই চূড়ান্তমুহূর্তে রূপচেতনা তার আপন আদর্শে সুন্দর হয়ে ফুটেছে/। প্রতিবাদের আবশ্যকতা থেকেই শোষক শোষিতের সংঘর্ষ। শ্রেণীহীন সমাজ গঠণের পথ এইভাবেই নির্মিত। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যাঁদের মানসিকতায়, তাঁরা জীবনের প্রতিধ্বনি শুনতে চান। মানুষে মানুষে নিগূঢ় বন্ধনকেই শিল্প সৌন্দর্যে প্রতীকী করে তোলেন। এই ভাবমধ্যেই গণকবির সুদৃঢ় আবাসন।

এই শিল্প প্রত্যয়ের সমান্তরাল অন্য কবিতাতেও সুভাষের একই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঃ

অথবা তেত্রিশ ক/১, পাগল বাবরালির চোখের মত আকাশ।
তার নিচে পাঁচ ইস্টিশান পেরনো মিছিলে/ বার বার পিছিয়ে পড়ে/
বাবরালির মেয়ে সালেমন/ খুঁজছে তার মাকে

১, ক্রিস্টোফার কডওয়েল। ইলিউশ্যন অ্যাণ্ড রিঅ্যালিটি (বাস্তব ও বিভ্রম) পৃঃ ৩৩—৬৬। পূঃ দ্রষ্টব্য।

২, এক আকাশের মেয়ে তোমার/ আরেক আকালের মুখে দাঁড়িয়ে/ তোমাকেই খুঁজছে ।।

(সালেমনের মা ঃ ফলফুটুক/ ১৯৫১—৫৭)

জঠরের জ্বালায় সালেমনের মা নিরুদ্দেশ। উন্মত্ত পিতা বাবরালি। প্রতিবাদের মিছিলে সামিল সালেমন। মাকে খুঁজছে। ধনতন্ত্রের চাপে শ্রমক্লান্ত দিশাহারা সাধারণ মানুষ। তরো বাঁচার তাগিদে অগ্রসর। কেঁদে কেঁদে হন্যে হয়ে সালেমন অগ্রসরমান। চোখে পিচুটি। আকাশের মতো মহাশূন্য পিতার দৃষ্টির মধ্যে খুঁজে ফিরে তার মাকে। অনাহার ক্লিষ্ট সালেমনের সামনে অনিশ্চিত মায়ের ঠিকানা। ব্যথায় ব্যথায় সে নিঃসাড়। কবিতার দৃশ্যে বাস্তব প্রতীকে ঘনীভূত।

অথবা চৌত্রিশ ব/১, ছাদের পারে হেথাও চাঁদ ওঠে—
দ্বারের ফাঁকে দেখতে পাই যেন/ আসছে লাঠি উঁচিয়ে পেশোয়ারী/
ব্যাকুল খিল সজোরে দিই মেলে।

২, বুঝেছি কাঁদা হেথায় বৃথা; তাই/ কাছেই পথে জলের কলে, সখা/ কলসি কাঁখে চলছি মৃদু চালে/ গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এলো।

(বধূ ঃ পদাতিক/ ১৯৩৮-৪০) প্রতিবাদ

স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতে ক্রম বর্ধমান প্রতিবাদ-প্রসূত পীড়ন। নাতি দীর্ঘ কবিতায় সেই দুর্বল মানুষের শক্তি ক্ষয়ের চিত্র কবির আশ্চর্য উপলব্ধির উপহার। প্রাচুর্যলিপ্সু মানুষের দরবারে বঞ্চিতের চোখের জলের ছাপ পড়ে না। মুক্তি কর্মী কবি সমাজ ব্যবস্থার জালে বদ্ধ সাধারণের শোচনীয় পরিণাম স্মরণ করে শঙ্কিত। কঠোর বাস্তবতা তাঁর মনোজগতে প্রত্যক্ষ প্রতীকে অঙ্কিত। কবিতায় সুভাষের অভিযোগ, বিদ্রোহ জীবন মুখর বলেই সংগ্রামী চেতনার এক বলিষ্ঠ অভিজ্ঞান। সৃষ্টি, নতুন পথে এসে স্বার্থের কথায় অনিবার্য রূপ নেয়। এই রূপান্তর সক্রিয় চেষ্টারইফলল।

উদ্ধৃত কবিতাংশের সারিতে যেন ক্লান্ত রমণীর ভিড়। রমণীয় বেদনা তাদের কথন ভঙ্গিতে চেনা সমাজের দ্বার উন্মুক্ত করে রাজ নীতিকে দর্শন করায়। 'সুন্দর' 'সালেমনের মা' কিংবা 'বধূ'

আমাদেরই পরিচিত প্রতিবেশিনী। নারীর মনোলোভা রূপ চিরকাল আদরের। অথচ অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ তা সংকুচিত করেছে। তাদের স্বপ্ন রূপমুগ্ধতার বিস্ময়পটে শিল্পিত না হয়ে সমাগত বিপ্লবের মধ্যে প্রাণধর্মকে অন্বেষণ করে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রধান কাব্যগুলির বিশিষ্ট শাব্দিক পরিমণ্ডল কথ্য বাংলা ঃ বিদেশীশব্দ ঃ রং ঃ এবং বিচিত্র বিশেষণ কিংবা চলিত ক্রিয়াপদাশ্রয়ে গঠিত। কিছু উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ঃ

ক, কথ্য বাংলা শব্দ ঃ

১, প্রভু, যদি বল অমুক রাজার সাথে লড়াই
২, এমনি বেকার ; মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই।
(প্রস্তাব ঃ ১৯৪০ ঃ পদাতিক)

১, কলসি কাঁখে চলছি মৃদু চালে/গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এলো।
(বধূ ঃ ঐ)

১, ভুখা সমাজকে ভাঁওতা দিয়েছি সদলে। (আদর্শ ঃ ঐ)

১, ফাঁকা ভাড়ারের ওস্তাদ সংসারী/ আর কতদিন ঢাকবে ধোঁকার টাটি ?

২, পিরামিডে থাক পিরীতি কফিন ঢাকা,/ (পদাতিক ঃ ঐ)

১, জাগুন জাগুন পাড়ায় আগুন/ বাড়ে হু হু/ মগজে প্রভূত দম্ভ তবু তো/ আহা উহু। (কাব্য- জিজ্ঞাসা ঃ চিরকুট)

১, কাজ মেলেনিকো, গ্রামে বসে কষে তুলছি হাই,/ দ্বারে বসন্ত ; অন্দরে দাবদাহের ছাই।

২, স্মৃতি বসে কাটে জাবর, এবেলা আমি এদেশে,/ পালাবার পথ বন্ধ ; প্লাবনে যাচ্ছি ভেসে।। (রোমন্থন ঃ ঐ)

১, বনে জঙ্গলে জলায় পাহাড়ে মাঠে জনপদে/ হাটে বন্দরে/ শুকনো ডাঙায়/ ডুকরে ডুকরে কাঁদো।
(মা, তুমি কাঁদো ঃ ফুলফুটুক)

২, পেটে তার উপোষী ছেলেটা বিচ্ছু বলে না/ —শুধু দিন গোণে।
(একটি লড়াকুসংসার ঃ ঐ)

১, দিন এসে গেছে/ লাঙলের ফালে আগাছা উপড়ে ফেলবার।

২, অত্যাচারীর পাড়ায় পাড়ায়/ ত্রাহি ত্রাহি হাঁক ওঠে'/ দলে দলে ত্রাণকর্তা বিমান/ বাতাসে বারুদ ঠেসেঠুসে দিয়ে/ কামানের মুখে মৃত্যুর ঝড় তোলে। (অগ্নিকোণ : অগ্নিকোণ)

১, দেশে দেশে বেইমানদের/ বুক দুর দুর করে/ দুয়োরে খিল, ঝাঁপ বন্ধ/ বাজারে বন্দরে। (ঝড় আসছে : ঐ)

১, এপারে গিলে ওপারে ওগরাবে।

২, মাঝনদীতে জল ঘোলাচ্ছে/ মাটি-কাটার জাহান।

(পারঘাটের ছবি : কালমধুমাস)

১ বর্ষা গেলে/ কাঠকুটো, ভিজে সবকিছু/ রোদে দেব/ রোদে দেব/ এমন কি হৃদয়ও॥ (রোদে দেব : ঐ)

উপরের কবিতায় উপেক্ষিত মানুষের বিচিত্র যন্ত্রণার আলোকপাত। কবির সামগ্রিক মনোলক্ষণ নির্বাচিত সহজ সরল শব্দেবদ্ধ। ফলে প্রচলিত কথ্য শব্দাবলী চিত্রকল্প রচনায় বেশি দ্যুতিময়। পাঠকমন সরাসরি এখানে আকৃষ্ট এবং কবিতা সম্পর্কিত ধারণা লাভে সমর্থ।

কথ্যশব্দ ভিন্ন, বিদেশীশব্দ, সাইরেন, কমরেড, সেপাই, সান্ত্রী, রেস্তোরাঁ; ডাষ্টবিন, বেয়নেট, সেন্সামী, স্ট্রাইক, ময়দান, মোকাবিলা, কসম, শয়তান, রেশন, ইস্তাহার, বেইমান, বজ্জাত, ক্রেমলিনে ; কিংবা, উপচরিত বিশেষণ : বালখিল্য স্বপ্নরা, হরিৎধান্য; ব্যাকুলখিল; ভ্রমণ-বিলাসী ভাবনা ; ঝাউ ঝুমঝুমির ছায়ায়, হাঁচিগ্রস্ত অহিংস শকট, নাস্তিক চড়াই, নিরামিষ নাচ, গৌরীসেনী টাকা, সরস ঘুষ জিভে অথবা চলতি ক্রিয়াপদ : ভেঁজেছি, বাৎলেছি, তুষবে, আহড়ায়, কিংবা উপমা অলংকার : ছিদ্রিত খনি, লাল প্রতুষ, তীরধনুকের ছেলে বেলায়, হিংসুক হাওয়া, ক্রীতদাস ছায়া, স্বপ্নের বিছানা, পাথুরে পেশী, জোয়ানমদ্দ অন্ধকার, প্রগল্‌ভ জুঁই, তন্বী চাঁদ, প্রভৃতি অসংখ্য বিবিধ সুচিন্তিত শব্দের আবহমণ্ডল তৈরী করা সুভাষের কবি বৈশিষ্ট্য। ব্যাকরণের শৃংখলিত পথে গণের ভাবনার পাশে রোমান্টিক ঋতুরাজ বসন্তকে না ভুলে বিজ্ঞানোচিত প্রজ্ঞার পরিচয়ের সঙ্গে তিনি রূপলোক চিনিয়ে দিয়েছেন। কবিতার শব্দবাহিনী নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে নির্বাচক কবির দূরদর্শিতার তর্কাতীত সাফল্য এনে দিয়েছে। সুভাষের কবিতা একাধারে ঋজু কঠিন, আবার সত্য-সুন্দর। বাস্তবকে

ঠাট্টার লঘুচালে, কখনো শক্ত-দীর্ঘশ্বাসে, আবার প্রত্যাশিত প্রত্যয়ের চড়াসুরে ব্যাকুল সাধারণ জনমনকে আশায় সঞ্জীবিত করেছেন। কবি-কর্মীর ত্যাগ, তিতিক্ষার গঙ্গাজলে চিত্রবহুল কবিতা শুধু বারোমাস্যার বেদনা বর্ষনই করেনি, সেখানে চিন্তা-বিকাশের সার্বিক প্রয়াস নতুন-রূপে উদ্ভাসিত। গদ্যের সঙ্গে পদ্যের প্রতিচ্ছবি আশ্চর্য শোভন মনে হয়। অবস্থা বিশেষে সৎকবির বাক্ প্রয়োগ জটিলতার কপাট খুলে দিয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিশশতকের জীবন্ত গতিবেগ। তাঁর তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতা সতর্ক করে দেয় ইতিহাসের নজীর দিয়ে ঃ

পঁয়ত্রিশ, সামনে গড়াগড়ি যাচ্ছে
ভাই বন্ধুদের মাথা ;
পেছনে
আততায়ী আমার ভাই ।
(পাখির চোখ ঃ এই ভাই ১৯৭৩)

অথবা

ছত্রিশ, কে কার আস্তিনের তলায় কার জন্যে
কোন হিংস্রতা লুকিয়ে রেখেছে
আমরা জানি না ।
কাঁধে হাত রাখতেও এখন আমাদের ভয়
অন্ধকারের চেরা জিভগুলো যখন হিস্ হিস্ করে
তখন মনে হয়
অদৃশ্য করাত দিয়ে কেউ আমাদের খুব
মিহি করে কাটছে ।
(অদ্ভুত সময় ঃ ছেলে গেছে বনে (১৯৭২)

কবির চোখে দু সময়, স্বপ্ন জাল ছিঁড়ে চিত্রকল্পে ব্যঞ্জনাময়। অভিজ্ঞতা, প্রেমের ফ্রেমে বাঁধা ছবি হয়ে থাকেনি। অন্ধকারের দুর্ভেদ্য সীমায় খলদের পটুত্বের কথা সরল পথে কবিতায় প্রবেশ করে অধ্যবসায়ী কবির ভূমিকা পালনে সহায়ক হয়েছে। তার কবিতা গদ্যের ঋজুতা নিয়েও কবিতার ভারসাম্য হারায়নি, সমাজচেতনাকে বরং বোধগ্রাহ্য করেছে।

১০. মুখ্য কবি-সংঘ ঃ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক বাঙলা কাব্যে নিপীড়িত গণজীবনের জন্য বেদনাবোধ, সাম্যের বিশুদ্ধ স্পর্শে নবজিজ্ঞাসার জাগরণ বিশ শতকের অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। সুভাষ-সুকান্ত-বীরেন্দ্রর কাছে সাহিত্য উপভোগের রসদ নয়। এঁদের বিপ্লবী চিন্তা অনুসারে সাহিত্য গণজাগরণ এবং গণস্বার্থ কায়েম করার একমাত্র মাধ্যম। সাম্যবাদীরা সাহিত্যকেও শোষণ বন্ধন মুক্ত রাখতে চায়। পাঠকমনও সেভাবেই তৈরী হয়ে উঠবে। প্রগতি রুদ্ধ হবার নয়। বিপ্লবোত্তর সমাজে কিষাণ মজদুর তাদের নিজস্ব গোত্রের আক্ষরিক নামাবলীতে আর শুধু উধৃতি হয়ে থাকবে না। বহুতলের জীবন ভেঙে চুরে এক আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে। মস্তিষ্কজীবীর আন্তরিক কামনা এবং প্রয়াস এই উদ্দেশ্যকে রূপবান করার কাজে আর্তনাদের ভিতে সহায়ক হবে। আশঙ্কিত ধ্বংস থেকে মনুষ্যত্বের উজ্জীবন তবেই সম্ভব। রুদ্ধশ্বাস সেই সমাজের মুখোস খুলে দিতে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তৎপর। বিপ্লবী কবির কণ্ঠে তারই ভাষা :

এক/ক* কবিতা দিয়ে সমর্থন জানাবো তোমাকে

হে প্রেমিক, হে উদ্বাস্তু, তোমাদের দুঃখে আমি গলে হব নদী।

খ* তোমরা নির্বোধ হাতে স্মৃতি মুখ খুঁজে খুঁজে পড়ে যাবে যখন অসুখে
তোমাদের দুঃখে আমি মরে যেতে রাজি আছি, কারো দুঃখে মরা যায় যদি।

গ* হে যুবক, হে যুবতী, পৃথিবীতে তোমাদের কতটুকু দাম ?
কান্নাকে শরীরে নিয়ে কার ঘরে কয় ফোঁটা দিয়ে গেলে আলো ?

(মুখোস : আধুনিক বাংলা কবিতা। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত)

কিংবা

দুই* এই যে দেশ, এই যে দেশের মানুষ
অবাক্ দেশ
অবাক্ মানুষ, অবাক্ আমার বুকের ভিতর ব্যথায় নীল
ভালবাসার গান—
রক্তের সমুদ্রে মিলায় ধ্বনি, আমার জয়ধ্বনি …………

(ধ্বনি আমার জয়ধ্বনি (২৪শে জানুয়ারী ১৯৭৫) : পৃথিবী ঘুরছে)

কবির উচ্চকণ্ঠের ঘোষণা সহজেই মন কেড়ে নেয়। এতো বড় কথা বলার শক্তি গণজীবনের কবিদের পক্ষেই সম্ভব। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দারিদ্র্যের রূপ দেখে বিচলিত হননি। কারণ তিনি জানেন সমাজের এই অব্যবস্থা

সহজে দূর হবার নয়। সমতার জন্য যত হল্লাই হ'ক বাস্তবে তা সত্য হয়ে উঠতে সময় লাগে। তাই কবি প্রতীক্ষায় না থেকে নিজের অঙ্গীকারের কথা উচ্চারণ করেন :

তিন/ক* আমার বিশ্ব বদলে গেছে অনেক দিন, অনেক দিন
অনেক দিন !

খ* সকাল বিকেল একটি করে আস্ত রুটি চাই।
যত রকম কবিতা চাস, লিখে দেব
যত রকম কবিতা চাস, যত রকম কবিতা চাস।
(রুটির জন্য : মুখে যদি রক্ত ওঠে)

কিংবা

চার* প্রতিটি রুটির টুকরো, প্রতিটি ধানের শিষ জ্বলে যেন
ফিনকি দেওয়া খুনের নিশান।
(গোর্কির জন্য। মানুষের মুখ)

একদল মানুষ চিরকাল সবার ভাল চায়। সে দলে যাদের নাম লেখা, তারা সামর্থ্যহীন। চাবি-কাঠি যাদের হাতে তাদের বজ্রমুষ্টি খোলা দুঃসাধ্য। তাই সাহিত্য-শ্লোগানের-অস্ত্র ঝনঝনানি যতই কর্ণ পটহ বিদীর্ণ করুক তাতে সামান্যই ফল। তবু এই যে আন্তরিকতার পরীক্ষা, এ পরীক্ষাই বা দেয় ক' জন ? সমপ্রাণতাবোধে উদ্বুদ্ধ কবির লিখিত যন্ত্রণা তাই সমর্থন পাবার যোগ্য। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সেই কারণেই খেদোক্তি :

পাঁচ* এভাবে আগুন কেন জ্বলে/মানুষকে ছোট করে কোন লাভ ?/
তার ঘর-বাড়ি, তার নিকানো উঠোন/জতু গৃহ করে লাভ ?
ধর্ম তোমাদের কানে কী কথা বলছে / (ভারতবর্ষ একটি জতুগৃহ :
রবিবাসর/উত্তরবঙ্গ সংবাদ) ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ :

কিংবা

ছয়* কার পাপ আমাদের রক্তের ভিতরে ; /কার অন্ধকার ?
কণ্ঠস্বর/ভেসে আসে 'জোর যার' ..... /মানুষ কি এখনো তোমার/চোখ
রাঙানো প্রেমের চাকর ? (অন্ধ পৃথিবী (১৯৬৮) : মানুষের মুখ)

নিগ্রো কবি 'উইলিয়ম এডওয়ার্ড বার্গার্টডু বয়েস্' (জন্ম : ১৮৬৮)-র তুলনীয় কবিতাংশ :

ক* আমি কুয়াশার রাজা/আমি কালো/আমি সংগীতের কালো রঙে রঞ্জিত/

অন্যায়ের দিকে আমার শ্রবণ অতন্দ্র আমি কালো,/যতদূর কালো হওয়া সম্ভব পাদপ্রদীপের স্তম্ভে/যত অন্ধকার সেখানেই/রক্ষিত মধ্যরাত্রি দিন বা ভোরের দ্বারা নিহত নয়/গভীর কালো রাত্রিকে আমি ঈশ্বরের মতন করে সৃজন করি/নরককে সাদা রঙে নতুন ভাবে আঁকি/আমি কুয়াশার রাজা/আমি কালো/শুভ্র সকালকে আমি ক্রমাগত অভিশাপ দিই

অবশ্য

ছ* পুরুষের চামড়ার রঙে কী আসে যায়/অতএব তোমাদের হাতে ...ত রাখো (কুয়াশার গান : ১০০ বছরের শ্রেষ্ঠ নিগ্রো কবিতা)

১৮৬৮—১৯৬৮।

...র বিশ্বাস আগামী কালে কৃত্রিম নৈরাজ্য অপসারিত হবে এবং সবার ...ন্না থামবে। মানুষের মতো করে নির্মাণ করে কবিবীরেন্দ্র কবিতাকে তাৎপর্য দান করেছেন।

সাত* বিদ্যুত চমকায় জাগো, জাগো বোন, বুকের যন্ত্রণা/জানে না বোঝে না কিছু ক্লান্তির বিছানা/ওখানে শুয়ো না। /তার চেয়ে এসো আঙিনায়, ত্যাখো ঝড়ের কি বেশ। /তোলপাড় সমুদ্র, আহা ঢেউয়ে ঢেউয়ে তোলপাড় তোমার স্বদেশ।

(সামুদ্রিক : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা/১ম খণ্ড)

কিংবা

আট/ক* ......পৃথিবীর সমস্ত দেবতা/নতজানু, শান্তি প্রার্থনা করছে।

খ* তার চেয়ে এ পৃথিবী ধ্বংস হোক/আমরা ঘুমুতে যাব।

(আগামীকাল : মুখে যদি রক্ত ওঠে)

কবির কাছে এই ঘুম একদিন প্রার্থিত ছিল না। কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে ছিল আপোষহীন সংগ্রাম স্পৃহা। আন্তরিক ব্যগ্রতা নিয়ে বীরেন্দ্র সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছন :

নয়* একদিন ঘুমকে আমরা/দরজা দেখিয়ে বলেছিলাম ঠিকই/'এবার হটো! দেখছো না, আমরা সূর্য আনছি!

(কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো-ভারতবর্ষ (মে ১৯৬৮) : এই জন্ম, জন্মভূমি)

কিংবা

দশ* মানুষ, তুমি মানুষ,/তবে কিসের ভয়ে/সইছো পশুর চোখ রাঙানি?

(মানুষ, তুমি (২৯ ডিসেম্বর ১৯৭২) : এই জন্ম, জন্মভূমি)

রাজনৈতিক-দর্শন অনুরাগী বীরেন্দ্র। সমাজকে হৃদয় গোচর করার

অনি:শেষ ইচ্ছায় তিনি মন ও মনের গর্ভে জীবনের ঢেউ তুলেছেন। ফলে বাচনিকতাকে শেষে প্রাণিত করার অমোঘ প্রয়াস :

এগারো* সন্দেহ নেই, ঝড় বইছে/কিন্তু বাতাসকে বিশ্বাস কী ? /তবু 'মানুষ' এই শব্দেই, এক আশ্চর্য/শক্তি নিহিত,/এখন বাতাসের পিছনে স্পষ্টই উচ্চারিত হচ্ছে/তার নাম।

(এই হাওয়া (১৯৬৮) : মানুষের মুখ)

মনে পড়বে, শান্তি হননকারী সমাজ-শত্রুর বিরুদ্ধে কথা শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিমনও বিদ্রোহ করেছিল একদিন :

ক* আশা নিয়ে ভাষা আর ঘৃণা নিয়ে কবি।
তাই আরো ঘৃণা চাই,
আমার আশাকে ভাষা দিতে।

(নতুন ঘৃণার কবিতা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা)

কিংবা

খ* আমরা হাতে হাতে শুধু ছিড়ে আনব না মেঘ /শুধু দেখব না গ্রহন-ক্ষুণ্ণ ম্লান সূর্যের মুখ,/হাতুড়িতে গুঁড়ো করে,কাস্তেয় কেটে/সাফ করব দুর্যোগের কারখানার হাড়-মাস মগজ-হৃদয়,/হাসব দীপ্ত সূর্যালোকে, সবুজে !/এসো সাথী, একার আলাপ ছেড়ে এসো।

(প্রথম কবিতার কাহিনী : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা)

বীরেন্দ্রের অন্তর্দৃষ্টি কালকে স্পর্শ করে, নির্মিত জগত জুড়ে ঋষি সম্ভব চিত্রগুলো ভাস্কর্যে প্রাণ পায়। এ সবই আত্মসচেতনতার সফল রূপ। কবিতা সমাজ বহির্ভূত কোন বিষয় নয়, তাই গণমানুষের মুক্তি মন্ত্র সহমর্মী বীরেন্দ্রের কাব্যে। জীবন বিষয়ে তাঁর অনুপুঙ্ক্ষ অভিজ্ঞতা জন-গণ, মনের দোরগোড়ায় বলিষ্ঠ উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত :

বারো/ক* এক অদ্ভুত মাটির ওপর/আমরা দাঁড়িয়ে আছি ;/অর্থাৎ দাঁড়িয়ে থাকার জন্য/প্রাণপণ চেষ্টা করছি।

খ* যদিও পায়ের নিচে মাটি এখন অগ্নিগর্ভ যদিও আমাদের মাথার ওপর আকাশ বলতে কিছু নেই। (উলঙ্গের উদ্দেশ্যে (১৯৬৮) : মানুষের মুখ)

সাধারণ মানুষগুলো কি 'জতুগৃহে' এভাবেই পুড়ে মরতে জন্মেছে ? রোম্যান্টিক স্বপ্ন মিনারের উপর আজ রিয়ালিজম্ দাঁড়িয়ে তার তীক্ষ্ণ

যুগ চেতনার বজ্রমুষ্টি তুলে ধরতে চাইছে। ঘাতকের চক্রান্ত বিনাশে এ শুধু মসীলিপিদের সাময়িক হুংকার নয়, মনুষ্যত্বের অপমৃত্যুরোধের তাগিদে সংগ্রামীর হুঁশিয়ারী :

তেরো* আর আমরা সারা রাত জেগে থাকি
আশ্চর্য ভাতের গন্ধে
প্রার্থনায়, সারারাত।
(আশ্চর্য ভাতের গন্ধ : মুখে যদি রক্ত ওঠে)

মানুষ ও সমাজের মধ্যে বৈষম্য নিয়ে যে নিরন্তর সংগ্রাম- তারই সংকট ক্ষুব্ধ পুষ্ট দ্বন্দ্বের একটা বিশেষ রূপ বীরেন্দ্রের নির্দিষ্ট চেতনার ছাঁচে মূর্ত্ত। তাঁর শিল্পকর্মে তাই কাব্যনির্মাণ কলার এক ভাস্কর্যকল্প কঠিনতা। বলা বাহুল্য, কল্পনার সচরাচর করণ কৌশল থেকে তাঁর দৃষ্টি পৃথক।

জীবন রক্ষার প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের কাছে মাত্র ফ্যানের পেটজ্বলা প্রত্যাশা কত জরুরী, সেই গুরুতর ভাবনার সংযোজন গণ প্রাণের অস্তিত্বকে দুর্মর করে তুলেছে কবি বীরেন্দ্রের কবিতা :

চোদ্দ* রোদ না উঠতে, ফ্যান দাও! /রোদ চলে গেলে, ফ্যান দাও!
ঘুমের মধ্যে ভয়/পা দুটি সরিয়ে রাখি।

(কয়েকজন ভিক্ষুক (১৯৬৭): মানুষের মুখ)

দেখেছি, সুভাষ-সুকান্ত-বীরেন্দ্র 'লাল টুকটুকে দিন, লাল নিশান, মুখে রক্ত, লাল গোলাপ ইত্যাদি 'লাল' রঙের প্রত্যাশায় সতত ব্যাকুল। কারণ, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসার মতো ইতিবাচক কল্যাণবাহী শব্দ জীবনের, ঐ 'লাল' রঙের অনুষঙ্গী আবার হিংসা, ঘৃণা, লোভ, পীড়ন, প্রতাপ, আগ্রাসন—অন্যদিক থেকে এগুলিও নেতিবাচক 'লাল' রঙেরই জীবনভাষা। মানসিক দ্বন্দ্বজাত এই 'লাল' সঙ্কেতের ভিতর দিয়েই মনস্তত্ত্বানুসারী বিশ্লেষণ। ইতিহাস চেতনা এবং রাজনৈতিক মানসিকতা একে ঘিরে ক্রিয়াশীল।

এই দুই বিরুদ্ধ শক্তি 'লাল' রঙের অর্থবৃদ্ধি করে। আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, প্রেম-হিংসা, ধনী-দরিদ্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিত্যকাল একই জীবন-বৃন্তে বদ্ধ। বিরোধী সত্তা রক্তাক্ত পথে শোষণকারীর ঔদ্ধত্য দমন ক'রে স্বতোৎসারিত প্রাণ প্রবাহকে শোধন করতে চায়। মনুষ্যত্বের অবমাননায় প্রতিশোধের দুর্বার আহ্বান এই 'লাল' এর ভিতর।

বন্দী দশার অবসান ঘটাতে নির্যাতনের বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদ বিদ্রোহে রাঙানো। কখনো ক্ষোভের পরিণতি আতঙ্ক ছড়ায় এই একই রঙে। পাশবিক প্রভু শক্তিকে রুখতে প্রস্তুত গণ মানুষের প্রাণের ডাক 'লাল'-এর কম্যুনিষ্ট তাৎপর্যে সংগ্রাম ও বিদ্রোহের রক্ত-নিশান উড়িয়ে দেয়। মুহুর্মুহু শোণ-ভয়াল সেই সুর এঁদের কবিতায়, কবিতায় :

পনেরো* বিপ্লব হোক দীর্ঘজীবী/কিন্তু এখন, শান্তি, শান্তি!
/স্রোতের মতো ধুঁকছে মিছিল/উড়ছে পায়রার নধর কান্তি।

(লাল টুকটুক নিশান ছিল (১৯৬৭) : ঐ)

কখনো কবিমন সমাজের বৈষম্য চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত। আত্ম সচেতনতা নিয়ে কাপুরুষের মতো দিনাতিপাত করা মর্মান্তিক লজ্জার। উপবাসী জীবনগুলো আর কতকাল অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক দুঃশাসনের শিকার হবে :

ষোলো* কোথা আছে নব জন্ম? কতদূর? কতকাল? আর কতকাল
সইতে হবে এমন আকাল?
বইতে হবে দারিদ্র্যের মার, দাস জীবনের গ্লানি রাত্রি দিন!
রাত্রি দিন
শান্তি হীন, নিদ্রাহীন, অন্নহীন
আর কতকাল এই মানুষ নপুংসক জীবনের নিরর্থক ভার
সইতে হবে। .....শুকনো গাঙ্গে আর কবে নামবে আষাঢ়?
(তোমার : মুখে যদি রক্ত ওঠে)

কিংবা

সতেরো* 'পৃথিবী রুটির মতো তোমার ঘুমের মধ্যে চলে আসে।
তোমার তোলপাড় রক্তে পৃথিবী রুটির মতো, পৃথিবীও রুটি
কী ভীষণ ঘুম তুমি ঘুমাও। তোমার কোঁকড়ানো মুখ
স্বপ্নের বৃষ্টিতে ভিজছে—রুটি! রুটি! পৃথিবী! পৃথিবী!
অনাহারে মৃত্যু নয়। অনাহারে মৃত্যু নয়। কাল সারারাত তুমি
পৃথিবীকে ইচ্ছে মতো কামড়ে, ছিঁড়ে খেয়েছ। সমস্ত রাত
তার শান্তি! .....শান্তি! ..... শান্তি! .....
(না খেয়ে লোক মরে না (ওরা অক্টোবর ১৯৭৪) : পৃথিবী ঘুরছে)

আঠারো* আফ্রিকা
যখের ধনের মতো আগলায়
রক্তাক্ত মুখোশ।

হতাশা হয়তো সামাজিক কারণেই মাঝে মধ্যে দেখা দেয়। কবি তাই পুনর্বার শক্ত হয়ে দাঁড়াতে চান :

উনিশ* এখন চারিদিকে শত্রু, মন্ত্রীদের চোখে ঘুম নেই :
এ-সময়ে রক্ত বমি করা পাপ ; যন্ত্রণায় ধনুকের মতো
বেঁকে যাওয়া পাপ ; নিজের বুকের রক্তে স্থির হয়ে শুয়ে
থাকা পাপ
(মুখে যদি রক্ত ওঠে : মুখে যদি রক্ত ওঠে)

নিম্নরেখ শব্দ/শব্দ গুচ্ছ রক্ত এবং রক্তের লাল রঙের কথা বলতে চায়। সংগ্রামী সত্তার সংকেত বাহী এই রঙ। এর তীব্রতার ভিতর স্বতন্ত্র প্রতাপ এবং সতর্কীকরণের সুদৃঢ় ইঙ্গিত :

কুড়ি* সবার ওপর মানুষ সত্য মিথ্যা কথা/সবার ওপর সত্য যা ঈশ্বরের
হুকুম/এবং হাজার পশুর আর্তনাদ।

(অমল ছবি—কার্লমার্ক্সকে সামনে রেখে (১৯৬৮) : মানুষের মুখ)

একুশ* আলো যতটুকু আসে/তার চেয়ে বেশী আবর্জনা ;/একজন মানুষের মুখ/আঁকতে না জানলে যা হয়।

(মানুষের মুখ (১৯৬৮) : ঐ)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা 'মানুষের মুখ' এর নিখাদ ইতিহাস। তিনি মরমী কবি। তাঁর অভিজ্ঞতা, যন্ত্রণা কত সত্য, কত গভীর এবং বাস্তব। তিনি চারপাশের মানুষকে দেখেছেন হৃদয় দিয়ে, স্বদেশ প্রীতি-ও সেই মমতার স্পর্শে ভূমিষ্ঠ। কবি কণ্ঠে তাই শোনা যায় :

বাইশ* আমরা তো স্বপ্ন দেখি
স্বদেশের প্রতি ঘরে একটি জন্মদিন
(জেলখানার কবিতা (চার : জনৈকের জন্মদিন) : ঐ)
আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ৩০/৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৭ ।

কিংবা

তেইশ* একটি প্রতিজ্ঞা ……/স্বদেশ ! আমার স্বদেশ !

(স্বদেশ ! আমার স্বদেশ (আগষ্ট ১৯৭৫) : পৃথিবী ঘুরছে)

কবির দৃষ্টি খুলে দেয় রাশিয়া। তিনি জানতে পারেন, বুঝতে পারেন রক্তের বিনিময়ে কদর্য নরকেও ফুল ফুটতে পারে। তারই দৃষ্টান্ত :

চব্বিশ• রাশিয়া আমার রাশিয়া আমার রাশিয়া/যেন নরকের শোভা ! (রাশিয়া (ম্যাক্সিম গোর্কির 'The lower depths' : এই জন্ম, জন্মভূমি এবং mother মনে রেখে ২১ মার্চ ১৯৬৮ ।)

গোর্কির রচনাবলী চিন্তাচর্চার শিল্পকীর্তি। নিজে সমাজের নিচকুঠরির মানুষ। কয়েদ জীবন-আর দারিদ্র্য তাঁকে জীবন্ত অভিজ্ঞতা দান করেছে। লেখক হবার আগে ১৮৯১—৯২ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে তাঁকে অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁর সংগ্রামময় জীবন থেকে লেখক সত্তা প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে বেরোয়। তাঁর 'তলদেশ' (The lower depths) নাটক এবং 'মা' (Mother) উপন্যাস গোর্কিকে প্রতিভার স্বীকৃতির সঙ্গে বিপুল সাফল্য এনে দেয়।

'তলদেশ' নাটকে মানবতার মূল্যে আস্থারেখে তিনি দুনিয়ার মানুষকে জানাতে চেয়েছেন :

"মানুষ— এই হল সত্য !", 'মানুষ—কী দৃপ্ত কথাটার ঝংকার ! সবই মানুষের মধ্যে, মানুষের জন্যে' — 'তলদেশ' নাটকের উদ্দীপ্ত একথা গুলো আজো লক্ষ লক্ষ লোক পুনরাবৃত্তি করে চলেছে পৃথিবীর সমস্ত ভাষায়" ১

এই নাটকের ভিতর মানুষের বন্ধন মুক্তির সুউচ্চ অঙ্গীকার ধ্বনিত। গোর্কির কাছে 'পুনরুজ্জীবনের' একমাত্র পথ সংগ্রাম। এর মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধি এবং মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলেই তাঁর বিশ্বাস। জনগণের মধ্যে আমিত্ব বিসর্জন দিয়ে বিশ্বমানবতা বোধে নতুনরূপে বৈপ্লবিক চেতনায় জেগে ওঠার সামগ্রিক ব্যাপ্তি রয়েছে। মেহনতী জনগণের দাসত্বমুক্তি পরাক্রান্ত শক্তির গুণেই সম্ভব হয়ে উঠবে।

গোর্কিরা 'মা' গণসংগ্রামের ঐতিহাসিক দলিল। পাভেল ভ্লাসভের মা নিলভনা মেহনতী সকল শ্রমিকের মা। তাঁর কণ্ঠে শোনা যাক :

"তোমরা জানো, কেন আমার ছেলে আর তার সঙ্গী সাথীদের ওরা ধরে আদালতে নিয়ে এসেছিল ? শোন—তাহলে বলছি। আমি মা। মায়ের প্রাণ আর এই পাকা চুলগুলোকে তো বিশ্বাস করবে ! ওরা সত্যি কথা বলেছিল বুঝলে ? ঐ হলো ওদের অপরাধ। তাই

১• ম্যাক্সিম গোর্কি | 'মা'-উপন্যাস মুখবন্ধ | ৪র্থ সংস্করণ | প্রগতি প্রকাশন-মস্কো ১৯৮১ | পৃঃ ৮

কাঠগড়ায় তুললে। কাল তো দেখলুম—কেউ পারলে ওদের সত্যকে ঠেলে ফেলতে? কেউনা।, ... মানুষ মেহনত করে মরে, তার বদলে পায় কী? না, অভাব অনটন, ক্ষিদে রোগ! চিরকেলে ধরা-বাঁধা মজুরি। সবকিছু আমাদের বিরুদ্ধে। ..... আমাদের জীবনটা একটা আস্ত আঁধার রাত—আর কিছুই না।" ১

গোর্কির রচনার সারাৎসার বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কবিতা লেখার একটা অসাধারণ মেজাজ এনে দেয় ফলে তাঁর কবিতায় যন্ত্রণাবিদ্ধ মানবিক আকার ফুটে ওঠে সত্য হয়ে।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাজনৈতিক সেনানায়ক নন। নিরাপদ আরামের সন্ধানে আলস্য-বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার স্বপ্নও দেখেননি। অন্যায় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে, আজীবন লেখনীর ভাষায়, নির্যাতিত মানুষকে কাছে টানবার আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন। লাঞ্ছিত জনগণের জন্য হাহাকার দুর্বল ক্লীব চিত্তের পরিচয়, সেই কারণেই কবি আন্দোলনের সিদ্ধান্তের কথা বারংবার কবিতায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শে গণসংগঠনে বিশ্বাসী বীরেন্দ্র সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে সদাজাগ্রত। এ তাঁর মনের সাময়িক উচ্ছ্বাস নয়। কবি জেনেছেন এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে একটা অবলম্বন প্রয়োজন। সেই সত্যই কবিকণ্ঠে :

পঁচিশ* বাঁচার জন্য অন্য নিয়ম/লক্ষ টাকার পুরস্কার বা/পক্ষিরাজের বিদেশ যাত্রা; /কিংবা নবরত্ন সভা।

(অন্ধকারের মৃত মানুষ (১০ মে ১৯৭৩) : পৃথিবী ঘুরছে)

নিগ্রোকবি রে গারফিল্ড দানড্রিজ্-র (জন্ম ১৮৮২) তুলনীয় অংশে আর একটু বাঁকা-কথার প্রতিধ্বনি :

মানুষ বাঁচার জন্যই ত মৃত্যুকে বেছে নেয়
সমস্ত শত্রুদের চোখে চোখ রাখো
ভাই আমার
যদি প্রয়োজন হয়, যেন কোন মূল্যে জীবন
দেয়া যায়।
কারণহীন মরে যাওয়ার পরিবর্তে—

(সময় হয়েছে মৃত্যুর: ১০০ বছরের শ্রেষ্ঠ নিগ্রোকবিতা)

॥ সম্পাদিত ও অনূদিত : শক্তিচট্টোপাধ্যায় ও মুকুল গুহ ॥

১* মাক্সিম গোর্কি | 'মা'-উপন্যাস | ৫ম সংস্করণ | প্রগতি প্রকাশন মস্কো ১৯৮১ | পৃ: ৪০৮

অবাস্তবতার মোহে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজেকে বন্দী রাখেননি। ফলে তাঁর কবিতায় বড়ো তীব্র বাক্যাঘাত বাঁকা পথে প্রবেশ করেছে। তবে সকল বিতর্ক কাটিয়ে উঠে তাঁর কবিতা উপভোগ্য এবং প্রতিবাদের সাহিত্যরূপে সমগ্র সমাজ শাসনের বিরুদ্ধে এক অকাট্য আবেদন। গণজীবন দৃষ্টি তাঁর কবিতায় এত ব্যাপক স্থান জুড়ে আছে, গভীর সামাজিক দায়িত্ব বোধের পরিচয়ে যা স্বভাবতই বামপন্থী মানসিকতার ভেতর থেকে কবির নিজত্বকে চিনিয়ে দিয়েছে। সমকালীন জগৎ ও জীবনকে তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রূপের গণ-ভাষায় প্রকাশ করে upright-poet রূপে চিহ্নিত হবার দাবী রাখেন। শব্দকে আঘাত করে করে তাতিয়ে আগুন করে নিয়েছেন। বৃথা হা হুতাশ করেননি, লোককথাকে শব্দে শব্দে লড়াইয়ের বাদ্যে আশ্চর্য প্রাণসঞ্চারী করেছেন তিনি। প্রগতি-বিপ্লব তথা সাম্য-স্বাধীনতার ভাবনা ষড়যন্ত্র-প্রেমীদের সম্মুখে এক অবাঞ্ছিত আপদ, দুষ্ট গ্রহ। গতিশীলতা ভোগলিপ্সুদের মনে আতঙ্ক ছড়ায়। বীরেন্দ্রের জেহাদ কবিতার দীপ্ত কণ্ঠস্বরে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে। জনস্বার্থেই এ আক্রমণ, প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বর্গরাজ্যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে দুশ্চিন্তা-মগ্ন প্রভুর মানসনীতিকে প্রত্যক্ষ করায়ঃ

ছাব্বিশ/ক* বাছারে, আমরা অচ্ছুৎ, তাই যেভাবে যতই ডাকো,
কোন দেবতাই বস্তিতে আসে নাকো।

খ* আয় রোদ্দুর, বস্তিতে —
আধমরা ঐ খুকুর ঠোঁটে একটু চুমুর স্বস্তি দে।

গ* শূন্য উঠান শূন্য মাচা/শূন্য ভাঁড়ার ঘর/এমন দিনে বাছা'রে তোর/এ কোন কঠিন জ্বর ?

ঘ* ক্ষুধার আগুন দাউ-দাউ-দাউ/কান্না ভেজা ঘরে :/মায়ের কোলে দুধের শিশু/দুধ ছাড়া আজ মরে। /বাইরে বাতাস আছড়ে পড়ে……/আমি কী তোর মা ?/ঝাঁটা সইলাম, লাথি সইলাম/কী জন্যে সোনা।

(কালোবস্তির পাঁচালী : মুখে যদি রক্ত ওঠে)

নির্ভীক মানব প্রেমিক বীরেন্দ্র। ইতর জনের প্রতি তাঁর অবাধ

আলিঙ্গন দুঃসাহসে গড়া। কবিতাগুলি সংবাদ-চিত্র রূপে রাজনীতির ফরমাস বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবতাও যে তৃপ্তির সন্ধান দিতে সক্ষম সেই আপ্রাণ নিষ্ঠা অসম্ভব প্রত্যয়ে সরাসরি এই কবি-শিল্পীকে বিদ্রোহীর ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছে, শ্রেণী সংগ্রামকে ভিতরে-বাইরে সম্প্রসারণের ইঙ্গিতপুষ্ট করেছে। কবিতার এই পোষাক পাল্টানো, কবির নিছক খেয়াল নয়। রচনার আকৃতি-প্রকৃতি গত নবরূপান্তর শ্রেণীহীন সমাজেরই আকাঙ্ক্ষার বিষয়। এই পথেই কবিতার গণতন্ত্রীকরণ। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা প্রগতি আন্দোলনের সেই ইস্‌তেহার। কবি মনে করেন দমননীতির চাপে কিংবা সশস্ত্র আক্রমণে সাময়িক সুখ করায়ত্ত করে Marxsist enemies-রা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যে বড়াই করেন পরিণতি কালে এ সবের কোন বাস্তব মূল্য নেই। কবি বীরেন্দ্র অবশ্য গুণ বিচারের কথা স্মরণে রেখে জ্ঞানগর্ভ কবিতাংশের ভিতর মানুষের অনুভূতিকে জাগাতে চান :

সাতাশ• আসে ফাঁসির মঞ্চের/স্মৃতি থেকে অমর মানুষ, কবি, রক্তের ভিতর/প্রতিজ্ঞা নাচিয়ে ঘন্টা বাজে ; নামে ভাগীরথী-ধারা/ রুগ্নের পঙ্গুর প্রাণে ; সকলেই পরিশুদ্ধ হয় ; —/ক্রীতদাস নেতা আর ভ্রষ্টহীন সাংবাদিক ছাড়া।

(অন্যপ্রভু : মুখে যদি রক্ত ওঠে)

নিগ্রো কবি জর্জিয়া ডগলস্ জনসন্ (জন্ম : ১৮৮৬) জীবন সংকটের সুষ্ঠু সমাধানের পথ দেখান নতুন জগতের কবিতায়। মানুষ কোথায় ক্রমশঃ এসে জড়ো হয়, সেই নির্দিষ্ট স্থান একদিন পার্থক্য ঘুচিয়ে জন-সাধারণের হয়ে উঠবে :

আর কি আলাদা করে চেনা যাবে,/নামকরণ করা যাবে,/উঁচু নিচু ধনী দরিদ্র সাদাকালো/রঙের বিন্দুগুলোর/এখানে আফ্রিকার ধুলো জমে আছে/রোমের সন্তানরাও একসাথে/এখন আর কোন পরিচয় নেই চিহ্ন নেই/সারা পৃথিবীর মাটিই সকলের গৃহে এখন।

(ধুলো : ১০০ বছরের শ্রেষ্ঠ নিগ্রোকবিতা)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবি। কবিতার গাঁথুনি আঁট সাঁট। শব্দ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তিনি সরল পথই পছন্দ করেন। প্রচলিত শব্দে প্রচ্ছন্নতা মূর্ত। উদ্দেশ্যের ভারে শব্দ টলেনি, বক্তব্যকে স্পষ্ট করেছে।

বিষাণ্ণতা, ক্লান্তি, তিক্ততা, শাণিত ভাষায় চমকপ্রদ। শব্দে সংযম এবং প্রত্যাশা গভীর উপলব্ধিতে নিমজ্জিত। অভিযোগের ভাষা চাতুরি দিয়ে গড়া নয় সোজাসুজি। বিদ্রোহী কবি নন অথচ জলপ্রপাতের মতো দুর্বার ধারা তাঁর কবিতায়। সুকান্ত লড়াকু কবি, সুভাষ নির্যাতিত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে ভাঁড়ামি পছন্দ করেননি, সরাসরি দুঃসাহসে, কবিতায় বিপ্লবের ভবিষ্যৎ ব্যাখ্যা করে, জন-ঐক্য গঠনে শপথ উচ্চারণ করেছেন আর বীরেন্দ্র সর্বান্তঃকরণে দুর্বল শ্রেণীর মানুষের যন্ত্রণাবোধকে কবিতার শিল্পে রূপ দিয়েছেন। কবির বিশ্বাস জনগণের অমোঘ প্রত্যাশা অশ্রুপাতের মধ্য দিয়ে নয়, ক্ষোভসঞ্জাত পথেই মুক্তি আনবে।

চ০ মুখ্য কবি-সংখ্যা ঃ সোমেন চন্দ

"সমাজের মধ্যপদ ধীরে ধীরে লোপ পায়"—।

সমর সেন 'নবষর্ষের প্রস্তাব' করেছেন সোমেনকে স্মরণে রেখে। এই 'মধ্যপদ' মধ্যবিত্তের কাব্যিক নাম। আভিধানিক অর্থে উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্তদের মধ্যবর্ত্তী স্তর। এঁদের প্রচেষ্টায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভ্যুদয়। এঁরাই বঙ্কিমের 'বাবু'। শ্রমজীবী এবং উচ্চকোটি অভিজাতদের সংস্পর্শ থেকে এঁদের স্বতন্ত্র জগতে বাস। আর একটু স্পষ্ট পরিচয় দেওয়া যেতে পারে :

॥ ১ ॥ "ইংরেজ আমলে শহর জীবনকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল, এ তথ্য সকলেই জানেন। এ শ্রেণীর মানুষেরা ছিলেন বৃত্তিজীবী, কোন না কোন বৃত্তিকে অবলম্বন করে তাঁদের জীবিকার সংস্থান হত। দেশের গাঁয়ে এঁদের কারও জমি জমা ছিল, কারও ছিল না. তবে শহর জীবনের নানাবিধ কর্মের সূত্রেই যে এঁদের আয়ের একটা মোটা অংশ অর্জিত হত তাতে সন্দেহ নাই। বৃত্তিতে এঁরা ছিলেন নগর নির্ভর. মনোভাবেও বটে। উকিল, ডাক্তার, কেরানী, আপিস পরিচালক, সাংবাদিক অধ্যাপক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, দোকান পরিচালক, দালাল, ঠিকাদার প্রভৃতি বিচিত্র ধরণের কর্মীর দ্বারা এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কলেবর গড়ে উঠেছিল।

॥ ২ ॥ এভাবৎ নির্যাতিত-শোষিত শ্রেণীগুলি যে পরিমাণে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে. মধ্যবিত্ত শ্রেণী সে পরিমাণে নীচে নেমে যাচ্ছে।

॥ ৩ ॥ আমরা চাই আর না চাই, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমশ : নিস্তেজ হয়ে পড়বার সম্ভাবনা স্পষ্ট।" ১

১০ নারায়ণ চৌধুরী/আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ণ/১ম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৬৫/পৃঃ ১১৯-১২০
প্রকাশক : জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ. রাসবিহারী অ্যাভিন্যু : কলিকাতা—২৯

উদ্ধৃত মন্তব্য থেকে সোমেনের চিন্তা-পথ চিনতে পারা কঠিন নয়। ঐ নির্জলা সত্যকথা কাল্পনিকতা কিম্বা আনুমানিকতায় ধূমায়িত, ভাবা কষ্ট। কারণ যুগধর্ম ক্রমবিবর্ত্তণের মধ্য দিয়ে ধনতন্ত্রের গতি স্তব্ধ করে, একদিন বুদ্ধিগ্রাহ্য আশাবাদ প্রগতির পথে আত্মবিচ্ছিন্নতা অভিশাপ থেকে সর্বজনের মুক্তি আনতে বাধ্য। যন্ত্রোন্নত বিশ শতকের শেষ পর্য্যায়ে বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা, মানব প্রেমিক সোমেনকে সেই পরম কথাটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। মধ্যবিত্ত জীবনের ভয়াবহ সংকট এবং পদে পদে বহুবিধ ব্যর্থতার সংবাদ তাঁর জানা। শোষণ ও শ্রেণী-মুক্ত নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখে যিনি 'অগ্রগতির মেলে' চাপতে চেয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে তিনি মুক্তিকামী 'সুকান্ত-অগ্রজ' সোমেন চন্দ। চল্লিশের দশকে স্বল্পায়ু নিয়ে 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই মর্মবানীর রূপ দেবার ইচ্ছায়, গল্প, উপন্যাস, নাটকে হাত দেন। বাঙলা সাহিত্যে এ এক আকস্মিক চমক। গদ্যের সরস ভূমিতে মনের ফসল বুনলেও কিশোর-কবি-মনকে তিনি গোপন রাখতে পারেননি। অনায়াসেই তাই তাঁর জীবন ও বস্তুনিষ্ঠ প্রাণবেগ গণসাহিত্যের ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে গদ্যকেও কাব্যগুণে প্রতিশ্রুতিময় করে তুলেছিল।

কবিতার সীমানা কোন নির্দ্দিষ্ট মাপে চিহ্নিত নয় সত্য, তবে তার সীমানার ভূমি মাত্রাবদ্ধ। আর সেই কারণেই বক্তব্য পরিবেশন দুরূহকার্য। কারণ সংশয়, ব্যথা-বেদনা, প্রতিবাদ, ক্ষোভ, আনন্দ, বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, প্রেম আশা-নিরাশা, ক্লান্তি, সুখ কিংবা স্বপ্ন-জাগরণের কথার আত্মপ্রকাশ যে ভাষার কৌশল আশ্রয়ে নির্মিত, তার পরিধির কথা চিন্তা করে কলেবর সংক্ষিপ্ত করতে হয়। ফলে সাধারণ মানুষের মর্মস্থলে তার পূর্ণরস দান সম্ভব নয়। ভাষা ছন্দ, অলংকার পরিহিত কবিতা, কবি ও শ্রোতার উপলব্ধির সংযোগ সেতু রচনায় ব্যর্থ, কারণ সেখানে অধিকারীর প্রশ্ন, কারণ অধিকাংশ জন মনে শিক্ষার অভাবে রুচির আলো পৌঁছয়নি। যৌথ জীবনের সংবাদ শক্তিধর কবিতায় পরিবেশিত হলেও শ্রোতৃবর্গ অনুধাবন করতে পারে না। তাই গদ্যের বিশাল ক্ষেত্রে ছড়ানো অসংখ্য বাবহারিক খণ্ড চিত্র থেকে আবশ্যকীয় রসাস্বাদন সম্ভব।

ছোট গল্পে মাত্র বিশেষ বিষয় এবং উপন্যাসে অখণ্ড জগৎ-জীবনের প্রতিচ্ছবি, উভয়ের ক্ষেত্রে আলোক পাত সীমিত বা ব্যাপ্ত থাকে। নির্মাণের গুণে কবিতা, অন্য পক্ষে, অধিকারীভেদ বেশি মানে। হয়তো বা জনস্বার্থেই গদ্য সাধনার পথ অনুসরণ করেছিলেন সোমেন।

সমস্যা সংকুল সমাজে এত কথা বলার আছে যা একমাত্র গদ্যই নিশ্চিতরূপে সর্বজনগম্য করে দিতে পারে। জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনাকে শিল্পিত করার অনুকূলতা মিলবে গদ্যের নান্দনিক চারণ ভূমিতে- বুঝেছিলেন সোমেন। মোহিতলাল-ও বলেন :

> সংসারে যে অনেক অভাব. অনেক জোড়াতালি—
> তার তরে, ভাই, বাগিয়ে কলম গদ্য লেখোখালি ;
> কেবল যখন মাঝে মাঝে প্রাণের পরব আসে,
> তখন, ওহো ! পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে।

(গদ্য ও পদ্য : মোহিতলাল মজুমদারের সুনির্বাচিত কবিতা)

সোমেনের সাহিত্য ও রাজনীতি জীবন থেকে কোন পৃথক বস্তু ছিল না। ছন্দে বাঁধা কবিতা হল, আদর্শের অনুপ্রেরণা জোগাবার মাধ্যম। জীবনের সঙ্গে জীবনের সোজাসুজি মোকাবিলা করবার মানসিক হাতিয়ার গদ্য। গদ্য সংগ্রামী জীবনে প্রাণীনতা সঞ্চারের উপায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ "গদ্য এলো অনেক পরে/বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর/সুশ্রী কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এল/ঠেলাঠেলি করে।"

এই আগমন জীবন-বিচ্ছিন্ন কোন বিপথ নয়। সমাজেরই সুবাদে সাহিত্য শিল্প এবং চিন্তা-ভাবনার বিবিধ ক্ষেত্র কালের দাবী নিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সোমেন চন্দের রাজনীতিক উদ্যোগে এবং সাহিত্য কর্মে এখানেই সে দায়িত্ব পালনের চেতনা। স্বল্প সৃষ্ট তাঁর কবিতাতেও ঐ ভাবনার অব্যর্থ প্রতিধ্বনি ঃ

উর্বর জমির সোনার ফসল
অনুর্বর জমিতেই ছড়ানো রীতি—
মূর্খরা দরও বোঝে না!
নিজ বাসভূমি ছেড়ে পরবাসী হলে—
আপশোষ কেন! পরবাসী তো ঈশ্বরেরই পৌষ্যপুত্র।—
ইংরেজকে জানো না?
হে কৃষ্ণ, বৃথা আলস্য,
বার বার বলি, নিদ্রাই সারবস্তু নয়।
আকাশের দিকে লক্ষ্য রেখো ঃ
কবে আবার ঝড় আসবে?
এখানে স্বর্ণলঙ্কা,
(ভয় নেই, এ যুগে রাজায় রাজায় যুদ্ধ আর বাধে না)
প্রতি দ্বার পথে নরম সোনার আলো,
পথে-বিপথে কাউন্টার পাশে
ঝক্-ঝকে তক্-তকে স্বর্ণকান্তি মানুষের ভীড়—
এরা এঞ্জেল!
সুপ্রশস্ত পথের ধূলোয় স্বর্ণরেণু।
উর্বর জমির সোনার ফসলের
আবার বৈজ্ঞানিক চাষ এখানে।
'সুলতা, তোমার কিছু শীতের পোষাক চাই তো?

(রাজপথ : সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সংগ্রহ)
১ম খণ্ড/২ সং ৫ই আগষ্ট ১৯৭৮

সোমেনের কিশোর কবি-প্রাণ থেকে পরিণত মানস যন্ত্রণার শাশ্বত উপহাররূপে আবির্ভূত এই কবিতাটি শোষণ-যন্ত্রে বিদ্ধ পরাধীন মানুষের সামনে শুভ কর্মপথের দ্যোতক।

ফ্যাসিস্ট এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে নিহত সোমেন স্বাধীন—ভারতকে দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের শাসনাধীন

ভারতীয় প্রজাবৃন্দের নিরুপায় অবস্থা জন-প্রেমিক মার্কসবাদী সোমেনের মনে, বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের ভাষা জুগিয়েছিল। ঘোর দুর্দিনে মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা দেখে তাঁর প্রবল স্বাজাত্যবোধ, কবিতায় হতভাগ্য দেশবাসীর অপমান এবং দুঃখ ভোগের বিপজ্জনক আলেখ্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রতীকী। পরবাসী স্বর্ণকান্তিযুক্ত ইংরেজের ছলনার অর্থ না বুঝে সরল অবুঝ সাধারণ মানুষ রাজভক্তি প্রদর্শণের মধ্য দিয়ে দুর্ভিক্ষ, মহামারীর মতো নির্মম, মৃত্যুযন্ত্রণায় নিজেদের অপদার্থতাকে প্রকট করে গেছে। অথচ ভারতেশ্বরীর এঞ্জেলদের চোখে একবিন্দু সহানুভূতির অশ্রু ঝরেনি। অন্যদিকে প্রভু সেবার ইনাম পাওয়া স্বদেশী রাজাদের মনে আর কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তাদের অটল ভক্তির আনুগত্যে বৃটিশ প্রতিনিধিরা মুগ্ধ এবং নিশ্চিন্তে শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে পারবে বলে আশান্বিত। আর সাধারণ প্রজাপুঞ্জ ভোগের বলির মতো শাসনের হাড়িকাঠে নিশ্চিহ্ন। কিন্তু মানব প্রেমিক, স্বদেশ পূজারী সোমেন সাম্রাজ্যবাদীর এই নৃশংস বিগ্রহের ভিতরেই আসন্ন ঝড়ের সংকেত পেয়েছেন। সোমেনকে বুঝতে হলে তাঁর কর্মস্থল ঢাকা এবং তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থার উজান থেকে এই জরুরী তথ্য প্রাসঙ্গিক ঃ

এক ● "১৯৪০ সালে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে ঢাকা, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রতিষ্ঠা। অন্যান্যদের সঙ্গে তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ঢাকার বহু খ্যাত নামা সাহিত্যিক এই সংগঠনে যোগ দেন। মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে সোমেন চন্দ ইহার প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন।

সোমেন চন্দ সেই সময়েই তখনকার সাহিত্যিক মহলে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং গভীর ভাবে মার্কসবাদ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। মার্কসবাদ অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মে যে সাধারণের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হইতে না পারিলে কোন সত্যিকার প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

..... ১৯৪১ সালে সোমেন চন্দ সর্বসম্মতিক্রমে ঢাকা রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক নির্বাচিত হন। একই সঙ্গে প্রগতি লেখক সংঘ ও রেলওয়ে ইউনিয়নের কষ্ট সাধ্য কাজ তাঁহাকে চালাইয়া যাইতে হয়।

দুই ● ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা শহরে এবং রায়পুর থানায় এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সমস্ত জিলায় সাম্প্রদায়িক অবস্থায় বিশেষ অবনতি ঘটে। ঢাকা শহরের দাঙ্গায় যথেষ্ট সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান নিহত হয়। ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে প্রদ্যোৎ সরকার নামে জগন্নাথ কলেজের একজন তরুণ ছাত্র-কমরেড দিনে দুপুরে ছোরার আঘাতে নিহত হয়। এই বৎসর ৮ই মার্চ আমাদের কমরেডদের উদ্যোগে সুত্রাপুরে একটি ফ্যাসিই বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য রেলওয়ে কলোনী হইতে একদল রেল শ্রমিক তরুণ-সাহিত্যিক কমরেড সোমেন চন্দের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা করিয়া আসিতে থাকেন। পথে লক্ষ্মীবাজারের নিকট এই শোভা-যাত্রাটি ক্যাব্রিবাদে বিশ্বাসী কয়েকটি রাজনৈতিক গ্রুপের কর্মীদের দ্বারা বেলা ৩টায় আক্রান্ত হয়। সদর রাস্তার উপরে তাঁহার চক্ষু দুইটি খুলিয়া ফেলা হয়, তাঁহার জিহ্বা বাহির করিয়া কাটিয়া ফেলা হয়। তাঁহার সর্বশরীরে ছোরার আঘাত করা হয় এবং ভোজালি দিয়া তাঁহার পেট চিরিয়া ফেলা হয় তারপর হত্যাকারীর দল তাঁহার দেহের উপর দাঁড়াইয়া পৈশাচিক জয়ের আনন্দে নৃত্য করিতে থকে।" ১

প্রগতিশীল গণ আন্দোলনের কর্মী-কবি সোমেন চন্দ। সমগ্র ভারতের শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির জন্য তাঁর বিপ্লবী চিন্তা ছিল এক প্রেরণা-দৃপ্ত-ইঙ্গিত। বর্বরতার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক গণ-মুক্তির কুটন্ত প্রতিবাদ এবং

---

১০ দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সমগ্র/২য় খণ্ড পৃঃ ১৮২-১৯৫/ ১ম সং ৫ই আগষ্ট ১৯৭৭ প্রকাশক ঃ নবজাতক ও প্রকাশন, এ-৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭ পৃঃ ১৯৮

সংস্কৃতির বিজয় বার্ত্তা একত্রে মিলে মিশে তাঁকে এক প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গড়ে তোলে। যৌগিক রসায়ণ থেকেই সোমেন খাঁটী দেশপ্রেমিক শুধু নন, একটা সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ। তাঁর সাহিত্যে 'world-view' কতটা প্রতিফলনের সুযোগ পেয়েছে সে আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে তাঁর লেখক হবার মানসিকতা গঠনের প্রতিবেশ-ভূমির সারসংক্ষেপ উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ

> "১৯৩৯ সনের পূর্বেই পূর্ববঙ্গের ঢাকা ও অন্যান্য শহরে রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন ধ্যান ধারণার সূত্রপাত হয়েছিল। ব্রিটিশ কারাগারগুলোতে যে সব রাজবন্দী ছিলেন তাঁদের অনেকেই জেলে থাকাকালীন মার্কসবাদের দিকে ঝোঁকেন এবং জেলের বাইরে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ট্রেড-ইউনিয়ন ও কৃষকসভাকে কেন্দ্র করে নতুন জীবন্ত প্রগতিশীল আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যে লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের একটি গরিষ্ঠ অংশ সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হন। এঁদের মধ্যে যেমন পুরোপুরি কমিউনিস্ট মতবাদের সমর্থক লেখক ছিলেন তেমনি অকমিউনিস্ট, সাধারণ-ভাবে মানবতাবাদী বা হিউম্যানিস্ট লেখকও ছিলেন। এই সব লেখকদের সহায়তায় ঢাকায় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ স্থাপিত হয় ১৯৩৯ সনেই। ঐ বছরেই সকলেরই জানা আছে, সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ও নাৎসী জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় আগেই বাঙালি লেখকরা ভারতের ও পৃথিবীর নানা দেশের সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের মতোই ফ্যাসি-বাদের মারাত্মক আক্রমণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন "[১]

সোমেন বিক্রমপুরের (ঢাকা/অধুনা বাঙলাদেশ) এক মধ্যবিত্তঘরের

---

১০ দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত/সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সমগ্র/২য় খণ্ড পৃঃ ১৮২-১৯৫/ ১ম সং ৫ই আগষ্ট ১৯৭৭ প্রকাশক ঃ নবজাতক ও প্রকাশন, এ-৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭ পৃঃ ১৯৮

সন্তান। জন্মবিধি এই সংসারের অভাব, দেখেছেন একমাত্র অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণেই তিনি মিটকোর্ড মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষার জন্য ভর্তি হয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। পারিপার্শ্বিক দুর্ভেদ্য সংকট তাঁর সংকল্প চ্যুতির ভয়াল পরিবেশ রচনা করে। এতদ-বস্থায় জীবন-সৈনিক সোমেন হা হতোহস্মি করেন নি। বরং রাজনৈতিক চেতনা তাঁকে গণপ্রেমের ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বাইশবছরের জীবনে যথার্থ জনগণের শব্দিক-শিল্পী করতে পেরেছে। তাই তাঁকে মানবাত্মার কারিগর বলা যায়। তিনি মর্মযন্ত্রণাকে অসম্ভব সংযম এবং নিরলঙ্কার ভাষার গাঁথুনিতে বিবিধ রচনায় প্রতীকী কাহিনীকে তাৎপর্য-বাহীরূপে সত্যনিষ্ঠ করে গণজীবনের দরদী কবি হয়ে উঠলেন:

> "প্রগতি লেখক সঙ্ঘকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম প্রয়াস হয়েছিল এদেশে নয়, বিদেশে; লণ্ডনে এক ঘরে বসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকজন যে আলোচনা ১৯৩২-৩৩-৩৪ সালে করেছিল, তারই পরিণতি ঘটে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠায়। সে আলোচনায় যারা যোগ দেয় তারা সবাই যে লেখক তা নয়; আজও প্রগতি লেখক আন্দোলনে লেখক আর পাঠকের প্রায় সমান স্থান রয়েছে বললে হয়ত একেবারে ভুল হবে না। মুলক্‌রাজ আনন্দ,— সাজ্জাদ জহীর, ভবানী ভট্টাচার্য, ইক্‌বাল সিং, রাজা রাও, মুহম্মদ আশরফ্ এবং আরও কজন মিলে যে আলোচনা চলে তারই জের এদেশে টেনে ১৯৩৫ সালে প্রস্তাবিত প্রগতি লেখক সংঘের ইশ্‌তেহার প্রকাশ হয়। ১৯৩৬ সালে ইষ্টারের ছুটিতে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময় মুন্সী প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন হয়।
>
> ..... আমাদের দেশে প্রগতি লেখক সংঘের যোগাযোগ ছিল 'ওয়ার্লড কংগ্রেস ফর দি ডিফেন্স অব পীস' এর সঙ্গে। রমাঁ রলাঁ প্রভৃতি মনীষী ফ্যাসিজম্ যে নির্লজ্জভাবে যুদ্ধের চক্রান্ত করছিল তার বিরুদ্ধে প্রধানত লেখক শিল্পীদের নিয়ে সংগঠনের

আহ্বান দেওয়ায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্যারিস, ব্রাসল্‌স্, মাদ্রিদে এর অধিবেশন হয়েছিল— মুল্‌করাজ আনন্দ ভারতীয় লেখকদের প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে যোগ দিয়েছিলেন। ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ তারিখে ব্রাসেল্‌সে যে বিশ্বশান্তি সম্মেলন হয় সেখানে প্রধানত বাঙালী প্রগতি লেখকদের উদ্যোগে একটি ইশ্‌তেহার ভারতবর্ষের পক্ষে পাঠানো হয়। এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, প্রেম চন্দ্, জওহর লাল নেহেরু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নরেশ সেনগুপ্ত, নন্দলাল বসু প্রভৃতি।

....প্রগতি লেখক আন্দোলন সংগঠন হিসাবে শক্তিশালী ছিল না। কিন্তু তার প্রভাব যে সুদূর হয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই।" ১

গণদরদী সোমেন সেদিন ফ্যাশিজমের বীভৎসতা দেখে শিউরে ওঠেন। তারই ফলে তাঁর ব্যক্তিকণ্ঠ যুগকণ্ঠ হয়ে জীবনের কথা শোনাতে সাহিত্যে গর্জমান। তাঁর দুঃসাহসী মানবিক সত্তা সামন্তশ্রেণী এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসক কুলের চেহারাটা দেখতে পেয়েই মহাবিদ্রোহের সঙ্গে সাহিত্যে ঝাঁপ দেয়। অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করার প্রয়াসের মধ্যে গণশ্রেণী সমাজের প্রতি হৃদয়ের টান সাহিত্যকেও তার সঙ্গী করে দেয়। কেন না এই সমাজচিত্র সোমেন ভাল করেই দেখেছিলেন ঃ

"সমগ্র ভারতে আজ গণশক্তির জাগরণ, সর্বত্র কায়েমী স্বার্থ (vested-interests) উঠাইয়া দেবার কথা ও আন্দোলন চলিতেছে, সাম্য স্থাপনের কথা উঠিতেছে, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য ও জমিদারের উচ্চ আদর্শ দেখাইবার জন্য এই Commer-

১০ দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত/সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সমগ্র/২য় খণ্ড পৃঃ ২৪৯-২৫৭/পৃঃ দ্রঃ

cial ও Industrial যুগে বিপ্রদাসের (ক) বা আক্রমণের রাজনীতিক চালবাজী অনেকের নিকট ঢাকা থাকে নাই।" ১

সোমেন তাঁর চোখ ফেরালেন সেই কর্মসূচির দিকে, যা একদিন হবে প্রতিশ্রুতি পালনের একমাত্র মন্ত্র :

"১৯৩৮ সালে ২৪শে ডিসেম্বর ও ২৫শে ডিসেম্বর কলকাতায় সারাভারত প্রগতি লেখক সংঘের ২য় সম্মেলনের মঞ্চে এই ইশ্‌তেহারটি গৃহীত হয় :

.....ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে গর্ব করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে আমরা সমালোচনা করব এবং সৃজনশীল ও পারস্পরিক কাজের মধ্য দিয়ে আমরা জাতির নবজীবন সঞ্চারের প্রচেষ্টা করব। আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতের নূতন সাহিত্য আমাদের জীবনের মৌলিক সমস্যা-বুভুক্ষা ও দারিদ্র্য, সামাজিক পশ্চাদপদতা ও রাজনৈতিক অধীনতার সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করবে। যা আমাদের নিরুদ্যম, নিষ্ক্রিয় ও যুক্তিহীন করার চেষ্টা করবে তাকে আমরা প্রতিক্রিয়াশীল বলে বাতিল করে দেব। যা আমাদের মনে সমালোচনার মনোভাব জাগ্রত করে তুলবে, সক্রিয় করবে, সংগঠিত করবে এবং সচেতন করে তুলবে, আমরা তাকে প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।" ২

সাহিত্যে পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশের আগেই সোমেন ফুরিয়ে গেলেন। তিনি যে সম্ভাবনা পূর্ণ, সে সম্পর্কে এ স্থলে দু'একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণযোগ্য। কারণ তাঁর বিকাশ-ভাবনার কথা যাঁরা বুঝেছেন, জেনেছেন তাঁদের কয়েকটি মন্তব্য অনুসরণ সাহিত্যে গুণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বড়ো অবলম্বন :

(ক) ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) ভাষায় :—
"আজকাল যে ভারতের সর্বত্র শ্রমিক ও কৃষক জাগরণ হইতেছে, তাহারাই যে স্বরাজ শাসনের ভার লইবার অধিকারী বলিয়া দাবী করিতেছে তাহারও নিদর্শন সাহিত্যে কৈ? ইহার বদলে আমরা দেখি যে হঠাৎ মাথায় টিকি ও এক হাতে মনু ও রঘুনন্দন, আর অন্য হাতে কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চুক্তিপত্র নিয়া লোক সমাজে আবির্ভূত হইয়াছেন "বিপ্রদাস!"
ধনঞ্জয় দাশ। সম্পাদিত/মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক/৩য় খণ্ড পৃঃ ৫৭ অন্যত্র দ্রষ্টব্য

১০ ঐ ঐ ঐ

২০ দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত/সোমেন চন্দ্র ও তাঁর রচনা সমগ্র/২য় খণ্ড পৃঃদ্রঃ ২৭৭-২৭৮

ক* লীলা রায় বলেছেন :

..........."Further revealing a remarkable talent comes a small volume of short stories, Premonition (Sanketa), almost all that remains to us of the young communist writer, Somen Chanda, assassinated in March 1942. He had an extra ordinary purity of mind and on unblushing eye for beauty.

............"The Riot" gives an intimate picture of Dacca at the time of the communal trouble.

............His village, the journey by launch, the crowds of strikers, picketing, speeches, firing and the manager are all shown to us through his eyes. Humble members of the 'masses', Somen Chanda's Characters come alive in their own right and are as individual and as full of conflict as human beings generally are.

............He is more than a politician here, he is an artist. ১

খ* নির্মলকুমার ঘোষের অভিমত :

"সাহিত্যের দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে এই কথা বলা চলে যে সাহিত্যের যে পরিণত অবস্থা সমালোচনার কষ্টিপাথরে পাকা দাগ রেখে যায়, 'সোমেন্দ্র-সাহিত্য' সে অবস্থায় পৌঁছয়নি। বহুকালের স্তর বিন্যাসের চাপ লেগে পৃথিবীর অভ্যন্তরে বস্তু পিণ্ডের যেমন আণবিক পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে তা একদিন হীরকে, পান্নায়, চুণি

১০ দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত/সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সমগ্র/২য় খণ্ড পৃঃ ১৮০/পৃঃ দ্রঃ

ও সোনায় ঝলমল করে ওঠে— সোমেন্দ্রের সাহিত্য প্রতিভা তেমন বহুস্তর অভিজ্ঞতার চাপ পেয়ে উঠতে পারেনি। এক জায়গায় হয়তো কিছুটা প্রায় পরিণত অবস্থা লক্ষ্য করা গিয়েছে কিন্তু তা সমগ্র রচনায় পরিব্যাপ্ত হয়ে ওঠেনি।

……তার চারপাশের দেউলিয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিকদের জীবনই ছিলো তার সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা।" ১

গ* অমিয় চক্রবর্ত্তীর ভাষায় :

'We build barricades !
Let the spirits sword
Stay the destroyers !
Take up the song
Not a blackshirt shall remain,
no, no !' ২

ঘ* বিষ্ণু দে'-র অনুভব :

We laugh victoriously, disdaining despicable clinging to life.

We know the broken knife is useless, useless weapons,

Yet we know that with these Dadhichi's bones, these broken arms,

We will cut a page of history today and inscribe our triumphs there.' ৩

১• দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত/সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সমগ্র/২য় খণ্ড পৃঃ ১৭৩/পৃঃ দ্রঃ
২০ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৭৮/ ঐ
৩• ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৭৯/ ঐ

ঙ* বুদ্ধদেব বসু লেখেন ঃ

'নামহীন আততায়ীর রক্তাক্ত ছুরিকার আঘাতে যিনি প্রাণ হারালেন তিনি ছিলেন বয়সে তরুণ প্রগতিশীল সাহিত্যিক, তার উপর গণ আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িতকর্মী।' ১

চ* গোপাল হালদার বলেছেন ঃ

'আমাদের মতো অনেকের কাছে সোমেন চন্দ তাহার পরিচয় লিখিয়া গিয়াছে অন্য ভাষায়। সেই লিপিই রক্ত দিয়া লেখা। পৃথিবীর দাবীকে সে বুক দিয়া স্বীকার করিয়াছে, উহাই জানিতাম তাহার লেখা, আর তাহার সত্তার সংকেত।

তারপর 'পরিচয়ের' পাতায় একদিন 'ইদুর' পড়িলাম—
Then felt I like some watcher of skies when a new planet swims into his ken.২

এবার সোমেনের চিঠির কিয়দংশে তাঁর উন্মুক্ত চিন্তার সন্ধান করা যেতে পারে ঃ

ছ/১০ (শ্রীনির্মল ঘোষকে/ঢাকা, ৯ নভেম্বর ১৯৩৮)

"আপনি অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন, গ্রাম্য অভিজ্ঞতা আমার প্রচুর—এমন কী, যা কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনেকেই কতকগুলো Sweet উপন্যাস রচনা করেছেন, বৈষ্ণবদের সেই আখড়ার সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আমি। কিন্তু সে সব পুরোনো হয়ে গেছে, এখন নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর দরকার। বছর খানেক আগে সেই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পথই খুঁজে পেতাম না, এখন কতকটা পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে।

আপনি 'বিত্তহীন মধ্যবিত্তদের' নিয়ে লিখতে বলেছেন এঁদের ছাড়া আমি আর কাউকে নিয়ে লিখব না জানবেন। আমার বর্ত্তমান উপন্যাস তাঁদের নিয়েই।' ৩

---

১০ দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত/সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সমগ্র/২য় খণ্ড পৃঃ দ্রঃ ১৮১
২. ঐ ঐ ১ম খণ্ড ৩০৯-১০
৩০ দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত/সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সমগ্র/১ম খণ্ড পৃঃ/২৯২-৯৩পৃঃদ্রঃ

২০ (ঐ/ঢাকা ৯/১২/৩৮)

"জোসেফ ম্যাজিনির 'Duties of man', এই বই পড়ে একটা ভয় হয়, সেটা আপনাকে বলি। ম্যাজিনি যখন বেঁচেছিলেন সে আজকের কথা নয়। সমাজ ব্যবস্থার অনুরূপ হয়েও এবং এত আগেও এরকম অনেক চিন্তাশীল লোকদের লেখায় বক্তৃতায়, সোশ্যালিজমের আভাস পেয়েও সেখানে আজ ফ্যাসিজম্! এই দেখে মনে হয়, ভারতেও তাই হবে। কাল না হয় বৃটিশের হাত থেকে ছাড়া পেলো, কিন্তু পরশু গিয়ে পড়বে ধনীদের হাতে…' ১

সোমেনের প্রতিভা আলোচনার ক্ষেত্রে এই কয়েকটি উল্লিখিত তথ্য প্রয়োজনীয়। তাঁর বিশিষ্ট রচনায় গণ-সান্নিধ্য কতখানি প্রগতিধর্মী, তা গণ-বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে কেন, আর সেই কারণের সঙ্গে কী পরিমাণে কাব্য-ধর্মই বা রক্ষা করতে পেরেছেন তিনি সেই সব কিছু বিচারের জন্য কয়েকটি 'গল্প' অনুসরণীয় ঃ

॥১॥ শিশু তপন ॥২॥ বনস্পতি ॥৩॥ রাত্রি শেষ ॥৪॥ স্বপ্ন ॥৫॥ একটি রাত ॥৬॥ সংকেত ॥৭॥ দাংগা ॥৮॥ ইঁদুর

এগুলি সোমেনের গল্প, তবু তা কবিতার স্পর্শ উপেক্ষা করতে পারেনি। ধারাবাহিকভাবে সেই উদাহরণ উপস্থাপন করার পূর্বে 'কবিতায়' ভাবনা প্রকাশের মাধ্যম এবং তার স্বরূপ কী, তার কথা সেরে নেওয়া যক্ ঃ

> "কবির প্রথম ও প্রধান কাজ আত্ম প্রকাশ। যিনি নিজের উপলব্ধিকে ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারেন, তাঁহার আন্তরিক উপলব্ধি যত বিরাট হউক না কেন, তিনি কবিত্বের দাবী করিতে পারেন না।
>
> ..... যত দূরেই যান, কবিকে তবু সমাজের নিকট ফিরিতে হইবে। সমাজের এই দাবী কোনো কবি উপেক্ষা করিতে পারেন না। ২

---

১০ দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত/সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সমগ্র ১ম খণ্ড পৃঃ ২৯৪/পৃঃ দ্রঃ

২০ ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত/মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক/৩য় খণ্ড পৃঃ ৭৭-৭৮ পৃঃ দ্রঃ

সোমেনের গল্প কাব্য সৌরভে, উপমা এবং বাক্‌বিন্যাসে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছে। দাংগা, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ এবং গর্বোদ্ধত সাম্রাজ্যবাদের রূঢ় অভিঘাত সোমেনের লব্ধ অভিজ্ঞতার পশ্চাৎপট। এই অগ্নিগর্ভ থেকেই রাজনীতি এবং সাহিত্যের রাজ্যে তাঁর প্রবেশ। স্বকাল এবং স্বদেশ ভাবনা তাঁর জীবনে চূড়ান্ত সত্য হয়ে ফুটেছিল। অসাম্যের বিরুদ্ধে সোমেনের সংগ্রামী চেতনা প্রতিশ্রুতির দুর্লভ ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতি এবং সাহিত্যে তাঁর কোন দ্বন্দ্ব নেই। অখণ্ড জীবনের অন্তর্বেদনা সোমেনকে সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী মানুষ করে তুলে ছিল। আর সেই সমাজ চৈতন্য, কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁকে যুক্ত করে। তবে তাঁর রচনার সাহিত্য-সৌরভ রাজনীতিকে অনায়াসে আত্মসাৎ করতে সক্ষম। যৌবনের বাধাহীন গভীর অস্থিরতা, জনজীবনকে তাঁর সাহিত্যে বিবিধ তাৎপর্যে ইতিবাচক ভূমিকায় স্থাপিত করেছিল।

সোমেনের গদ্যের সাম্রাজ্যে সেই কাব্যশিল্প কর্মের অভাব নেই। 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়' জেনেও সোমেনের গল্প ভাষার কবিতার চিত্র উপমা আবেগ স্পন্দ ভাবের যতি ইত্যাদি উপাদান, রচনার বাক্যে বাক্যে অজস্র। শব্দ নির্বাচন, শব্দের সজ্জা এবং শব্দে শব্দে অন্বয় ঘটানোর কাব্যিক পন্থায় তাঁর গদ্যের নির্মিতি। গদ্যের নিয়মে বাঁধা ক্রিয়াপদের অবস্থান বদল করে কখনো লোপ করে দিয়ে ভাষা প্রকাশকে তিনি অনেকস্থলেই কাব্যাস্বাদের এলাকায় পৌঁছে দিয়েছেন। কবিতার এই অন্তঃশীল সঞ্চার তাঁর গল্প-গদ্যের গড়নে।

সোমেন গণকবি। গণজীবনের যন্ত্রণার সাক্ষী শরিক হয়ে তাদেরই রূঢ় অদৃষ্টের রূপকার তিনি। তাঁর কলমের যে কাব্যভাষা, স্বভাবতই তা রোমান্টিক স্বপ্নবিলাসের হবে না। গণমানুষের বাস্তব জীবনের সে প্রকট দারিদ্র্য তাঁর আবেগ নাড়া দিয়ে কবিতার যথাসম্ভব শিল্প উপকরণ আদায় করে নিয়েছিল। নিচের গল্পাংশগুলিতে কিছু পদ্যধর্মের নমুনা ঃ

১০ চাঁদের আলোর মত নরম/নীল আকাশের মত সুন্দর।
—'শিশু তপন'

২০ সমুদ্রের বুক দেখা যায়/কুকুরের ডাক আজ মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ। 'বনস্পতি'

৩০ তারা সারাদিন এক মুষ্টি অপ্রচুর/অন্নের জন্যে/দেহের রক্ত জল করে বাড়ী ফেরে/সর্বাঙ্গ লোনায় ধরেছে/ চোখেও একরাশ অশ্রু জমা হয়েছে/। 'একটি রাত'

৪০ বন্ধুগণ! আমাদের দেখে আশ্চর্য হবেন না/আমরা এই মিলেরই শ্রমিক, আপনারা যেখানে/কাজ করতে এসেছেন আমরা সেখানেই প্রথম/কাজ করতে আসি।

……ভাই সব। আপনাদের চোখে পৃথিবী/যেমন, আমাদের কাছেও তাই, আপনাদের/যতখানি শোষণ দুঃখ-দুর্দশার কষ্ট সহ্য করে/চলতে হয়, আমাদেরও তাই

……ভাই হয়ে ভাই-এর মুখের ভাত/এমন করে কেড়ে নিবেন না।

কিংবা গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতায় কেবল/জলের শব্দ/। 'সংকেত'

৫০ সাপের দেহের মতো পিচ্ছিল নিস্তব্ধ রাত্রি/গাঁয়ে চৈত্রের বাতাসে আজ কান্নার সুর/। 'স্বপ্ন'

৬০ বর্ষার জলের গন্ধে আমার বুক/ভরে এসেছে/দুঃখের সমুদ্রে যদি কেউ গলা পর্যন্ত/ডুবে থাকে/তবে তা এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী/যে ফুল অনাদরে শুকিয়ে ঝরে পড়ে— মাটিতে, এরা তাই/এরা তৈরী করছে বাগান/অথচ ফুলের শোভা দেখেনি/পেটের ভিতর ছুঁচ বিঁধছে প্রচুর/কিন্তু ভিক্ষাপাত্রও নয়/পরিহাস! পরিহাস!/। 'ইঁদুর'

৭০ কেমন হাঁ করে বৃষ্টির আশায় চেয়ে/থাকে ভিক্ষুকের মতো/ভয়ানক অলস. সবই আরামে পেতে চায়/আর পেটভরা অহঙ্কার/তোমার ওই কালো চোখ চেপে ধরবে/ আমার বাথায়/রাতের স্বপ্ন বন্দিনী হলো হাতের মুঠোয়/ শিরা উপশিরায় বিভীষণের রক্ত/চোখে কংসের দৃষ্টি/ পায়ে হাঁটা সাদা পথ/টুকরা জ্যোৎস্নায় মনোরম আলোর স্পর্শে/বিবশ পৃথিবী/। 'রাত্রি শেষ'

৮০ অন্ধকার নেমেছে রাস্তায় / ঘরের অন্ধকার আরও সাংঘাতিক। আলো/জ্বালাবে কে ? ঘরের আবহাওয়া ভুতুড়ে/হয়ে উঠেছে। বাইরে ঘন ঘন বাসের হর্ণ/ শোনা যায়। সৈন্যরা টহল দিচ্ছে। যেন কোন/ যুদ্ধের দেশ/অথবা/ কোন সাম্রাজ্যের শেষ শঙ্খধ্বনি/ বার্ধক্যের বিলাপ/ 'দাংগা'।

বলা বাহুল্য, উপরের আটটি উদ্ধৃতি সোমেনের গল্পাংশ, কবিতার গড়নে সাজিয়ে দিয়েছি। পরীক্ষা করতে চেয়েছি, এদের ভিতর থেকে কবিতার ধারা স্বতঃই উৎসাহিত হয়েছে কি না।

সোমেন 'নাটিকা'-ও লিখেছেন। নাটক দৃশ্য কাব্য বলেই গণ-মনে সরাসরি তার ছায়া পড়ে। এই নাটকের পথই নির্ভীক চেতনা জাগরণের অন্যতম হাতিয়ার। 'বিপ্লব' শীর্ষক নাটিকাতেও সোমেনের কাব্যদৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রকারান্তরে এটিও কাব্যের গা-ঘেঁসা লেখা। একটি সংলাপের ভিতর সেই আভাস :

> কমল, *এবার আগুন জ্বালো/জ্বেলে দাও আগুন* পুরনো বীজের গায়ে/পুরনো বীজ ধ্বংস হোক, *আগুন জ্বালো*/ক্ষণেকের বিলাস আর খেয়ালে/কোটী কোটী মানুষের বঞ্চনায় সঞ্চিত পাপে/কোটী কোটী মানুষের মূক প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠুক/সর্ব্বোচ্চ ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাক্/

কমল তুমি আগুন জ্বালো/আমি ঝড় বইয়ে দিই/
চল আমরা ঝড় বইয়ে দিই।

নাটকের এ বিচ্ছিন্ন অংশ কাব্যগুণে সংক্রামিত। 'এবার আগুন জ্বালো' 'জ্বেলে দাও আগুন' 'তুমি আগুন জ্বালো', এবং 'আমি ঝড় বইয়ে দিই', 'আমরা ঝড় বইয়ে দিই'—ইত্যাদি বাক্য ছত্রে ছত্রে পুনঃপুণিত হয়ে কবিতার আবেগ-স্পন্দ সৃষ্টি করেছে ; আগুন, পুরনো বীজ, আকাশ, ঝড়-সবগুলি শব্দই এখানে কবি ভাবনার প্রতীকী উপকরণ। বিপ্লব শুরু হওয়ার মুহূর্তটিকে সোমেন নিসর্গের আসন্ন বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে দেখেছেন। দৃষ্টি কবির, উপস্থাপনা কবির, অথচ বক্তাবটি নাট্যদর্শকের পক্ষে মোটেই দুরূহ নয়। নাটকের directness এর সঙ্গে কবিতার emotional appeal তাঁর লেখায় মিলে গেল।

সোমেন মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে বস্তি জীবন সংযুক্তিকরণে বিরাট সাফল্যের দাগ কাটেন। গল্পের অবয়বে ব্যবহৃত শব্দ ভাণ্ডার যে কবিতার আত্মা থেকে আহরন করে তাঁর শিল্পী মানসকে প্রকাশ-সমৃদ্ধ করেছিল। আমাদের অনুভূতিতে তাঁর গদ্যধর্মী রচনার স্বতঃস্ফূর্ত কাব্য-আবেগ ঢেউ তোলে। গদ্য হয়েও সে সব রচনা তাই কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত।

॥১॥ : শিশু তপন :

গল্পটিতে সোমেনের কিশোর-মনের স্পর্শ আছে। যৌবনে অনেক স্বপ্নের ভিড়। কিন্তু তা সত্য হয়ে উঠতে বাধা পায়। ফলে কাম্যবস্তু হারাবার দুর্ভাবনাজাত বিদ্রোহ-শক্তি মাথা চাড়া দেয়। যৌবনের জটিল হৃদয়াবেগ তার ধর্মকে স্মরণ করায়। মধ্যবিত্ত সমাজ তাঁর গল্পের বিষয়-বস্তু। দুটি কিশোর-কিশোরী দুটি পৃথক সংসারের। বিপত্নীক অবিনাশের একমাত্র পুত্র তপন আর কামাখ্যার পাণ্ডার মেয়ে বাসন্তী। তীর্থ দর্শনে এসে কিশোর কিশোরীর পরিচয়। তারপর ঘনিষ্ঠতা। এই বয়সে চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই, দুই বিপরীত প্রকৃতি পরস্পরকে টানে।

সহজ মেলামেশার মধ্য দিয়ে এদের মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। খেলার ছলে দুজ'নেই পাহাড়ে ঝর্ণা দেখতে যায়। তপনের সঙ্গে ক্যামেরা।

ফটো তুলবে বলে বাসন্তীর আনন্দ ধরে না। কিন্তু প্রস্তুতি নেবার কালে পশ্চাতে সরতেই বাসন্তী হঠাৎ গভীর খাদে পড়ে যায়। বিয়োগ ব্যথার মধ্যে কাহিনীর নিষ্পত্তি।

গল্পটি বৈচিত্র্যহীন হলেও সোমেনের সাবলীল ভঙ্গী রচনার গতিকে দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে বেঁধে রাখে। রোমান্সের পথে অগ্রসর হতে হতে বিষাদের বিষম খাদে কাহিনী ফুরিয়ে গেলেও সোমেনের লৌকিক প্রেম কবিতার মতো সাংকেতিক মাধুর্যে মৃদু সৌরভ ছড়িয়েছে। উপরন্তু তাঁর গণ-প্রীতিও এই কাহিনীর এক কোণে একবার উঁকিও দিয়ে গেছে :

—"এখানে সব টিনের ঘর কেন, বাবা? খুব গরীব বুঝি ওরা?" এই সামান্য বাক্যটি তুচ্ছ গল্প জুড়ে মানবতাবাদী সোমেনের পরিচয় দিয়েছে। উপলব্ধির গুণে 'শিশু তপন' কাব্যমূল্যে উত্তীর্ণ।

॥২॥ : বনস্পতি :

বড় গল্প, বিষয়বস্তুতে কবিতার মেজাজ। পীরপুর গ্রামের অতীত স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে এক বটগাছ। দশ-বারোখানা গ্রামের মানুষকে ঐ প্রাচীণ বটগাছ পীরপুরের হাট চিনিয়ে দেয়। কিন্তু তার জন্ম রহস্য বড় বিচিত্র। জমিদার নবকিশোর চৌধুরীর তৃতীয় পক্ষের সুন্দরী যুবতী স্ত্রী অরুন্ধতীর সঙ্গে নবকিশোরের একমাত্র পুত্রের অবৈধ মেলামেশার কারণ থেকেই অরুন্ধতীর সকল সাধ চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দেন নবকিশোর তাঁর সাজানো বাগানের এক নির্জন প্রান্তে। —"এবং ইহার কয়েকদিন পরেই দেখা গেল নদীর পারে একটা চমৎকার খোলা জায়গা বাছিয়া সেখানে নবকিশোর দুটি বট অশথের চারা এক সঙ্গে পুঁতিয়া দিলেন, তারপর সেই গাছকে অনেক সিঁদুর মাখাইয়া, নতুন কাপড় পরাইয়া বিরাট সমারোহে পূজা করিলেন।"

অরুন্ধতীর আগেও "অনেক মেয়ে কুমারী অথবা বধূ-জীবনের পরিসমাপ্তি" ঘটিয়েছেন নবকিশোর। সেজন্য কোনদিন তাঁর ভাবান্তর ঘটেনি। এই নির্মম ইতিহাসের সঙ্গে ১৭৫৭-র পলাশীর যুদ্ধ, ছিয়াত্তরের

মন্বন্তর, ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহ, ১৯০৫-র বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন, -এ সবই ঐ বটবৃক্ষের অনুভূতিতে আচ্ছন্ন। অবশেষে ১৯৩৯ সালে, সুদীর্ঘ দু'শ বছরের পর সেই বটবৃক্ষের দৈহিক বিনাস।

এই হল গল্পের সংক্ষেপ। কাহিনীতে কবিত্ব-উচ্ছ্বাস না থাকলেও সোমেনের ইতিহাস চেতনার সঙ্গে সুস্থ জীবনবোধ মানসিক ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়ার বিশ্লেষণ কাব্যানু প্রেরিত। সাময়িক স্থান-কালের সমস্যা সর্বস্ব' এই গল্প নয় সকল স্থানে কালেই তা সামাজিক আবেষ্টনে ঘটতে পারে। সমাজ শুদ্ধির প্রয়োজনেই এই ব্যাধি-নির্মূলন একান্ত অপরিহার্য। সমপ্রাণতা বোধ সোমেনের মানস-লোকে ফুটে ছিল বলেই জীবন সম্পর্কে তাঁর বিপুল জিজ্ঞাসা একটি বটবৃক্ষকে সাক্ষী করে।

সোমেনের মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যার বিশিষ্ট গুণ হৃদয়-ক্ষত থেকেই উদ্ভূত। ফলে ব্যঞ্জনা শক্তির সুস্পষ্ট প্রমাণ কাব্যময় প্রতিবেশে পাঠক মনকে আকর্ষণ করে। এখানেই তাঁর সাফল্য।

॥৩॥ ঃ রাত্রি শেষ ঃ

বৈষ্ণবদের আখড়ার কাহিনী। গান-পাগল রতন বৈরাগী রাধা নাম্নী বৈষ্ণবীর প্রেমাকৃষ্ট। কাম-গন্ধহীন এই প্রেম। অথচ কী দুর্বার তার বন্ধন। বাস্তব জগতে দেহাতীত প্রেম নিবেদনের ঘটনা কুহেলিকাচ্ছন্ন ব্যাপার। কিন্তু 'রতন রাধা' এর ব্যতিক্রম। তারা আত্মসচেতনভাবেই মিশেছে, কিন্তু যোগসূত্রে ভোগ স্পৃহা জাগেনি। রোগ জীর্ণ-রাধার মুমূর্ষকালে রতন উপস্থিত থেকে তাকে গান শোনাতে পারেনি। তাই রাধার মৃত্যুর পর সে তার প্রিয় গান গাওয়ার অভ্যাসটা হঠাৎ-ই বন্ধ করে দেয়। কিন্তু জীবনের আর এক সীমায় এসে 'ললিতা'-র সঙ্গে সম্পর্ক তাকে ফের গান করতে প্রবৃত্তি দেয়। এক ব্যথায় গানের সুর হারিয়ে আর এক ব্যথায় সেই গানেরই প্রাণ খুঁজে পাওয়ার কবিতা যেন —এ লেখা। কাহিনীটি সামান্য তথ্যে বদ্ধ। পাঠকের উপলব্ধির ভূমিতে নতুন দৃষ্টিকোন্ থেকে জীবনের দ্যোতনা কবিতার পদধ্বনি শুনিয়েছে। বিচ্ছেদের অশান্ত আর্তনাদও যে সময়ে সময়ে জীবনের পথে স্নিগ্ধ স্বস্তির

স্পর্শ যোগায়. অন্তর্দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত এই কাব্যকথায় তারই নিঃশব্দ আবির্ভাব। মনস্তত্ত্বের বাঁধা পথে এর মূল্যোদ্ধার সম্ভব নয়, রমনীয় অনুভব থেকেই বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর চরিত্রে কাব্যের লাবণ্য মিশে গেছে।

॥৪॥ : স্বপ্ন :

গল্পে বিয়োগ ব্যথার সুর স্পষ্ট। স্বপ্নে নৌকা ভ্রমণ জীবন হানি ঘটায়। এরূপ বিশ্বাস 'সংস্কার-বদ্ধ। অথচ এই আখ্যায়িকায় সংস্কারের জয় ঘোষিত।

"—হ্যাঁ সামান্য জ্বর হয়ে মারা গেল। নৌকোর স্বপ্ন এমনি খারাপ! কেউ একবার দেখলে তো রক্ষা নেই, বুঝতে হবে. একদিনের মধ্যেই তার ভবলীলা শেষ।"

এই স্বপ্ন কাহিনী শুনে যৌবনরক্তে উচ্ছল শঙ্কর মানসিক দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়।

"শঙ্কর কাঁদিয়া ফেলিল, চোখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া গেল। —নৌকায় সে তো যাইতে চায় নাই. তবু তাহাকে জোর করিয়া উঠাইয়া লইয়াছিল।

চারিদিকে ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা, মাঝে মাঝে কেবল কুকুরের ডাক শোনা যায়। মালার ঘুমটা একটু বেশীই বটে, বেঘোরে ঘুমাইতেছে।"

এ যেন দুর্বলতার কাছে আত্ম সমর্পণ। প্রত্যয় স্তিমিত হলে সামান্য কারণেই মনঃশক্তি বিপন্ন হয়ে পড়ে। এরূপ চিত্তবিকারের করুণ পরিণতি কাব্যের অনুকূল। সোমেনের কবি-প্রকৃতি প্রবল হৃদয়রোগে নাটকীয় ভাবোচ্ছ্বাসে কাব্য উপভোগ করায়। বেদনার সংলাপ ধীরে ধীরে বিয়োগাতুর গার্হস্থ্য জীবনের সত্যকে আশ্চর্য কাব্য সৌরভে ভরায়। এখানেই সোমেনের কবি ব্যক্তিত্বের প্রকাশ।

॥৫॥ ঃ একটি রাত ঃ সুকুমার সাম্যবাদী যুবক। নিজে সুখকাতর নয়। বিধবা মাকে নিয়ে ভাড়াটে বাসায় ছোট্ট সংসার। সেখানে অনেক লোকের

বাস। নানান জনের নানান পেশা। জীবিকা নির্বাহ তাতেই হয়। মাতৃহারা বীনা মদ্যপ পিতার অসংলগ্ন আচরণের মধ্যেই বাড়তে থাকে। সুকুমারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার আগেই বীণা তার জনদরদী মনের পরিচয় পায়। দেশী, কুৎসিৎ কুকুরও সুকুমারের চিত্ত জয় করছে, এ দৃশ্য তার চোখে দেখা।

"বীণা একটা অদ্ভুত মমতা বোধ করল এই কুকুরটার ওপর। সুকুমারের ঘরের দিকে একবার চেয়ে বলল, ভাল লোকের হাতে পড়েছিস্। নিজের শরীরের দিকেই নজর দেওয়ার সময় যার নেই—"

সদ্যস্ফুট প্রণয়াবেগ কিশোরী সুলভ বীণার মনের জগতে স্বপ্নের বাসর-ঘর হয়ে ওঠে। কর্ম জগত ছেড়ে কল্পনার জগতে কিশোর-কিশোরীর আগমনকে সোমেন অনিবার্য করে তোলে। বীণার অবলম্বন প্রয়োজন। পারিবারিক জীবনে সুখ নেই। একদিন হয়তো তা ছায়াবাজির মতো অদৃশ্যেই মিলিয়ে যাবে।

এই গল্প কাহিনী গদ্য হয়েও প্রেম-কবিতার আস্বাদ দেয়। আবার গল্পাংশে শ্লেষের ঝাঁজ সমাজ বৈষম্যের শিরা-স্নায়ুতে তীব্র অবজ্ঞায় যে উত্তপ্ত, মুহূর্তে তা পাঠক মনকে ভাবিয়ে তোলে। এই সংকেত ঘন কাব্য মেজাজ সোমেনের কাহিনীতে স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে। অনিশ্চয়তার অভিশাপ যেন কান্না হয়ে না ঝরে, কবিতার বৃষ্টিধারায় সোমেনের সেই ইচ্ছারই বিদ্যুত্-শাসন।

॥৬॥ ঃ সংকেত ঃ ধর্মঘটী শ্রমিক মজুরের দলে কৃষকদের ভিড় জমলে, মহাজন, মিলের ম্যানেজার প্রভৃতি ব্যক্তির চৈতন্যে কশাঘাত পড়বে। আর এই গণ সংহতি সুদৃঢ় হবার সুযোগ পেলে কর্তৃপক্ষের কৃত্রিম আস্ফালন যেমন নিষ্ক্রিয় হবে এবং অপর ক্ষেত্রে অত্যাচারের মাত্রাও হ্রাস পাবে।

—"বাবু সেলাম গ্রহণ করিলেন এবং মৃদু মৃদু হাসিলেন।"

এটি অহংভাব। সূক্ষ্মার্থদ্যোতক। সোমেনের প্রোলেটারীয় দৃষ্টি ভঙ্গীর মধ্যে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে রূপকার্থে বিপ্লবের সংকেত।

শ্রমিক-মালিকের দুস্তর ব্যবধান থেকে যে মানসিক দ্বন্দ্বের জন্ম, তার আশু অবসান ভিন্ন গণ শ্রেণীর বাঁচার পথ নেই। তাদের সম্ভ্রম, স্বার্থ সবই ঐ মালিক শ্রেণীর মৃদু হাসির জালে। জগতকে নূতনভাবে গড়ার দুর্বার আকাঙ্খা সোমেনকে গণসাহিত্য লিখতে বাধ্য করেছে। রসের নব কাব্যধারায় পুরাতন চিত্র বিলুপ্ত। রক্ত কলুষিত ইতিহাসকে মননে রেখে হিন্দু-মুসলমান ভাইদের সতর্ক হবার সময় সংকেত কাব্যবাক্যে কল্পলোক থেকে আমাদের বাস্তব-ভিটেয় ফিরিয়ে আনে। সোমেনের গণ জীবন বোধ এই গল্পে মনুষ্যত্বের জয়গানে সরব। কাহিনীতে আসন্ন বিপদ-বর্ণনার, ভাষাজ্ঞান তাঁকে শিল্পের উচিত্য সীমানার মধ্যে অবিচল রেখেছে। কবিরূপে এখানে তাঁর বিশিষ্টতা।

॥৭॥ ঃ দাংগা ঃ এই নাম করণের মধ্যে লড়াইয়ের বীজ। এ লড়াই হিন্দু-মুসলমানের। 'সাম্প্রদায়িকতা—বিরোধী মিটিং-এ যোগদান করতে যাচ্ছিল'—গল্পের নায়ক 'অশোক'। তার মনুষ্যত্ব বোধ উদ্বুদ্ধ বিবেকের শক্তিতে ঘোষণা করে ঃ

"আগামী নূতন সভ্যতার যারা বীজ, তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আমি যোগ দিয়েছি, তাদের সুখ দুঃখ আমারও সুখ দুঃখ। আমি যেমন বর্ত্তমানের সৈনিক, আগামী দিনেরও সৈনিক বটে।"

ধর্মের নামে মিথ্যা রক্তপাত, জীবন নাশের বাসনা, ঈর্ষা, কৃতঘ্নতা নীচতা। বিদ্বেষ কলুষিত এই অকারণ উল্লাস দাংগার পথে ধর্মের মাহাত্ম্য নেই। পুরুষানুক্রমিক এই পাপে যে গ্লানি, কোন বিবেকবান মানুষ তা সহ্য করে না। একার শক্তি যত ক্ষীণ হক, অশোক এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকে সৈনিক হয়ে রোধ করতে পণ-বদ্ধ। তার অঙ্গীকারের মধ্যে ভূমিষ্ঠ কাব্যপ্রাণ, আখ্যাণটিকে গতির আবেগ দিয়েছে। বিবৃতিমূলক বাক্যে বাক্যে মানবতাবোধ এবং কর্ত্তব্যবোধ তার মেজাজের সার্বিক পরিচয় দিয়ে দৃশ্যমান কাব্যের রস পান করায়। চেতন মনের অভিজ্ঞতা, তাঁর নিদারুণ মনুষ্য প্রীতির অভিলাষকে নতুন আশ্রয় খুঁজে দেয়। এখানেই কিশোর সোমেন সম্পূর্ণ পৃথক এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর বিশ্বাস

দাংগায় সাধারণ মানুষ হারায় আপন জন আর মুনাফা এসে হাতে ওঠে দাংগাবাজদের, তারা ফ্যাসিস্ট এজেন্ট। এ রাজনীতির মুখরোচক দেয়াল লিখন নয়, সোমেনের বুকের রক্তে রাঙা মর্মবানী।

॥৮॥ ঃ ইঁদুর ঃ সাড়াজাগানো এই গল্পে, সংসারের সাধারণ ঘটনার পশ্চাতে বিপন্ন জীবনের নিঃসংকোচ হাহাকার নির্ভুল ভাবে চিত্রিত। এই সংসারের কাহিনী জুড়ে সোমেনের কাব্যময় আকৃতি সৌন্দর্যলোক দর্শণ করায়। গৃহস্থ জীবনে স্বপ্ন কল্পনা কখনো পক্ষ বিস্তার করে আবার কখনো বাস্তবের মুখোমুখি সংঘর্ষের অভিঘাতে দীপ্তিহীণ হয়ে পড়ে। এ সবই কবিত্বের রসে রূপে মিলিয়েছেন তিনি।

"ইঁদুর মারা কল কিনতে পয়সা লাগবে, এটা আমার জানা ছিল না। মরুভূমিতেও অনেক সময় জল মেলে, কিন্তু এ-মরুভূমিতে জল মিলবে, এমন আশাও করিনে। এই মরুভূমির ইতিহাস আমার অজানা নয়।

.....একটা কুকুর দাঁড়ালো এসে পাশে। উপস্থিত ছেলেদের মধ্যে যারা সাহসী তারা কেউ লাঠি, কেউ বড় বড় ইট নিয়ে বসলো রাস্তার ধারে। ব্যাপার কিছুই নয়, কয়েকটা ইঁদুর ধরা পড়েছে।"

আত্মকেন্দ্রিক মানুষ যে কত নিচে নামতে পারে, সোমেনের কাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের সেই চিত্র বাস্তবের সঙ্গে কাব্য-প্রতীকের জড়োয়ায় মোড়ানো। সংসার জীবনের অসারতা সোমেনকে বিচলিত করেছে। মানুষ সম্পর্কে ধারনার ক্রমবিকাশ তাঁর কৈশোরকালকে জটিলতর করেছে। যে বয়সে কোনো কোনো মুখের স্বতন্ত্র রসে আপ্লুত থাকার কথা, সে স্থলে 'পেটের ভিতর ছুঁচ বিঁধছে প্রচুর'। এই মুমূর্ষু উপলব্ধির আতংঙ্কে প্রেমনীড় গড়া স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করতে হচ্ছে তাঁকে। নাটকীয় উচ্ছ্বাস এই কাহিনীতে কাব্যধর্ম বৃদ্ধি করলেও জীবন সমস্যার কথা গোপন থাকেনি। শিল্পী সোমেনের জীবন নুভূতি রচনার শব্দ-শরে গণপ্রেমের ইঙ্গিতকে স্ফটিক শুভ্র করেছে। এসব এক ঘেয়ে শব্দের শ্লোগান মাত্র নয়, জীবনেরই মহাসংগীত।

বহু আলোচিত এসব গল্প ছাড়াও সোমেনের 'বিপ্লব'—নাটিকা এবং 'বন্যা' উপন্যাস তাঁর অপরিণত বয়সেই গতানুগতিক সাহিত্যের যাত্রাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছিল। পরিণত বয়স পেলে সোমেনের অভিজ্ঞতার সাফল্য যথাযথভাবে প্রমানিত হতো। সে সুযোগ তিনি পাননি। এতৎসত্ত্বেও তাঁর কচিমন সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সাম্রাজ্যে সামাজিক অবক্ষয় শিল্পিত করে নির্ভরযোগ্য তথ্য সন্নিবেশ করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রতিটি রচনায় মধ্যবিত্ত সমাজ সমুদয় সমস্যা নিয়ে উপস্থিত। এখানে সাধারণ মানুষের জীবন-সম্পর্কে ব্যাপক জিজ্ঞাসা। সবার সামনেই বাঁচার প্রশ্ন। ফলে মানবজীবনে কল্যাণের দাবী তাঁর লেখার লাইনে লাইনে ঘটনা সংঘাতে উত্তাল। তাঁর প্রতিবাদী শব্দগুচ্ছ গণ জীবনের সেই ভাষা। তাই শোষণ ও বন্ধন মুক্ত সমাজকে গণতন্ত্রের মূল সত্যের উপর দাঁড় করাবার চিন্তায় সোমেন উদ্বিগ্ন। দুঃস্থ ভাগ্যহতদের জন্য তাঁর অতল যন্ত্রণা মর্মস্থল থেকে জেগেছিল বলেই, মানুষের জন্য রাজনীতি এবং সাহিত্যের দায় তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। প্রগতি বিশ্বাসী লেখক-শিল্পীরা সুস্থ ও সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখেন এবং তা বাস্তব করে তুলতে মন-প্রাণ ঢেলে দেন। কথা শিল্পী সোমেন তাঁর 'রচনা-সমগ্র'-তে কৈশোরক অপরিণতির ছাপ না রেখে একজন সমর্থ লেখকের মতো সেই সীমা অতিক্রম করেছেন।

"সোমেন মার্কসবাদী। এই মার্কসবাদের প্রেরণাতেই সে ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে জন সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নির্ভীকভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। তাকে প্রাণ দিতে হল এই বর্বরতার যূপকাষ্ঠে। সব থেকে শোচনীয় ব্যাপার এই যে সোমেনকে যারা হত্যা করেছে তারা জার্মান, হিটলারীয় বা জাপানী নয়, তারা আমাদেরই দেশের লোক।" ১

সৈনিক কবি সোমের কাব্যভাষার স্রোতোসিক্ত গদ্যে মানবাত্মার মর্মকথা রচনা করেছিলেন। তবে তাঁর কথন ভঙ্গী নিয়ন্ত্রণাধীন বলেই, বক্তব্য মাধুর্য হারায়নি এবং স্বাধীন পথেই বর্ণনীয় চিত্র-চরিত্র আগাগোড়া প্রকাশ নিপুণতার সাক্ষ্য হয়ে আছে সমগ্র রচনায়।

---

১০ দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত/সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সমগ্র/১মখণ্ড পৃঃ ৩৪৩/পৃঃ দ্রঃ

দ্র• মুক্ত কবি-সংঘে ঃ সুকান্ত ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের পর কবিতায় যাঁদের গলায় নতুন চড়া সুর বেজে উঠেছিল তাঁদের অগ্রণী সুকান্ত ভট্টাচার্য। কবিতা পড়ে কবিকে চেনা শক্ত ব্যাপার। কিন্তু সুকান্ত ব্যতিক্রম। এক একটি কবিতায় তাঁর মনোভঙ্গির পরিচয় ফুটে ওঠে বিভিন্ন রঙে, স্বতন্ত্র মেজাজ থেকে। তবে মূলত মানবিক অনুভূতিরই বিশুদ্ধ প্রকাশ সেই কবিতাবলী। সাহিত্যের ধারা বেয়েই সুকান্ত আধুনিক জীবন ভাবুকতার সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে; এ প্রবেশ আকস্মিক নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়, অনিবার্য।

যখন সমাজকে দেখবার বুঝবার বয়স সুকান্তের, তখন দেশ পরাধীন। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষময় পরিনাম থেকেই দ্বিতীয় মহাসমরের তাণ্ডব শুরু হয়েছিল। পৃথিবীকে ভাগ করে নেবার মতো ঘৃণ্য মতলব থেকেই অস্ত্র-সজ্জার আয়োজন। জার্মানি-জাপান-ইতালী একদিকে এবং অপরদিকে বৃটেন-ফ্রান্স-আমেরিকা। এভাবেই শক্তি পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সুযোগের অন্বেষণ।

রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক দেশ। আগ্রাসী অভিসন্ধি তার ছিলনা। শুধু আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তাকে জড়িয়ে পড়তে হয় আদর্শের সংগ্রামে। স্তালিন অকপটে স্বীকার করেন:

যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তাহলে সেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে রূপান্তরিত করতে হবে গৃহযুদ্ধে ধ্বংস করতে হবে ফ্যাসিবাদ, উচ্ছেদ করতে হবে ধনতন্ত্রকে, প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি, দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে উপনিবেশগুলিকে এবং দুনিয়ার প্রথম সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করতে হবে।' ১

কিন্তু ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুঠোয়। জাপানী বোমার আতংকে এবং সাইরেন-দানবের বিকট গর্জনে শহর কলকাতার বুকে অহরহ কাঁপুনি। আর দশ জনের মতো সুকান্তের চোখে তখন ঘুম নেই। 'আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।' সুকান্তও কাঁদেনি, ভাঙেনি, মচকায়নি।

পরাধীন ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দিয়ে গোপাল হালদার বলেছেন:

---

১. পার্থ ঘোষ। কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসের পাতা থেকে। পৃ:৮৫। সেপ্টেম্বর ১৯৭০। প্রকাশক: সুনীল বসু— ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রা: লি: ১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট।
কলিকাতা — ১২

ক) 'অহিংস সত্যাগ্রহ ও সহিংস সংগ্রাম ব্যতীত তৃতীয় একটা ভাবনাও কিশোর ও যুবকদের মধ্যে আসছিল— কিন্তু তখনো তা রূপ ধরতে পারেনি। সে ভাবনার উদ্ভব ১৯১৭-এর অক্টোবর বিপ্লবে। বলা যায়-পৃথিবীর সকল রকম শোষণের অবসান চাই; তত্ত্বটা পরাধীন জাতির ও শোষিত শ্রেনীর সম্বন্ধে সমান প্রযোজ্য।'

খ) 'শ্রমিক-কিষাণরা এদেশে আছে, কিন্তু হিন্দুমুসলমান আছে, ছোট বড় উঁচু-নিচু শত শত জাত ও আছে। তাদের বোঝাতে হবে, তারা জাত নয়, তারা বঞ্চিত শ্রেনী।'

গ) 'শ্রমিক-বিপ্লব, একটা বুলি হয়েছিল কারো কারো ভাবনায়।

তবে বলি না বলে বাষ্পাচ্ছন্ন ভাবনা বা আলেয়াও বলতে পারি। শুনেছি, তখনকার কোনো কোনো ছোট ছোট বিপ্লবী গোষ্ঠীতে এরূপ ভাবনা দেখা দেয়। কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন বলে তাদের নাম হয়।'

ঘ) 'এদেশে তখন কমিউনিজমও যেন দলছাড়া গোষ্ঠীর ও ভেজাল কর্মনীতির একটা খিচুড়ি। অথবা কখনো রাজনীতিক অধ্যায়ের ফুটনোট।'

ঙ) 'কাছে গেলে দেখতাম এদের কমিউনিজমও কাঁচা, অথবা ভেজাল। একটা সাধারণ মিল তাদের মধ্যে ছিল— গান্ধীজীর বিরুদ্ধ কংগ্রেসর বিরুদ্ধ গালমন্দে কেউ কারও থেকে কম যেত না; আর জাতীয় বিপ্লবীদের বিরুদ্ধেও তারা একমত— সে বিপ্লবীরা মধ্যবিত্ত শ্রেনীর স্বার্থের বাহক।'

চ) 'আমি ভাবতাম এঁরা মোটামুটি পথের নিশানা পেয়েছেন, তাই এঁরাই বুঝবেন সে পথে অন্য পথের পথচারীদেরও না আনলেই নয়। তাই সেদিনের কমিউনিস্টদের সঙ্গে পরিচয়ে আমার আগ্রহ ছিল। যদিও বুঝতাম এরা হয়তো আসলে কমিউনিস্ট পার্টির কেউ নয়, এবং যত জন সাম্যবাদের অনুচর তার চেয়েও বেশী আছে তাদের মধ্যে পুলিশের গুপ্তচর।' ১

লক্ষ মানুষের জীবন হরণকারী ঘাতকের সৃষ্ট ইতিহাসে চোখ রেখে সুকান্ত জানায়:

এক' আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়

আমার বিনিদ্ররাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।

(রবীন্দ্রনাথের প্রতি : ছাড়পত্র)

রোমান্টিক কবির মতো এ কবির স্বপ্ন, বসন্ত, বিনিদ্ররাত, রোমাঞ্চ, বিস্ময় সবই আছে ; তবু 'দুর্ভিক্ষের কবি'র কপালে সে-সব মানসিকতা মৃগতৃষ্ণার মতো ছলনার বিষয়। তাই প্রতি ক্ষেত্রেই বিরুদ্ধ দৃশ্যে কবিমনের বিষয় সমাজ-অভিজ্ঞতা তাঁর ভাবনার মোড় ঘুরিয়ে দেয় বিপরীত প্রেক্ষিতে।

সুকান্তের কাব্যরচনার পরিমণ্ডল মানুষের প্রতি নিবিড় ভালবাসা দিয়ে গড়া। পটভূমি হিসেবে সমাজের কুশ্রীতাই কবি-প্রাণে বেশী আঘাতের কারণ। নিচের কবিতাংশগুলো শুধু বেদনার তাপেই উত্তপ্ত নয়, আত্মপ্রত্যয়ও ঘোষিত প্রতিবাদে প্রবল :

দুই/ক. জড় নই, মৃত নই অন্ধকারের খনিজ
আমি তো জীবন প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ:
খ. ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখিরও কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন ॥

(আগামী : ছাড়পত্র)

তিন. পৃথিবীমুক্ত-জনগণ চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়ী।
তোমাদের ঘরে আজো অন্ধকার, চোখে আজো স্বপ্ন।
কিন্তু জানি একদিন সে সকাল আসবেই
যেদিন এই খবর পাবে প্রত্যেকের চোখে মুখে
সকালের আলোয়, ঘাসে ঘাসে, পাতায় পাতায়।
আর্চ তোমরা এখনো ঘুমে ॥

(খবর : ছাড়পত্র)

---

১. গোপাল হালদার। রূপনারায়নের কূলে। ২য় খণ্ড। পৃঃ ৩৪১—৩৪৩। দেবম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭৮প্রকাশকঃ এইচ. এল. সাহা, পুথিপত্র, ৯ এ্যান্টিনি বাগান লেন।
কলিকাতা—৭০০০০৯

বঞ্চনা-শোষণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কিশোর-প্রাণ সংগ্রামী কবি তাঁর ধনুকে টান দিয়েছেন। টঙ্কার তুলেছেন তমোহ সূর্য-শরে। সকালের অমল আলোয় জীবনের গ্লানি ঘুচিয়ে দেওয়ার জয়ভেরী সুকান্তের কণ্ঠস্বরে। ঋষির শাপে পুরাণের পাষানী অহল্যা তার বন্ধাত্ব-মুক্তির শেষে মাতৃত্বের স্বাদ লাভ করে। সাবধানী কবি এদেশেও সেই শুভবার্তা বয়ে আনেন। শোনান হিংস্র মানবিকতা রোধ করতে জনকল্যাণের বিনিময়ে রক্তদানের দুঃসাহসী জয়গান। শুধু স্বার্থক্লিষ্ট ভারতবর্ষে নয়, সারা বিশ্বে সংক্রামিত হক সেই সজাগ যন্ত্রণা। তবেই ভূমিষ্ঠ হবে সৃষ্টি মুখী সচেতনতা। গণসংস্রব থেকেই লোক কবির তীক্ষ্ণ বিশ্বাস ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্দ্ধারণে বিদ্রোহী চেতনাকে জাগ্রত করবে: ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার স্থূল ক্রূরতার বিরুদ্ধে সুকান্তের হুঁশিয়ারী:

চার কলম! বিদ্রোহ আজ, ধর্মঘট হোক অবশেষে;
আর কালো কালি নয়, রক্তে আজ ইতিহাস লিখে
দেওয়ালে দেওয়ালে এঁটে, হে কলম,
আনো দিকে দিকে॥
(কলম: ছাড়পত্র)

পাঁচ/ক. রুটি দেবে নাকো? দেবে না অন্ন?
এ লড়াইয়ে তুমি নও প্রসন্ন?
চোখ-রাঙানিকে করি না গণ্য
ধারিনা ধার।
খ. দেখব, ওপরে আছো আছে কারা,
খসাব আঘাতে আকাশে তারা,
সারা দুনিয়াকে দেব শেষ নাড়া
ছড়াব ধান।
জানি রক্তের পেছনে ডাকবে সুখের বান।
(বিদ্রোহের গান: ঘুম নেই)

ছয়. ভারতবর্ষ, তন্দ্রা ক্রমশ ক্ষয়
অহল্যা! আজ শাপ মোচনের দিন;
তুষার—জনতা বুঝি জাগ্রত হয়—
গা—ঝাড়া দেবার প্রস্তাব দ্বিধাহীন।
(সূচনা: ঘুম নেই)

স্বদেশ বসুর বক্তব্য প্রগতিপন্থী লেখকদের অনুধাবনযোগ্য :

'সাহিত্যিককে আজকে সর্ব প্রথম বিপ্লবে সামিল হতে হবে, কারণ বিপ্লব ছাড়া এবং বিপ্লবী মানুষ ছাড়া এখন আর কোনো কিছুই সৃষ্টি করা অসম্ভব ; এবং এই সঙ্গেই তাদের নিজস্ব মান অনুযায়ী শিল্পসৃষ্টি করে যেতে হবে। বিপ্লবে সামিল হলে তাদের সর্ব প্রথম কাজ হবে শ্রমিক—কৃষকের জীবনকে জানা এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেকটি মুহূর্ত কাজ করে তাদের শিক্ষার মানকে উঁচু করা। এই প্রয়োজনে যে-ধরনের কাজ সবচেয়ে বেশি কার্যকরী তাঁদের তা করতে হবে এবং শ্রমিক-কৃষকদের বিপ্লবের কাজ এগিয়ে নিতে হবে।' ১

সমাজ সচেতক আমেরিকান কবি ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান তাঁর জীবনব্যাপী যে দুঃসাহসিক স্বপ্ন দেখেছেন, তা জীবন দর্শন জাত পৃথিবীর সকল জীবনাগ্রহী কবির হৃদয়—সংবাদ। তিনি স্বদেশ প্রেমিক, ইতিহাসবাদী কবি। মানবপ্রেম তাঁর নিস্তরঙ্গ আবেগের তলায় চাপা পড়েনি, অনুভূতির প্রবল তাড়নায় তা দ্বন্দ্বরক্তিম মননে সঞ্জীবিত। আবেগ, উচ্ছ্বাস শব্দ বাহিত হয়েও কবির অসাধারণ সাহিত্য-কর্মকে কল্পনা কেন্দ্রিক জটিল গ্রন্থিলতায় না বেঁধে জীবন—চর্চার অনিবার্য আবেদনে অন্তরঙ্গ করেছে। এতে কাব্যত্ব ঘুচে যায়নি বরং শব্দানুষঙ্গেই তা সর্বকালীন। মানুষের নিত্যবেদনাকে সংহত চিন্তা দিয়ে কী জীবন ঘনিষ্ঠ করেছেন তারই সকল প্রকাশ 'Leaves of Grass'- কাব্যে :

* a. STILL though the one I sing,
(one, yet of contradictions made,) I dedicate to Natiouality, I leave in him revolt, (O latent right of insurection ! O quenchless, in dispensable fire !)
→ (page 11 ; Still|though the one I sing)

** b. The law of the past can not be eluded,
The law of the present and future can not be eluded,
The law of the living can not be eluded, it is eternal,
The law of promotion and transformation can not be elnded,
The law of heroes and good-doers can not be eluded

The law of drunkards, informers, mean persons,
not one iota there of can be eluded. → (page
342 : To think of Time)

*** c. I am the poet of the Body and Iam the poet of
the Soul,
The pleasures of heaven are with me and the
pains of hell are with me
The first I graft and increase upon myself, the
latter I translate into a new tongue.
I am the poet of the woman the same as the man,
And I say it is as great to be a woman as to be
a man,
And I say there is nothing greater than the mo-
ther of men,
.... you will hardly Know who Iam or what I mean,
But I shall be good health to you nevertheless,
And filter and fibre your blood.
Failing to fetch me at first keep encouraged,
Missing me one place Search another,
I stop somewhere waiting for you. → (page-40-75)
(Song of myself)

**** d. BE composed-be at ease mith me-I am walt whit-
man, liberal and lusty as Nature,
Not till the Sun excludes you do I exclude you,
Not till the waters refuse to glisten for you and
the leaves to rustle
for you, do my words refuse to glisten and
rustle for you.

---

১. ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত। মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক (২য় খণ্ড)। (প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা : স্বদেশ বসু)। পৃ: ১৬। ১ম প্রকাশ চৈত্র ১৩৮২, মার্চ ১৯৭৬ প্রকাশক : গীতা দাশ—নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, ৩০ রামকৃষ্ণ সমাধি রোড। ব্লক-'ক্ষ', ফ্ল্যাট-১৮, কলিকাতা—৫৪

My girl I appoint with you an appointment and I charge you that you make preparation to be wonthy to meet me,
And I charge you that you be patient and perfect till I come.
Till then I salute you with a significant look that you do not forget me. — (page-305 : To a common prostitute)

অপাঙ্‌ক্তেয় নারীজাতির প্রতি গভীর আন্তরিকতা ও বিপুল সাহসের পরিচয় দিয়ে উদ্ধৃতাংশে কবি হুইট্‌ম্যান পতিতপাবন সৃষ্টিকর্ত্তার মতো বল-দৃপ্ত এবং বন্ধন-মুক্ত মানবপ্রেমিক রূপে চিহ্নিত হয়েছেন। পতিতা নারীর ভালোবাসা অশ্রদ্ধা বা ঘৃণার নয়। পাপীর পাপ কর্মকে প্রকৃতির মতো সবল বক্ষে মর্যাদার সঙ্গে স্থান করে দিতে কবির হৃদয়ে অঢেল স্থান ছিল। তাই কবি মনে কলঙ্কিনীর দুঃখ ভাগ করে নেবার ইচ্ছা। তাঁর বিশ্বাস, প্রকৃতি ও মানুষে মিলেই এই অখণ্ড বিশ্ব। সংকীর্ণতার উর্দ্ধে থেকে কবি সর্বজনীনতার জয় গান শোনান:

***** e. Lo, Soul, seest thou not God's purpose from the First ?
The earth to be spann'd, Connected by network
The races, neighbors, to marry and given in marriage,
The ocean to be Cross'd, the distant brought near,
The lands to be welded together. → (page 322: passage to India)

****** f. OF Equality-as if it harm'd me, giving others the same chances
and rights as myself-as if it were not indispensable to my
own rights that others dossess the same.

উদার-চেতা কবি প্রাণের পূর্ণ বিকাশের আনন্দে গণজীবনকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

২৬৪

এই আনন্দলোক ভোগেরসংসার। আনন্দের সে বিচিত্র প্রকাশই মানুষের দুঃসাহস যোগাবে। মানব দরদী কবির শক্তিময় উপলব্ধির প্রকাশ :

******* g. BEAT ! beat ! drums ! — blow ! bugles ! blow !
Through the windows-through doors—burst like a ruthless force,
Into the solemn church, and scatter the congregation,
Into the school where the scholar is studing,
Leave not the bridegrom quiet-no happiness must he have now with his bride,
Nor the peaceful farmer any peace, ploughing his field or gathering his grain,
So fierce you whirr and pound you drums —So shrill you bugles blow.

কিন্তু সুকান্তের সংগ্রামী কবিচেতনায় সেই নির্ভাবনায় স্থান নগণ্য। তিনি নিপীড়িত গণজীবনে শোষণের যে নগ্নরূপ দর্শন করেছেন সেখানে লড়াইয়ে মুখোমুখি হওয়া ছাড়া শোষক—শোষিতের সম্পর্ক নেই। তাই তাঁর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার উপায় নেই। তিনি মনে করেন, জীবন্ত প্রাণের মিছিল একদিন তাদের সুদিনকে ছিনিয়ে আনবেই। মেহনতী মানুষের এই অক্লান্ত শ্রম নিরন্ন জীবনে ভাষা ফোটাবে। কবির গণমুখী শুভেচ্ছা বানী :

সাত. এবার লোকের ঘরে ঘরে যাবে
সোনালি নয়কো, রক্তে রঙিন ধান
দেখবে সকল সেখানে জ্বলছে
দাউ দাউ করে বাংলা দেশের প্রাণ ॥
(দুর্মর : পূর্বাভাস)

---

a+b+c+d+e+f. Walt whitman | Leaves of Grass | 1962
Eurasia Publishing House (P) LTD
Ravindra Mansions, Ramnagar, New Delhi- 1

পরাধীনতার অন্ধকার দূর করার স্বপ্ন নিয়ে জনগণ নিশিদিন যে সংগ্রামকে অবলম্বন করে বন্দী-মানবের মুক্তি অন্বেষণে নেমেছে, তা ব্যর্থ হবার নয়। স্বাধীনতার অপরাজেয় শক্তি মানুষের সন্দেহ, যন্ত্রণায় অবসান ঘটাবে।

সুকান্ত বস্তু জগতের মাল মশলা আর নিজের কৈশোরিক প্রেরণা দিয়ে কবিতা গড়েছেন রোম্যান্টিক—প্রাসাদের মুখোমুখি করে। তাঁর কবিতা, তাই, রোমান্টিকতার বিপরীত হয়েও নিকট। শাসন ব্যবস্থা মানুষের মনে বিষ ঢেলেছে। তরুণের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরে দৃপ্ত সুকান্ত অবিরল জীবনানুরাগ ঢেলেছেন জন-মনে। এই সত্যসন্ধানী বাসনা থেকে জীবন্ত হয় বিদ্রোহ। আর এই বিদ্রোহ দেওয়াল লিখনের মধ্য দিয়ে একদিন ধর্মঘট নামক চূড়ান্ত ইচ্ছার রূপ নেয়। অন্নহীন মানুষ রুটির দাবিতে ধীরেধীরে সারি বাঁধে লড়াইয়ের ময়দানে।

সুকান্তের জীবনের শেষদিকে রাষ্ট্রে ও সমাজে ভাঙা গড়ার তাণ্ডব চলছিল। দুটো বেদনাদায়ক বিশ্বযুদ্ধের নির্মমতা কবি-ভাবনায় ইতিহাসের বোধ জাগিয়েছিল। কবিতার স্তবকে স্তবকে তারই প্রতিধ্বনি :

আট/ক. ক্ষুধার্ত বাতাসে শুনি এখানে নিভৃত এক নাম
চট্টগ্রাম : বীর চট্টগ্রাম।

খ. তোমার প্রতিজ্ঞা তাই আমার প্রতিজ্ঞা, চট্টগ্রাম।
আমার হৃদপিণ্ডে আজ তারি লাল স্বাক্ষর দিলাম ॥

(চট্টগ্রাম/১৯৪৩ : ছাড়পত্র)

শোষিত জনগণের অগ্রগমনের ইতিহাস কালিমালিপ্ত। তবু লড়াইয়ে সামিল নিপীড়িত গণজীবন। বিশাল চেতনা নিয়ে সুকান্তের কবিতা মৃত্যুঞ্জয়ী আশার প্রেরণা যোগায়, বিপদের ঝুঁকি নিতে শেখায় :

নয়/ক. মূর্খ তোমরা
লাইন দিলে : কিন্তু মুক্তির বদলে কিনলে মৃত্যু,
রক্ত ক্ষয়ের বদলে পেলে প্রবঞ্চনা।

খ. লাইনে দাঁড়ান আরম্ভ করেছে যারা,
সোভিয়েট, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স
রক্ত মূল্যে তারা কিনে নিয়ে গেলে তাদের মুক্তি
সব প্রথম এই পৃথিবীর দোকান থেকে।

খ. আমি ইতিহাস, আমার কথাটা একবার ভেবে দেখো
মনে রেখো, দেরি হয়ে গেছে অনেক অকেন দেরি।
(ঐতিহাসিক : ছাড়পত্র)

সমাজের সুস্থতা ফিরিয়ে আনার বাসনা সুকান্তের। বৈষম্য সংহতির প্রাণহন্তা। কঠোর আঘাতে অন্যায়ের অবাধ বিস্তার রুদ্ধ করার নিরন্তর প্রয়াসকে কবিতায় চিত্রায়িত করেছেন তিনি। আত্মাভিমান সুকান্তকে সংযত রাখতে পারেনি। ভবিষ্যতের নির্দেশ :

দশ. টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ো তোমার
অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।
শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।
(বোধন : ছাড়পত্র)

এগারো. কর্ষিত মাটির পথে পথে
নতুন সভ্যতা গড়ে পথ।
(কৃষকের গান : ছাড়পত্র)

বারো: আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাস
এবারের মতো মুছে যাক ইতিহাসে।
(সেপ্টেম্বর' ৪৬ : ছাড়পত্র)

তেরো. সামনে ধূম উদ্গীরণ রত কামান,
পেছনে খাদ্যশস্য আঁকড়ে-ধরা-জনতা-
কামানের ধোঁয়ার আড়ালে দেখলাম
মানুষ।
(কনভয় : ছাড়পত্র)

চোদ্দ/ক. লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ।
আজকেও রুশিয়ার গ্রামে ও নগরে
হাজার লেনিন যুদ্ধ করে,
মুক্তির সীমান্ত ঘিরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে।

খ. লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আসিই লেনিন ॥

(লেনিন : ছাড়পত্র)

পনেরো. হাজার বছর ধরে দাসত্ব বেঁধেছে বাসা রোমের দেউলে
দিয়েছে অনেক রক্ত রোমের শ্রমিক —
তাদের শক্তির হাওয়া মুক্তির দুয়ার দিল খুলে
আজকে রক্তাক্ত পথ ; উদ্ভাসিত দিক।

(রোম/১৯৪৩ : ঘুম নেই)

ষোলো. আমরা সবাই প্রস্তুত আজ, ভীরু পলাতক ;
লুপ্ত অধুনা এদেশে তোমার গুপ্তঘাতক
হাজার জীবন বিকশিত রক্ত ফুলে,
পথে-প্রান্তরে নতুন স্বপ্ন উঠেছে দুলে।

(বিভীষণের প্রতি : পূর্বাভাস)

সতেরো/ক. তৈরী আমরা ; যুগোস্লাভের প্রতিটি ঘরে
তুমি আছ জানি বন্ধু তিতো।

খ. ক্ষিপ্ত করেছে তোমার সে ডাক আমাকেও যে
তাইতো তোমার পেছনে আমি ॥

(মার্শল তিতোর প্রতি : অপ্রচলিত রচনা)

সুকান্তের তৃষাতুর-মন ইতিহাসে নিমজ্জিত। প্রেরণার সেই পরিপূর্ণ ভাণ্ডার থেকে কবির প্রখর কাল-জ্ঞান। মানুষের যন্ত্রণার উৎস থেকে তিনি সংগ্রহ করেন পরবর্তী কার্যক্রমের সূচীপত্র। কবির গণ-সংযোগ মানুষের সংঘবদ্ধ আন্দোলনকে নিয়মের রাস্তায় অগ্রসর করার হাতিয়ার। মহামারী, মন্বন্তর তদুপরি সাম্রাজ্য লোভীর শোষণ নির্যাতন থেকে গণ জীবনকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেবার বাসনায় কবি-মন কাতর। মনুষ্য প্রীতির ফুরফুরে হাওয়ায় উড়ুনি দুলিয়ে সাম্যবাদী কবির কর্ম নিঃশেষ হয়ে যায় না। চেতনার মধ্যে সর্বসাধারণের প্রবেশের পথ করে দেওয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ কথা। সুকান্তের কবিতার আত্মায় গণ জীবনের সেই ক্রমোন্নতির সম্ভাবনা ও বিশ্বাস :

আঠারো. হে সূর্য
তুমি আমাদের সাঁতে সেঁত ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও

আর উত্তাপ দিও
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
(প্রার্থী : ছাড়পত্র)

সূর্য পূজারী কবিরও প্রার্থনা মানবিক। সাম্যবাদী আন্দোলনের নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মী—কবির এই চাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কর্ম ও কবিতার একাত্মতা আরও গাঢ় এবং অসামান্য হয়ে উঠেছে সুকান্তের বিখ্যাত 'রানার'-কবিতায় :

উনিশ. রানার! রানার। ভোর তো হয়েছে আকাশ হয়েছে লাল,
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল?
রানার! গ্রামের রানার!
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার।
(রানার : ছাড়পত্র)

গণজীবনের নগণ্য স্তর থেকে 'রানার' আসবে সমাজের বিভাসক সংবাদ নিয়ে, 'বাতিওয়ালা' নতুন আলো জ্বালাবে সুস্থ সংঘবদ্ধ প্রাণে—কবির এ প্রত্যয় অভিনব অগ্র দূতের দুটি অ-দেখা মুখ উন্মোচিত করে দিয়েছে জীবন রসিক কবিতা পাঠকের সামনে। সুকান্তের নির্মল বিশ্বাস এই 'নতুন খবর' যন্ত্রণাময় জীবনের দ্বারে এক বহু প্রত্যাশিত প্রভাত। দুঃখের অন্ধকার-রাত্রি মাত্র অবসান হবে না। যুগযুগান্তের অভিশাপ মুক্ত হবে গোটা মনুষ্য-সংসার।

কুড়ি: আমি যেন সেই বাতিওয়ালা
যে সন্ধ্যায় রাজপথে-পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে
অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালার সামর্থ্য
নিজের ঘরেই জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার॥
(প্রিয়তমাসু : ঘুম নেই)

অন্য কবিতায় এই একই ভাবনা পুনঃ সঞ্চার হয়ে মানুষের জন্ম-স্বত্ব রক্ষায় দুর্নিবার :

একুশ. পৃথিবীকে চেয়ে দেখ, প্রশ্নে ও সংশয়ে ভরো ভরো
তোমার মুক্তির সঙ্গে বিশ্বের মুক্তিকে যোগ কর।
(মেজদাকে/মুক্তির অভিনন্দন : অপ্রচলিত রচনা)

বাইশ. মহাজন ওরা, আমরা ওদের চিনি
হে ঘাতক নির্বোধ
রক্ত দিয়ে সব ঋণ করো শোধ!
(মুক্ত বীরদের প্রতি : ঘুম নেই)

মার্ক্সবাদী ভাগ্যনির্ভর নয়। তাঁরা সৃজনশীল কর্মের মধ্যে দিয়ে, প্রতিশ্রুতি পালনে তৎপর।

"মার্ক্সবাদী—লেনিনবাদী সাহিত্য বিচারের মূলসূত্র : সাহিত্য হইতেছে সামাজিক বাস্তবের প্রতিফলন। সমাজের স্তরে স্তরে শ্রেণী সংঘর্ষের প্রভাবে নিত্য সে আলোড়ন চলিতেছে, বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিভিন্ন ভাবে তাহাতে সাড়া দেয়। এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া নির্ধারিত হয় সমাজের বিন্যাস কিভাবে পরিবর্তিত হইবে ও সমাজের গতি হইবে কোন্ দিকে। সাহিত্য এই শ্রেণী চেতনা হইতে সৃষ্ট হইয়া সামাজিক পরিবেশের উপর প্রতিঘাত করে। মার্ক্সীয় মতে ফিউডাল হইতে বুর্জোয়া ও তাহা হইতে সমাজবাদ এই অভিমুখে পরিবর্তন ঘটাই সামাজিক প্রগতির লক্ষণ।" ১

আর একটা উল্লেখযোগ্য মন্তব্য :

"জীবন ও সাহিত্যকে বাঁচাতে হলে ধনতন্ত্রের শ্বাসরোধকারী প্রাকারকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে, মানুষকে তার ব্যক্তি স্বরূপ উপলব্ধি করবার অবকাশ দিতে হবে। মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থবাদ থেকে যে সমাজ কাঠামোর সৃষ্টি হয়েছে তাকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, এবং সেই সমাজ কাঠামোর সৃষ্টিকর্তা হবে নিপীড়িত জনসাধারণ। কিন্তু এই জনসাধারণেরও বিশেষ চেহারা বিশেষ চরিত্র আছে। ধনতন্ত্র তার আত্যন্তিক প্রয়োজনে যে শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে তারাই হবে নতুন সমাজ-বিপ্লবের উদ্যোক্তা। তাদের সাহচর্য দেবে কৃষকও মধ্যবিত্ত। যেহেতু মানুষকে মুক্তি দেবার জন্যে সবার আগে প্রয়োজন ধনতন্ত্রকে চূর্ণ করা এবং যে-কারণে মুক্ত স্বচ্ছন্দ জীবন ছাড়া সাহিত্য-শিল্পের সৃষ্টি হতে পারে না; সেইজন্য আজকে আর অতীত যুগের মতো অচেতন ভাবে সাহিত্য জীবনের প্রতিফলন হবে না, সচেতন ভাবে সাহিত্য সমাজ-বিপ্লবের কাজে লাগাতে হবে।" ২

---

১. নীরেন্দ্রনাথ রায়। সাহিত্য বীক্ষা। পৃ: ১২৩ প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ১৯৮৩। প: ব: রাজ্য পুস্তক পর্ষদ (প: ব: সরকারের একটি সংস্থা) আর্যমানসন (নবম তল) ৬, এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলি—৭০০০১৩

২. ধনঞ্জয় দাশ। মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক। ২য় খণ্ড। পৃ: ৩। দ্রষ্ট

সেই অনুভবে গড়া সুকান্তের বিপ্লবী মানসিকতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুঃসময়ে সুকান্ত মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট এবং সেই সুবাদে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদিয়ে গণজীবনের প্রতিনিধিরূপে মুক্তি সংগ্রামে ব্রতী। মন্বন্তর, মহা-যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যেই তাঁর মানস—যাত্রা।

'মিল—মালিক' 'মজুতদার' ও শাসক গোষ্ঠীর নির্মম কর্মোদ্যোগকে তিনি শুধু ঘৃণাই করেননি, গণ-অভ্যুত্থানকে ত্বরান্বিত করতে নবজাতকের উদ্দেশে গেয়েছেন :

তেইশ. অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তের নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্ব্বাদ।
তার পর হব ইতিহাস।
(ছাড়পত্র : ছাড়পত্র)

সুকান্ত হয়তো জানতেন নিরক্ষর শ্রমিক-কৃষকরা তাঁর কবিতার রস আস্বাদনে অপারগ। এ প্রশ্ন তাঁর মনে নিশ্চয়ই যন্ত্রণা সৃষ্টি করেছে। তাই নির্যাতিত গণশ্রেনীর সে অপূর্ণ সাধ মিটাতে তিনি 'নতুন শিশু'-কে আশীর্ব্বাদ করে যান।

তবে সাম্যকামী মানুষের পাশে সংগ্রামী কবির মানসিকতা ভিন্ন সুকান্তের কবিতায় কিন্তু অন্য কোন সুর স্পষ্টত নেই। কবি আরও প্রকাশোজ্জ্বল হয়ে ওঠেন তাঁর এই বিশেষ কবিতায় :

চব্বিশ. রক্তে আনো লাল
রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।
উদ্ধত প্রাণের বেগে উন্মুখর আমার এদেশ,
আর বিধ্বস্ত প্রাণের দৃঢ়তায় এসেছে নির্দেশ।
(বিবৃতি : ছাড়পত্র)

সুকান্তের আত্মপ্রত্যয় তাঁর শিল্প-কর্ম জুড়ে, কবিতার মর্মলোকে উজ্জীবিত। সেই জীবন দৃষ্টির প্রতিফলন আন্তরিক। সুকান্তের আবির্ভাব বহুতর সমস্যার মধ্যে। দেশের সংকটকাল তখন। বয়োবৃদ্ধির পর রাজনীতির কর্মসূচি হাতে নিয়ে তিনি দেখেছেন :

পঁচিশ. দুর্বল পৃথিবী কাঁদে জটিল বিকারে,
মৃত্যুহীন ধমনীর জলন্ত প্রলাপ ;

অবরুদ্ধ বক্ষে তার উন্মাদ তড়িৎ :
নিত্য দেখে বিভীষিকা পূর্ব অভিশাপ।
(নিবৃত্তির পূর্বে : পূর্বাভাস)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথায় আরও নিঃসন্দেহ হওয়া যায় :

"সুকান্ত রাজনীতির কাঁধে চড়েনি। রাজনীতিকে নিজের করে নিয়েছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনও সুকান্তকে দিয়েছে তাই সানন্দ স্বীকৃতি, নিজেকে নিঃশর্তে জীবনের হাতে সঁপে দেওয়াতেই স্বতোৎসারিত হতে পেরেছিল সুকান্তের কবিতা। আজ যাঁরা সুকান্তের কবি প্রতিভাকে এই বলে উড়িয়ে দিতে চান যে, সুকান্তের কবিতায় শ্লোগান ছিল—তাঁদের বলতে চাই সুকান্তের কবিতায় শ্লোগান নিশ্চয়ই ছিল। কবিতার জাত যাবার ভয়ে শ্লোগানগুলোকে রেখে ঢেকেও সে ব্যবহার করেনি। হাজার হাজার কণ্ঠ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত যে ভাষা হাজার হাজার মানুষের নানা আবেগের তরঙ্গ তুলেছে, তাকে কবিতায় সাদরে গ্রহণ করতে পেরেছিল বলেই সুকান্ত সার্থক কবি।

কবিতায় রাজনীতি থাকলেই যাঁদের কাছে মহাভারত অশুদ্ধ যায়, তাঁরা ভুলে যান — অরাজনৈতিক কবিতায় ও জিগির কিছু কম নেই।" ১

সাহিত্যকে রাজনীতির দরবারে নেমে আসতে ইতিহাস বাধ্য করায়। সেই অতীতের সাক্ষী :

* ক) বর্বর ও সভ্যযুগের শেষ ও উন্মেষকাল (Heroic-Age) ;
খ) সভ্যতার বিশুদ্ধকাল (Classical-Age) ;
গ) সামন্ত-তন্ত্রীয়কাল (Feudal-Age) ;

এই শেষোক্ত যুগের পর বুর্জোয়া বা ধনিকশ্রেনী, বুর্জোয়া-ডেমোক্রাটিক যুগের পত্তন করে থাকে। ফলে 'মহাজনী সভ্যতার,-প্রসারণের মধ্যে 'মধ্যবিত্ত শ্রেনী'র সৃষ্টি সম্ভব হওয়ায় বিপ্লবোত্তর ফরাসী এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্যে তৎকালীন সমাজচিত্র ভাসতে থাকে। এর পরেই প্রোলেটারীয় (শ্রমজীবী শ্রেনী সমূহ) দৃষ্টি ভঙ্গী সাহিত্যে নতুন আলো বিকিরণ করে। তবে রুশ-সাহিত্যে তার প্রতিফলন অধিক মাত্রায়। এই সাহিত্য বহুজনের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে গড়া।

---

১. সুকান্ত-সমগ্র। ভূমিকা : সুভাষ মুখোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ : ৩১শে শ্রাবণ ১৩৭৪। প্রকাশক : সারস্বত লাইব্রেরী, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, ২০৬ বিধান-সরনি—কলিকাতা—৬

* মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক। ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত। পৃ: ১৬ | ৩য় খণ্ড | দ্রষ্টব্য

ভারতে গণজীবন অন্ধকারে আবদ্ধ ছিল। গোলামদের প্রভুভক্তির ইনাম জুগিয়ে, শাসক জাত বারংবার তাঁদের কৌশলকে সফল করেছিল। ক্ষয়শীল সাহিত্য (Decadent Literaure) যা সামন্ততন্ত্রীয় যুগের (Feudal-Age) সম্পদ, তাতে মন ভরে না বরং মনুষ্যত্বের পীড়ন ঘৃণার সঞ্চার করে। সামাজপটের পরিবর্ত্তন থেকে সাহিত্যেরও রূপ পাল্টাতে থাকে।

পরাধীন দেশের মানুষের জীবন রাজনীতি অপরিহার্য। যাঁদের তা স্পর্শ কিংবা আকৃষ্ট করতে পারেনি, ঘটনা হিসাবে নিতান্তই তা দুর্ভাগ্যজনক। সাম্যবাদীদের অবশ্যম্ভাবিতা, রাতারাতি নয়, সামাজিক চেতনার প্রভাবেই বৃদ্ধিশীল। ফলে নতুন সাহিত্য লেখার উদ্যম নির্জলা সত্য হয়ে ওঠে তবে চল্লিশের দশকে দাঁড়িয়ে কেউ গণ-সংযোগ-বিচ্ছিন্ন থাকতে চায়নি। কিন্তু গণবিপ্লবের ভূমি তৈরী, সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রস্তুতি দরকার। সে কারণেই গণমানসের উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে একটা আচ্ছন্ন পারিপার্শ্বিকতার জাল-ছেঁড়ার অর্থপূর্ণ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। গণজীবনের বিপুল উল্লাস চীন, ব্রহ্মত, মালয় অতিক্রম করে ভাররে। মাটিতেই ভেটে পড়েনি, ইউরোপেও উত্থিত হয়েছিল।

সুকান্ত রক্ত মাংসের মানুষ। সুতরাং চারপাশের পরিবেশ, পরিস্থিতির তরঙ্গাঘাত থেকে মুক্ত থাকা তাঁর পক্ষে কেন, সবার ক্ষেত্রেই একটা বিরাট বাধা। তৎসত্ত্বেও একাধারে নিষ্ঠাবান কর্মী এবং কবি হয়ে উঠতে পেরেছেন তিনি।

ক) পথ-নির্দেশক এবং খ) কবিরূপে তাঁর সত্তার বিভাজন :

ক. নিবিড় জন-সংযোগ থেকেই গণজীবন-মুখী সাধনায় সুকান্তের যুক্তিগ্রাহ্যমন তৈরী হয়ে উঠেছিল। অনুভূমি এবং অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে তাঁর কবিতা সমাজ জীবনে পথ নির্দেশের দিশারী হয়েছিল। ইতিহাস পাঠ করে তাঁর তাৎক্ষণিক অনুভব বঞ্চিত মানুষের কান্নায় অধীর। সে কারণেই কবি সর্বজনীন মুক্তির নেশায় কবিতার রাজ্যে
এক নতুন অধ্যায় সংযোগ করেন। 'বিবৃতি', 'বোধন', 'চট্টগ্রাম', 'মনিপুর', 'রোম,' ১৯৪৩ '১৯৪১ সাল,' 'মীমাংসা,' মুক্তবীরদের প্রতি,' দিন বদলের পালা,' একুশে নভেম্বর ১৯৪৬,' 'আমরা এসেছি,' 'বিদ্রোহের গান,' ',লা মের কবিতা' ৪৬, প্রভৃতি কবিতায় রাজনৈতিক মুক্তি চেতনার সেই সজাগ প্রতিফলন :

১/ অভুক্ত কৃষক আজ সূচীমুখ লাঙলের মুখে
নির্ভয়ে রচনা করে জঙ্গী কাব্য ধমাটির বুকে : — (বিবৃতি : ছাড়পত্র)

২/ শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে

একত্রিত হোক আমাদের সংহতি। — (বোধন : ঐ)

৩/ তোমার প্রতিজ্ঞা তাই আমার প্রতিজ্ঞা চট্টগ্রাম।
আমার হৃদপিণ্ডে আজ তারি লাল স্বাক্ষর দিলাম ॥ - (চট্টগ্রাম ১৯৪৩ : ঐ)

৪/ এদেশে কৃষক আছে, এদেশে মজুর আছে জানি,
এদেশে বিপ্লবী আছে জনরাজ্য মুক্তির সন্ধানী ॥ - (মণিপুর : ঘুম নেই)

৫/ শিল্প আর মজুরের বহু পরিশ্রম
একদিন গড়েছিল রোম, — (রোম ১৯৪৩ : ঐ)

৬/ তাই রক্তাক্ত পৃথিবীর ডাকঘর থেকে
ডাক এল —
সভ্যতার ডাক। — (১৯৪১ সাল : ঐ)

৭/ তাই আমি যেতে চাই সেখানেই যেখানে পীড়ন,
যেখানে ঝল্‌সে উঠবে আমার অসির কিরণ। — (মীমাংসা : ঐ)

৮/ আবার জ্বালাব বাতি
হাজার সেলাম তাই নাও আজ, শেষ যুদ্ধের সাথী ॥ - (মুক্তবীরদের প্রতি : ঐ)

৯/ বুঝেছি সবাই আমরা আমাদের কী দুঃখ নিঃসীম
দেখ ঘরে ঘরে আজ জেগে ওঠে এক এক ভীম। - (দিনবদলের পালা : ঐ)

১০/ শোনরে বিদেশী শোন,
আবার এসেছে লড়াই জেতার চরম শুভক্ষণ। - (একুশে নভেম্বর ১৯৪৬ : ঐ)

১১/ কে যেন ক্ষুব্ধ ভোমরার চাকে ছুঁড়েছে ঢিল'
তাই তো দগ্ধ, ভগ্ন, পুরনো পথ বাতিল। — (আমরা এসেছি : ঐ)

১২/ রুটি দেবে নাকো ? দেবে না অন্ন ?
এ লড়াইয়ে তুমি নও প্রসন্ন ?
চোখ-রাঙানিকে করিনা গণ্য/ধারি না ধার। — (বিদ্রোহের গান : ঐ)

১৩/ লাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে
কী হবে আর কুকুরের মতো বেঁচে থাকায় ? - (১লা মে-র কবিতা ৪৬ : ঐ)

খ) স্লোগানের ধর্ম পেরিয়ে কবিতা লিখতে পেরেছিলেন বলেই গণবাদী কবির 'চিল,' 'প্রার্থী' চারাগাছ, রানার, প্রিয়তমাসু, একটি মোরগের কাহিনী, 'আগ্নেয় গিরি, ছাড়পত্রের মতো আশ্চর্য কবিতাগুলো বক্তৃতার ময়দান অতিক্রম করেছিল :

১। নিরাপদ ইঁদুর ছানারা আর খাদ্য-হাতে ত্রস্ত পথচারী,
নিরাপদ-কারণ আজ সে মৃত। —(চিল : ছাড়পত্র)

২। হে সূর্য!
তুমি আমাদের সাঁাত সেঁতে ভিজে ঘরে/উত্তাপ আর আলো দিও
আর উত্তাপ দিও/রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে। —
(প্রার্থী : ঐ)

৩। তাইতো অবাক আমি, দেখি যত অশ্বত্থ চারায়
গোপনে বিদ্রোহ জমে, জমে দেহে শক্তির বারুদ! — (চারা-
গাছ : ঐ)

৪। রানার! রানার! ভোর তো হয়েছে আকাশ হয়েছে লাল,
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল?
রানার! গ্রামের রানার!/সময় হয়েছে নতুন খবর আনার; —
(রানার : ঐ)

৫। আজ দেহে আমার সৈনিকের কড়া পোশাক,/হাতে এখনো দুর্জয় রাইফেল
রক্তে রক্তে তরঙ্গিত জয়ের আর শক্তির দুর্বহ দম্ভ,
আজ এখন সীমান্তের প্রহরী আমি। (প্রিয়তমাসু : ঘুম নেই)

৬। অবশ্য খাবার খেতে হয় —
খাবার হিসেবে ॥ — (একটি মোরগের কাহিনী : ছাড়পত্র)

৭। আমার দিন-পঞ্জিকায় আসন্ন হোক
বিস্ফোরণের চরম, পবিত্র তিথি ॥ — (আগ্নেয়গিরি : ঐ)

৮। আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে/করে যাব আশীর্বাদ,
তারপর হব ইতিহাস ॥ — (ছাড়পত্র : ঐ)

সুকান্তের জীবনে সারি সারি দুঃখ, দলবেঁধে এসেছে, সেগুলোকে তিনি মানবিক প্রেমাবেগে যথেষ্ট বল-দৃপ্ত করে কবিতায় সাজিয়েও যখন সুখ পাননি, তখন নির্জনতা বেছে নিয়ে রোম্যান্টিক স্বপ্নরাজ্যে হারিয়ে যেতে চেয়েছেন। এই চাওয়া নিতান্তই সাময়িক বিশ্রাম।

ইতিহাস-সচেতন বাস্তববাদী কবি সেই ভুলে-থাকা স্বর্গরাজ্যে শেষ পর্যন্ত নির্বাসিত জীবনকে ধরে রাখতে পারেননি। ফিরে এসেছেন সেই ব্যক্তি-সীমা ভেঙ্গে সমষ্টির দরবারে:

"—আমি কবি বলে নির্জনতাপ্রিয় হব, আমি কি সেই ধরণের কবি? আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে? তা ছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্টদের কাজ কারবার সব জনতা নিয়েই।" ১

প্রকৃতির স্বপ্নাবেশ সুকান্তকে তাঁর একাকীত্বে মগ্ন থাকতে পারেনি। তাঁর মানব প্রেমিক মন সমাজের গ্লানি অপসারণের জন্য পরিবর্ত্তণের প্রবহমান স্রোতে গা ভাসিয়েছিল। উদ্ধৃত স্বীকারোক্তি সে আত্ম-শক্তির সাক্ষ্য।

ভুললে চলবে না সুকান্তের বয়স একুশ উত্তীর্ণ হয়নি। সেই তুলনায় কাব্যে তাঁর মানসিক বয়স যথেষ্ট পরিণতি লাভ করেছে। পত্রগুচ্ছ, গীতিগুচ্ছ পর্যায়ের লেখা তাঁর উন্নত কবি মনের পরিচয় বহন করে।

১। 'বাস্তবিক আমার প্রেমের বেদনা বড় অভিনব।'

(৫নং পত্র)

২। 'শতশত জন-কোলাহল মথিত ইস্কুল বাড়িটি আজ
নিস্তব্ধ নিঝুম। সদ্য বিধবা নারীর মতো তার অবস্থা।'

(২নং পত্র)

৩। 'কলকাতাকে আমি ভালবেসেছিলাম, এক রহস্যময়ী নারীর মতো,
ভালবেসেছিলাম প্রিয়ার মতো, মায়ার মতো।'

(১নং পত্র)

৪। 'প্রহরীর মতো জেগে ধ্যানমগ্ন পাহাড় তার অকৃপণ
বাৎসল্য নিয়ে, আর আমাদের সমস্ত ভাবনা ঢেলে দিলাম
সেই বিরাটের পায়ে।'

(১৪নং পত্র)

৫। '—এক দিকে বাইরের খ্যাতি, সম্মান প্রতিপত্তি লাভ করেছি, অন্যদিকে····আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যৎকে চূর্ণ করে দিচ্ছে। আমার শিক্ষা জীবনের ওপর এতবড় আঘাত আর আসেনি, তাই বোধ হয় এত নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে এই স্বাভাবিকতাকে, তাই সমস্ত শিরা—শিরার রক্তে রক্তে ধ্বনিত হচ্ছে প্রতিবাদ।'

(১৩নং পত্র)

---

১. সুকান্ত সমগ্র। পত্রগুচ্ছ: পত্র নং চুয়াল্লিশ। মেজ বৌদিকে লেখা, ১লা ফাল্গুন ।। ১৩৫১/পৃ ৩৩৮। ৭ম সং জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১/সারস্বত লাইব্রেরী, কলি - ৬

১। এই নব ঘন ঘোরে/কে ডেকে নেবে মোরে
কে নেবে হৃদয় কিনে/উদাসচেতা ? /(২নং গীতি)

২। আঁধার যেন প্লাবন সম আসছে বেগে
শেষ হয়ে যাক তারা তোমার/ছোঁয়াচ লেগে।
থামো ওগো, যেয়ো না হয়/সময় হলে ॥ /(৫নং গীতি)

৩। ওকে যায় চলে কথা না বলে দিওনা যেতে
তাহারই তরে আসন ঘরে রেখেছি পেতে।
(৭নং গীতি)

৪। কিছু দিয়ে যাও ধূলিমাখা পান্থশালায়,
কিছু মধু দাও আমার বুকের ফুলের মালায়।
(১০নং গীতি)

৫। আজকে আমার মনের কোণে/কে দিল যে গান,
ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠি/রোমাঞ্চিত প্রাণ।
(১২নং গীতি)

৬। দিনের শেষে/আজ বাউল বেশে
ঘুচাব মনের ভুল নয়ন জলে/মোর, নয়ন জলে ॥
(১৭নং গীতি)

আত্মমুখী মানসিকতা থেকে দৃঢ় সংকল্পের মধ্যে এগিয়ে যাবার নির্ভীক প্রস্তুতি সুকান্তকে জীবনের আস্বাদ ও শিল্প রস সৃজনের একাগ্রতা দিয়েছে। তৎকালীন দেশীয় পরিস্থিতির চাপে 'গণনাট্য' আন্দোলন * শুরু হয়। সুকান্ত এর সঙ্গে যুক্ত থেকে (সংগীত রচনা করে) তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় দেন :

---

* ক. ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখার উদ্যোগে সংঘের কর্মীগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষুধিত বাংলার আর্তনাদকে, বিধ্বস্ত সমাজ-জীবনের মর্মচিতটিকে উদ্ঘাটিত করেছে।

খ গণনাট্য সংঘ সাহসের সঙ্গে আসরে নামলেন। বিজনবাবু (ভট্টাচার্য সাহসের সঙ্গে রচনা করলেন প্রথমে 'জবানবন্দী' ও পরে নবান্ন।

গ. কলকাতায় ১৯৪০ সালে ইয়ুথ কালচারাল ইন্‌স্টিটিউ এই উপলব্ধি থেকে জন্মেছিল। বোম্বাই-এ ১৯৪২ সালে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর আশীর্ব্বাদ নিয়ে জন্মেছিল গণনাট্য সংঘ।

—মাঃ সাঃওবিঃ ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৬৩, ১৮৩, ১৫৮

ছাব্বিশ. করো জাপানের আজ গতি রুদ্ধ ;
শুরু করো, প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ ॥

(জনযুদ্ধের গান ৯ : অপ্রচলিত রচনা)

বিদ্রূপ শাণিত কণ্ঠে আশাবাদী কবি শোনালেন :

সাতাশ. এদেশে জন্মে পদাঘাত শুধু পেলাম
অবাক পৃথিবী ! সেলাম তোমাকে সেলাম।

(অনুভব/১৯৪০: ছাড়পত্র)

অন্নপূর্ণা এই সোনার বাংলাদেশে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কতিপয় মানুষের মুঠোয়। শোষিতের দল শুধু বঞ্চনার শিকার। সুফলা বঙ্গভূমি তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সুকান্তের দৃষ্টিতে রূপ নিয়েছে :

আটাশ. ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়:
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি ॥

(হে মহাজীবন: ছাড়পত্র)

সুকান্তের আবির্ভাব যুগযন্ত্রণার দুঃসহ কালখণ্ডের ভিতর। তখন 'বন্দেমাতরম' 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত কণ্ঠে কলকাতা মহানগরীর বুকে। দাঙায় যে মানুষ প্রাণ হারায়নি, অসংখ্য তাদের আত্মবলি দিতে হয় কলকাতার অলিতে গলিতে কুকুর, বিড়ালের মতো, বৃটিশের আগ্নেয় অস্ত্রের মুখে। অন্তর্দাহে অধীর কবি সুকান্ত কবিতাকে বুকে করেই রাজনীতির ময়দানে পৌঁছেছিলেন সেদিন। রাজনীতির কর্মযজ্ঞ শুরু হয় ১৯৪২-র গোড়ার দিকে। সুকান্ত দেখেন ১৯৪৩-র দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৫-র আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীমুক্তি আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, ১৯৪৬-র বিখ্যাত হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা, বেকারি, কন্ট্রোল, তেভাগা আন্দোলন প্রভৃতি। কবি-হৃদয় তখন এই উত্তেজক আবহাওয়ার মুখোমুখি। রোম, ইউরোপের সঙ্গে কলকাতা, চট্টগ্রাম, মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় সুকান্তের অস্তিত্বের ভিতরে ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭-র যুগসন্ধির এই পাঁচ বছরের বহুমূল্য ঐতিহাসিক সময়ের সীমানায়।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য ভারতবর্ষের শ্রমিকদের শুভ প্রেরণা যুগিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলা সাধারণের মনে সাম্যবাদী চেতনা উদ্বোধনের কারণ। এই প্রতিবেশে সুকান্ত পালিত ও পুষ্ট। তাই কখনো তিনি বিপদগ্রস্ত, কখনো আশায় উজ্জ্বল, কখনো বা ভাবনায় কাতর। আবার কখনো কখনো প্রত্যয়ের পিঠে চেপে সাহসে লাগাম কষে নিষ্করুণ হুংকারে প্রমত্ত।

ছাব্বিশ বছর বয়সেই 'কীটস' কে ক্ষয় রোগের শিকার হতে হয়, 'চ্যাটারটন' কে সতের বছর বয়সে অভাবের তাড়নায় 'আর্সেনিক এ্যাসিড' খেয়ে আত্মহত্যা করতে হয়, সোমেন চন্দকে বাইশ বছর বয়সে স্বদেশী ঘাতকের নির্মম উল্লাসে প্রাণ দিতে হয়। প্রতিজ্ঞা সচেতন সুকান্তকেও মাত্র একুশ বছর বয়সে ক্ষয় রোগে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়। তাঁর বিদ্রূপ মিশ্রিত কণ্ঠে শুনি যন্ত্রণাবিদ্ধ বেদনার কথা। সংঘর্ষে বিধ্বস্ত মন নিয়েও সুকান্ত সত্যকে সুস্থির বাক্য-বন্ধনে বিবেকানন্দের সামনে উপস্থাপন করেছেন :

"আমার খবর : শরীর মন দুই-ই দুর্বল। অবিশ্রান্ত প্রবঞ্চনার আঘাতে আঘাতে মানুষ যে সময় পৃথিবীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সময় এসেছে আমার জীবনে। ···আজকাল চারদিকে কেবল হতাশার শকুনি উড়তে দেখছি। হাজার হাজার শকুনি ছেয়ে ফেলেছে আমার ভবিষ্যৎ আকাশ। ···অবিরাম আন্তরিক খাটুনির পুরস্কার হিসেবে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেলুম যাতায়াতী খরচের জন্য পাঁচটি টাকা আর পেলুম চারদিনের জন্য পার্টি হাসপাতালের 'ওষুধপথ্যহীন' কোমল শয্যা। এতবড় পরিহাসের সম্মুখীন জীবনে আর কখনো হয়নি। আমার লেখক সত্তা অভিমান করতে চায়, কর্মী সত্তা চায় আবার উঠে দাঁড়াতে।" ১

পার্টির নেতৃবৃন্দের প্রতি সুকান্তের হতাশা এসেছিল। তার পরিচয় দিতে তিনি দ্বিধা করেননি। তবে পার্টির প্রতি তাঁর কোন অশ্রদ্ধা জাগেনি। এই মর্মান্তিক বঞ্চনা সত্ত্বেও কবি হতে পেরেছেন সুকান্ত। জন জীবনকে অনুপ্রাণিত করতেই তিনি কবি। তাঁর মুখেই শোনা গেল :

"··· ···কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট,' কমিউনিস্টদের কাজ-কারবার সব জনতা নিয়েই।" ২

রবীন্দ্রনুরাগী সুকান্তের কবিতার সুরে জীবনের সার্বিক প্রকাশ নেই সত্য, তবু অপরিণত বয়সের রচনা নির্দ্দিষ্ট বক্তব্যে স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। জন্ম সূত্রে গণ সমাজের লোক নন, তবে কবিরূপে তাদের চেতনা ও জীবন চেষ্টার শরিক তিনি। তাই তাঁর বলিষ্ঠ কাব্য প্রত্যয় সাধারণের মুক্তির দিশারী। মনের মানুষদের জন্য সুকান্ত রেখে গেছেন তাঁর ঠিকানা :

উনিশে. দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেকের ঘরে
ক্ষুব্ধ এদেশে রক্তের অক্ষরে বন্ধু আজকে বিদায়

---

১. সুকান্ত সমগ্র সুকান্ত ভট্টাচার্য। পৃঃ ১৩৯। ৭ম সংস্করণ : ১৩৮১। সারস্বত লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত।

দেখেছ উঠল যে হাওয়া ঝোড়ো /ঠিকানা রইল
এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা করো ॥ /(ঠিকানা : ছাড়পত্র)

সুকান্ত, নজরুলের কথা বলেননি সত্য, তবু বলা চলা এঁরা দু'জনেই বিদ্রোহী ও গণ-মনের কবি। দু'জনেই রবীন্দ্র-ভক্ত। আর দু'জনের কণ্ঠই স্বাধীনতার উদয়াচল অরুনাভ হবার পূর্বেই স্তব্ধ। আত্মিক যোগাযোগ অদ্ভুত ইশারায় গড়ে উঠেছিল এঁদের অজান্তে। তবে এই দুই কবির মানসিকতার ভিতর দুস্তর ব্যবধান। নজরুল প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতি করেননি। কোনো বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে কবিতায় তিনি জীবন ও জগতকে দেখাননি। আবেগ উচ্ছ্বাসে ভরা তাঁর প্রেমিক মন কখনো দুর্গত দেশের ব্যথায়, কখনো ব্যক্তিগত মর্মসঙ্গের ব্যাকুলতায়, কখনো বা রূপসী প্রকৃতির রূপমুগ্ধতায়, আবার কখনো ঈশ্বরীয় ভালোবাসার আকৃতিতে গানে কবিতায় নিরন্তর স্ফূর্ত হয়েছে। এইখানে সুকান্তের সঙ্গে নজরুলের বড়ো পার্থক্য।

সমকালের কাব্যপটে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তা বোধ সুকান্তের বিশিষ্টতা চিহ্নিত। পূর্ববর্তী কবিদের সে কৃতিত্বের স্বীকৃতি পাওনা থাকলেও সুকান্তের শ্রেষ্ঠত্ব কিন্তু স্বতন্ত্র মর্যাদার।

সাতচল্লিশের আগের দেশ আর তার পরের ছত্রিশ বছরের স্বাধীন দেশের তুলনা মূলক হিসেব নিলে চোখে পড়ে পূর্ণতার স্থলে শূন্যতা। এই নিথর শূন্যতার দীর্ঘ অবকাশে সুকান্ত-কণ্ঠের নবনিনাদ শোনা যায় :

ত্রিশ. এবারে নতুন রূপে দেখা দিক রবীন্দ্র ঠাকুর
বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণ সংগীতের সুর
জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে
চলুক নিন্দাকে ঠেলে, গ্লানি মুছে আঘাতে আঘাতে।
(পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে : ঘুম নেই)

একান্ত মানবিক মূল্যবোধের তাগিদে তাঁর কবিতা উচ্চকণ্ঠ। আমরা দেখতে পাই রাজনীতি যেখানে জীবন—নীতি সেখানে বারবার পরিচ্ছন্নতা ও অকপটতা নিয়ে ফিরে আসে সুকান্ত। তাঁর কবিতা একযোগে সেই সকল স্তরের মানুষকে আশার বানী শোনায়, যারা দুর্বলতা এবং প্রলোভন কে জয় করতে পেরেছে :

একত্রিশ. তাদেরই দলের পেছনে আমি ও আছি
তাদেরই মধ্যে আমি ও যে মরি বাঁচি।

তাই তো চলেছি দিন-পঞ্জিকা লিখে— /বিদ্রোহ আজ! বিপ্লব চারিদিকে ॥

(অনুভব/১৯৪৬ : ছাড়পত্র)

সর্বজনীতা সুকান্তের কবি-মনের ভাষা। আঙ্গিকগত উৎকৃষ্টতার চেয়ে বিষয়গত অর্থসম্ভারই তাঁর কবিতা। সুকান্তের কবিতার ভাবাদর্শ সমাজতান্ত্রিক,— শোষিত-সর্বহারার বাঁচার পথ নির্দেশে অতন্দ্র। তাঁর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি :

বত্রিশ. শোন্‌রে মালিক, শোন্‌রে মজুতদার!
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব কি দিবি তার? / (বোধন : ছাড়পত্র)

কবিতার শব্দে শব্দে শ্রেনী সংগ্রাম আর বিপ্লবের সজোর ঘোষণা। পড়তে পড়তে মনে হবে, চাঁদ-ফুল-পাখিরূপে-সৌরভে-সুরে পেলব কবিতার দিন বুঝি গেছে। অথচ সুকান্তের কাব্যভাষায় কেবল বক্তব্যবাহী শব্দ সজ্জা নেই, চিত্র-কল্পনার বাহন হবার দক্ষতা আর সর্বাঙ্গে।

এমন কবিতা কোন কিশোর কবির কণ্ঠে এদেশে এর আগে শোনা যায়নি। 'সিগারেট' 'দেশলাই কাঠি' সুকান্তের মমতার ছোঁয়ায় সাহিত্যের আর এক নতুন ভাব-তল চিনিয়ে দিয়েছে। এ তাঁর মৌলিক চিন্তার ফসল। 'বহ্নিমুখ', সিগারেট' বা 'দেশলাই কাঠি'— কে বিপ্লবের প্রতীক করে এক একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা ভাবের অভিনব উপস্থাপনার পরিচয় দেয়। আঙ্গিকের দিক থেকেও এ-সব কবিতা অদৃষ্ট পূর্ব শিল্পরূপের নিদর্শন :

তেত্রিশ. আমরা বেরিয়ে পড়ব, / সবাই একজোটে, একত্রে —
তারপর তোমাদের অসতর্ক মুহূর্তে
জলন্ত আমরা ছিট্‌কে পড়ব তোমাদের হাত থেকে
বিছানায় অথবা কাপড়ে ; / নিঃশব্দে হঠাৎ জ্বলে উঠে
বাড়ি সুদ্ধ পুড়িয়ে মারব তোমাদের,
যেমন ক'রে তোমরা আমাদের মেরেছ এতকাল ॥
(সিগারেট : ছাড়পত্র)

চৌত্রিশ. আমরা বারবার জ্বলি, নিতান্ত অবহেলায়— / তা তো তোমরা জানোই!
কিন্তু তোমরা তো জানো না : / কবে আমরা জ্বলে উঠব —
সবাই — শেষবারের মতো! / (দেশলাই কাঠি : ছাড়পত্র)

সুকান্তের আন্তরিকতার এই বিপুল উত্তরণ, বাচ্যার্থ থেকে অভিব্যঞ্জনায়।

"মার্কসীয় বিচারে একথাই বলা যেতে পারে যে অক্টোবর সোশ্যালিষ্ট বিপ্লবের পর শ্রমিক শ্রেনীর নেতৃত্ব মূলক ভাবধারাতেই বিপ্লবী সাহিত্য রচিত হতে পারত

এবং সাম্রাজ্যবাদ—বিরোধী ও ফিউডাল—বিরোধী সাহিত্য উচ্চতর স্তরে উঠতে পারত।

নজরুল শ্রমিক শ্রেনীর সামান্য একটু কাছে এসেছিলেন এবং অক্টোবর সোশ্যালিষ্ট বিপ্লবের ঢেউ (যার অঙ্গীভূত ছিল তুর্কীর কেমালিস্ট — বিপ্লব ও ভারতের অসহযোগও কৃষকআন্দোলন) তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছিল, এই তার গৌরব।" ১

গণ জীবন কেন্দ্রিক রচনা মাত্রই গণ-সাহিত্য নয়। ডা: ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তার একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন :

"গণ শ্রেনীর দুঃখ ও দারিদ্র্য, আকাঙ্খা ও আদর্শের কথা, হৃদয়ের বেদনাও সুখেচ্ছার কথা লইয়া এবং তাহাকে সমাজের কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার world-view নিয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে তাহাকে গণ সাহিত্য বলা যায়। ভারতে অর্থ নৈতিক কারণে একটা গণ-আন্দোলন চলিতেছে বটে, কিন্তু তাহার একটা সাহিত্য এখন ও গড়িয়া উঠিতেছে না— ইহাও একটা কাল-ব্যতিক্রম। যেদিন গণশ্রেনীর লোক সাহিত্যে লোক সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিবে, সেইদিন একটা জীবন্ত গণ-সাহিত্য উদ্ভূত হইবে।" ২

সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং সুকান্ত, নজরুলের ঠিক আর এক ধাপ আগের সারির কবি। গণ-মন কে উদ্দীপ্ত করার কৃতিত্ব এঁদের তিন জনের কমবেশি সমান। স্বাতন্ত্র্যবজায় রেখে সুতীব্র জীবন প্রীতির পরিচয় দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের গভীর স্বপ্ন দেখেছেন এঁরা। বিশ শতকে আত্ম-জাগরণের ক্ষেত্রে সুকান্তের কণ্ঠ জীবন রসে বেশী সমৃদ্ধ। ফলে তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনায় শ্রেনী—চেতনা, স্বদেশ—চেতনা, এবং বিশ্ব—চেতনা প্রগতিশীল জীবন দর্শন করায়। জনপ্রিয় এবং জীবন—রসে সিক্ত সেই বিশেষ ক'টি কবিতা বেছে নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে, গণমুখী সাধনায় কতটা তা সফল হয়েছে তার বিচার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

সুকান্তের কবি—পরিচয় এবং রচনার চারুত্ব নির্দেশের পক্ষে এই সব (ছাড়পত্র, আগামী, রবীন্দ্রনাথের প্রতি, চারগাছ, খবর প্রার্থী, একটি মোরগের কাহিনী, সিঁড়ি, কলম, ঠিকানা, লেনিন, অনুভব (১৩৫১), সিগারেট, বিবৃতি ঐতিহাসিক, বোধন রানার, ফসলের ডাক (১৩৫১), কৃষকের গান, বিস্ফোভ, ১লা মে-র কবিতা, (৪৬),

১. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক— ২। ধনঞ্জয় দাস। পৃ: ১৬৩। ২য় খণ্ড। ১ম প্রকাশ মার্চ ১৯৭৬। ৬ ষ্টব্য

২. ঐ —৩। ঐ। পৃ: ৬০। ৩য় খণ্ড। ঐ এপ্রিল ১৯৭৮। ঐ

প্রিয়তমাসু, মহাত্মাজীর প্রতি, দুর্মর ;১ কবিতা অনেকখানি সহায়ক।

উদ্ধৃত কবিতাগুলো ভাষা, ছন্দ, গুণধর্ম এবং রসাবেদন অক্ষুন্ন রেখেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সামিল। আমাদের আলোচনার বিষয় সুকান্তের কবিতা শ্লোগান (প্রচারবাদী) ১ নয় ; শিল্পকর্ম। ভাব ও যুক্তির সমীকরণে তাঁর রচনা নতুন জীবন-পথের নির্দেশ দেয়, বাঁচার প্রেরণা সঞ্চার করে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে 'ছাড়পত্র' কবিতা আলোচনা করবো—

১। ক. যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম : /সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্ম মাত্র সুতীব্র চীৎকারে।

সমস্যায় জর্জর পৃথিবী। গ্লানি মুক্তির নবজাতকের আগমণের বার্ত্তা কবি পেয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস এরা কলে কারখানায়, মিলে-ময়দানে, পল্লীজননীর পর্ণ কুটিরে, আলোহীন বস্তি-গৃহে জন্ম নিয়েছে। এদের জন্য সমষ্টির সঙ্গে একাত্ম হবার যোগ্য বাসভূমি পরিকল্পিত করে তুলতে হবে। কারণ যে কাজ অসমাপ্ত থেকে গেছে তা সম্পূর্ণ করে তুলবার মতো পরিবেশে রচনা দরকার। প্রয়োজনে সে সুযোগ দিয়ে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতেও সুকান্ত প্রস্তুত। তারই নির্দিষ্ট ইঙ্গিত :

খ. এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান ;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংস স্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।

এই যাত্রার পূর্বে প্রাণে যতটুকু শক্তি ও উদ্যম রয়েছে তার সদ্ব্যবহারের কোন ত্রুটি রাখতে সম্মত নন কবি। তাই নিজস্ব চিন্তা :

গ চলে যাব-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণ পণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—

---

১. আইজেনস্টাইন, মাইত্রর হোল্ড, গোর্কি, শোলোকভ, টিখোনভ, মায়াকোভস্কি, শোস্তাকোভিচ, পপভ, এঁরা কেবল ব্যক্তিগত প্রতিভাকেই প্রকাশ করেননি, প্রকাশ করেছেন, সোভিয়েত মানবের প্রতিভাকে ; সূচনা করেছেন সভ্যতার এক নতুন অধ্যায়ের। তাই কমিউনিস্ট কবিতা কেবল, রাজনৈতিক প্রচারের কবিতা নয়, 'নতুন পৃথিবীর কবিতা'।

—মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক। ৩য় খণ্ড। পৃঃ ৫১ দ্রষ্টব্য

নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ভিন্ন গণজীবনের উপর নির্মম অত্যাচার শোষণ অব্যাহত থাকবে। সুকান্ত তাই সমাতান্ত্রিক আন্দোলনে সংবদ্ধ।

* "কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দলিলপত্রের সূত্র ধরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম তারিখ পাওয়া যায়—১৭ অক্টোবর, ১৯২০। সি. পি. এম ঐ দিনটিই মেনে নিয়েছে। ওই দিন তাসখণ্ড শহরে এক সভায় এম, এন, রায় প্রমুখ সাতজনকে নিয়ে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়। তার প্রথম সম্পাদক হন—মহম্মদ শফিক সিদ্দিক। সি. পি আইয়ের মতে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা আরও পাঁচ বছর পর। সে বছর ১৯২৫ সালের ২৫-২৬ ডিসেম্বর কানপুরে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট সম্মেলনটিই তাঁরা শুরু বলে ধরে থাকেন।" ১

** "দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়া ও বিপ্লব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের নিঃসঙ্গতা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ঘোচেনি। যুদ্ধের শেষ দিকে হিটলারের নাৎসি বাহিনী যখন সোভিয়েত লাল ফৌজের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করছে তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিবেশী পূর্ব ইউরোপের আটটি দেশ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করে। ... ...লাল ফৌজের মুক্তিফৌজের ভূমিকায় সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত জার্মানী। জার্মানীর যে-অংশ সোভিয়েত সেনা মুক্ত করে সে-অংশ সমাজতান্ত্রিক আর যে-অংশ আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের দ্বারা মুক্ত হয়েছিল সে-অংশ আজ ধনতান্ত্রিক পশ্চিম জার্মানী। ... ...সোভিয়েত বিপ্লবের পর সমাজতন্ত্রের সব চেয়ে বড় জয় চীনে। চীনে বিপ্লব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়নি, হয়েছিল পাঁচ বছর পরে। ... চীন ও ভিয়েতনাম ছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সত্যিকারের বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন একটি মাত্র দেশে হয়েছে, সেদেশ কিউবা। ...অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের বিপ্লব পদ্ধতিতে আকাশ পাতাল তফাত। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লব হয়েছিল শহুরে অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে, প্রধানত শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহে। কৃষকদের ভূমিকা প্রায় ছিল না বললেই চলে। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লব ছড়িয়েছিল শহর থেকে গ্রামে। চীনে কিন্তু হয়েছিল কৃষক বিপ্লব। সেখানে বিপ্লবের পুরোভাগে ছিল কৃষকরা। গ্রামের বিপ্লব সেখানে শহরে এসে পৌঁছেছিল,

১. দেশ। ২২ নভেম্বর ১৯৮৬। ৫৪ বর্ষ ৪ সংখ্যা (আশিস ঘোষ : রাজনীতির মানচিত্রে কমিউনিস্ট পার্টি। পৃঃ ৫৭ আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড। ৬৩৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলি—৭০০০০১

গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করা হয়েছিল।"২

মানুষকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে নতুন সভ্যতার বুনিয়াদ রচনা করাই কমিউনিজমের ঐতিহাসিক ভূমিকা। তাই মার্ক্স এঙ্গেলস্ বা লেলিণ কেবল কী করে বিপ্লবের দ্বারা শোষিত শ্রেনী শোষণ থেকে আপনাকে মুক্ত করবে তাই বলেননি; প্রকৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ললিত কলা নিয়ে মানুষের যে সমস্ত জীবন— তার মূলেই একটি সমগ্র বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছেন।

.....কমিউনিষ্ট কবিতা কেবল "রাজনৈতিক প্রচারের" কবিতা নয়, নতুন পৃথিবীর কবিতা।

.....কমিউনিষ্ট কবিতায় ব্যক্তিগত আবেগের প্রকাশ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ— এ দু'য়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, 'দেশঋণ' শোধ করতে কবি দেশের প্রতি কর্তব্যের তাগিদে আসেন না, প্রাণের তাগিদেই আসেন।"১

নির্দ্বিধায় মনের এতবড় কথাকে প্রকাশ্যে উচ্চারণ করেই নির্লিপ্ত থাকেননি কবি। তিনি অভিনন্দনের সঙ্গে প্রাণ খুল আশীর্ব্বাদ করে যাবেন। শুধু কল্পনা-প্রেমিক নন বলেই সংগ্রামী কবির সৈনিকমূলক কার্যক্রম তাঁর অভিনব গণ প্রীতির ইঙ্গিত দেয়। সুকান্তের এই সমপ্রাণতাবোধের ভিতর কৃত্রিমতা নেই। আছে বলিষ্ঠ সাফল্যলাভের ভবিষ্যৎমুখী তীব্র আকাঙ্খা। এই নতুন অথচ সর্বজনকাম্য কথা সুকান্তই প্রথম শোনালেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'সুকান্তের' প্রার্থিত নবজাতকদের চলার পথের নির্দেশ দিলেন অনাবিল দরদ দিয়ে;

'আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি;/একাকী চলতে চাইনা এরোপ্লেনে;
আপাতত, চোখ থাক পৃথিবীর প্রতি,/শেষে নেওয়া যাবে শেষকার পথ জেনে॥'

(সকলের গান; পদাতিক)

সুকান্তের 'আগামী' কবিতায় আরো এগিয়ে যাবার প্রত্যয়;

২/ক* আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাব বৃহতের দলে
জয়ধ্বনি কিশলয়ে; সম্বর্ধনা জানাবে সকলে।
তাঁর বিশ্বাস খ* ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই-জানি আমি ভারী বনস্পতি
বৃষ্টির, মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।

২* ঠিকানা: আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড। ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার ষ্ট্রীট কলি—৭০০০০১। (শঙ্কর ঘোষ: এ যুগের চাঁদ হল কান্তে)। পৃ: ৩৭—৩৮

১* মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক-৩ | ৩য় খণ্ড | পৃ: ৫১-৫৫ | দ্রষ্টব্য।

যেন চারণকবির ভূমিকায় সুকান্ত অনগ্রসর গণজীবনে সংগ্রাম স্পৃহা জাগিয়েছেন। প্রয়োজনে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার মতো মনোবল কবির আছে। সেই ভয়ংকর সংগ্রামের ঈপ্সিত অন্তর্দৃষ্টি 'বিবৃতি' 'সিগারেট' 'বোধন' 'ঐতিহাসিক' প্রভৃতি কবিতায়। ফলে সুকান্তের মানব—প্রীতি দৃষ্টান্ত মাত্র হয়েই কবিতায় জোয়ার আনেনি ; গণ-উদ্যমের ভিতর সম্ভাব্য প্রেরণার নিদর্শনরূপে, শিল্পকর্মের এক নবতন সম্পদ সৃষ্টি করেছে, সুকান্ত—পূর্ব সূরীদের কবিতায় যার অনেকটাই অনুপস্থিত। কারণ, সর্বজনের জন্য একটা সাধারণ শ্রেয়োবোধে উদ্দীপ্ত এঁদের সাধনায় বাহ্যিক শুভকামনার কণ্ঠস্বর যতটা স্পষ্ট, নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে তা ততটা নিয়ম—শৃঙ্খলিত নয়। ইতিহাসের কালজ্ঞান ধরে দিন এবং মন বদলের প্রয়াস সুকান্তকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। তিনি নিজের কথা কখনোই ভাবেননি। সবার জন্য তাঁর সমান ভাবনা, সমান কামনা।

সুকান্তর কবিতার একপিঠে সংগ্রাম, অন্যপিঠে শিল্প। আত্মিক শৌর্য এবং পৃথিবীর সৌন্দর্য তিনি একই লেখায় মিলিয়েছিলেন। আত্মরক্ষা এবং আত্ম-বিস্তারের মৌলিক দুটি মানবাধিকার তাঁর কবিতার যুগল-বানী।

প্রগতিপন্থী কবি মায়াকোভস্কীর অন্তরের ও সেই পরিচয় এখানে তুলনীয় :

"My huge eyes
Cathedral — poors oden to all,
People — / Loved, / unloved, / Known /and unknown
in an endless procession pour into my soul", 1
(War and peace : 1916)

শিল্পের কোনো উত্তরাধিকার পেয়ে সুকান্ত সাধারণের দুর্দশা মোচনের কথা উচ্চ রবে শুনিয়ে গেছেন বললে ভুল হবে। কারণ এমন কিছু লোক পৃথিবীতে আসেন, যাঁরা ঋণী হতে পারেন না; বরং নিজস্ব (অভিজ্ঞতা থেকে) উপলব্ধির মধ্য দিয়ে যে সত্যের সন্ধান পান, তারই প্রতিষ্ঠার পথ করে যান। সোভিয়েত ভূমিতেও সেইরূপ মানব প্রেমিক—কবি মায়াকোভস্কী। তাঁর সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ যোগ্য :

---

1. Vladimir Mayakovsky : Innovator । Translated from the Russian by Alex Miller / Excerpts from Mayakovsky's poetry tranlsated by Dorian Rottenberg । Page 162 । Progress Pu hishers Moscoco

"..... Mayakovsky's lyrical poetry Could not embrace all the feelings and sentiments of the newman, it is of fundamental impontance that he was a one of the first in soviet poetry to predict the effloresoence of the integral human personality on the basis of struggle for the socialist rebuilding of the world. In this he saw a feasible solution to the problem of the private and social, and in his work he reflected this as one of the most important spritual gains of the new system. In relation to his own times, Mayakovsky as a poet epitomised the highest level of Social and artistic consciousness."2 Or : "Puskin, Nekrasov aud Mayakovsky created models of service to the people ; they were close to one another,

because : 'And long the people yet will hodnour me
Because my lyre was turned to loving-kindness
And in a cruel Age, I sang of liberty'.......

because : 'Last evening after five I slipped
Into senvaya place
And saw a peasanl maiden whipped,
In token of disgrace,
No sound or murmur uttered she :
The kuont swished through the air
And to the Muse I said, "oh, see,
That is your sister there !".

because : And all this army
armed up to the teath

---

2. Vladimir Mayakovsky : Innovator | Translated from the Russian by Alex Miller/Excerpts from Mayakovsky's poetry traulsated by Dorian Rottenberg | Page |162 | Progress Publshers Moscow | Page 149/Alexander Ushakiv : The Mayakovosky Tradition in contemporary Soviet poetry.

With twenty years of triumph
to its merit—
in all its flying might
to the last leaf
I give away to you
the planets proletriat."1

Or : "Mayakovosky's vision included, with Lenin, the working class and its, leading role in the struggle for the liberation of working people from Capital enslavement."2

Or : "Mayakovsky's internationalist poetry has taken its place at the head of all world's revolutionary and progressive poetry. The verse of the proletarian poet, in whom "the Voice of the singer elevates class," has become a fighting weapon in the hands of the world's workers". 3

সুকান্তের কাব্যে কথা ও কল্পনায় সোনালী কল্কার বাহার নেই কিন্তু গণ-জীবনের স্রোতে মিশবার প্রবল বাসনার স্পষ্ট কথাটা আছে। সার্বিক মঙ্গলের কথাই বলেন সুকান্ত। তাঁর লেখা দলীয় প্রচার—পত্র বলে মনে হতে পারে কিন্তু বেদনে সে স্বর নেই। সর্বজনের সুখের প্রতীকরূপে আসন্ন যুগের পরিচয় পত্র নিয়েই নবজাতকের আগমন। সুকান্তের মানবতাবাদের এটি একটি সার্থক পদক্ষেপ। অপরিণত বয়সে এমন আশ্চর্য সমবেদনার ভাষা কবিতার অবয়বে ইতিপূর্বে উচ্চারিত হয়নি। সৃষ্টির এই দুর্লভ সাফল্য সুকান্তের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

সংশয়ের পংক্তিতে দাঁড়িয়ে সুকান্তের কবিসত্তা পীড়িত মানুষের আর্তনাদ, শুনেছিল। অমানুষ শাসকের আচরণ তাঁকে শোষণের বিরুদ্ধে বিপ্লবী মতাদর্শে

---

1. Vladimir Mayakovsky : Innovator | Translated from the Russian by Alex Miller / Excerpts from Mayakovsky's poetry tranlsated by Dorian Rottenberg | Page 267-Mikhail mkonin : Comrade Poetry.
2. Do | Page 46 | Alexi Metchenko : The Poetry of Mayakovsky
3. Do | Page 274 | Sergei Narovchatov : A word about Mayakovsky.

দীক্ষা দিয়েছিল। অল্প বয়সেই পরিণত মননের পরীক্ষায় সুকান্ত উত্তীর্ণ। অবক্ষয়িত সমাজে তাই নব রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় :

৩০ যদিও রক্তাক্তদিন, তবু দৃপ্ত তোমার সৃষ্টিকে
এখনো প্রতিষ্ঠা করি আমার মনের দিকে দিকে।

সুকান্ত আশাবাদী। বাঙলার মহাশ্মশানে উপবাসী জনগর্ণের প্রাণবলি প্রত্যক্ষ করেও মন্বন্তরের কবি অশ্রুপাত করেননি। বরং রবীন্দ্রনাথে অনুপ্রাণিত কবি অপমানিত মানুষের অপমানকে অগ্রগমনের মুক্তিপথ রূপে নির্মান করে গেছেন। সহজ বক্তব্যেগুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপলব্ধির সশ্লিষ্ট প্রয়াস সুকান্তে চমকপ্রদ। তাঁর সকল কবিতায় যুগ যন্ত্রণার সুর নানা মাত্রায় ও ভঙ্গীতে পরিবেশিত। দানবের সঙ্গে সংগ্রামী মানুষের বোঝাপড়ার সময় উপস্থিত, — সুকান্তের কবিতা পাঠকের ধমনীতে সেই দোল দেয়। মেহনতী মানুষ শোষণ মুক্ত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মুখোমুখি দাঁড়াতে চলেছে, সুকান্তের রচনা তারই প্রতিবিম্ব। কারণ সাহিত্য ও জীবন দূরত্ব রেখে চলতে পারে না। একে অন্যের আত্মায় মিলে একাকার হতে বাধ্য। নিগূঢ় সম্বন্ধের টানেই এ মিলন অবশ্যম্ভাবী। হৃদয়ের সংবাদ, হৃদয়ে পৌঁছে দেন কবি। কথাকে অনুপম করে তুলতে গিয়ে একটা নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে হয় তাঁকে। ফলে শব্দময় কবিতা গভীরতর অর্থের ব্যঞ্জনায় রূপবতী হয়ে ওঠে। শুদ্ধ শিল্প সন্ধান সাহিত্যে আনন্দ বিতরণ করে সত্য যা রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে দৃষ্টিপাত করলে যেমন জানা যায় :

"সংসারের সকল বিভাগেই এইযে 'চাই-চাই' হাট বসে গেছে, এরই আশপাশে মানুষ একটা ফাঁক খোঁজে যেখানে তার মন বলে চাইনে, অর্থাৎ এমন কিছু চাইনে যেটা লাগে সঞ্চয়ে। তাই দেখতে পাই প্রয়োজনের এত চাপের মধ্যে মানুষ অপ্রয়োজনের উপাদান এত প্রভূত করে তুলেছে, অপ্রয়োজনের মূল্য তার কাছে এত বেশী। তার গৌরব সেখানে, ঐশ্বর্য যেখানে, যেখানে প্রয়োজন ছাড়িয়ে গেছে।"

কিন্তু সংঘশক্তি গঠন করে বৈপ্লবিক গণ-জাগরণের ভাবনা যে কবিদের মগজে উত্তাপিত সেখানে ওই অপ্রয়োজনের আনন্দ নিশ্চয়ই শিব-সংঘর্ষ বাধায়। কারণ সামাজিক মঙ্গল সাধন সাহিত্যের ধর্ম না হলে, যথার্থ প্রগতি সাহিত্য সৃষ্ট হতে পারে না। জীবনের পুষ্টিকর উপাদান সহিতো প্রাণিত হবে এবং সেই গূঢ় সত্যকে সমাজের আলোয় কবিকে চিনিয়ে দিতে হবে। তবেই সে সাহিত্য সংগ্রামী মানুষের স'হৃদয়-হৃদয় সংবাদী' হয়ে উঠবে।

বিশ শতকের সাহিত্যে জীবন নিয়ে একটা তীব্র সমস্যা এবং তার মীমাংসার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল সুদৃঢ় সংকল্প আর সংগ্রামশীল মনের। জীবন ধর্মের ঋত্বিক হওয়া প্রয়োজন সাম্যাশ্রয়ী সাহিত্য সেবীদের। বর্ত্তমান যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষকে জগতের সুখ দুঃখ একত্রে দর্শন করায়। নিঃসঙ্কোচে তাই পৃথিবীর এক প্রান্তের কৃষক শ্রমিকের জীবন-যাত্রার সঙ্গে আর এক প্রান্তের কৃষক শ্রমিক কুলের প্রাত্যহিক সম্বন্ধের মিল ঘটে যায়। সাহিত্য-সেবীরা তাই চোখ বুঁজে নিজের মনোরম নিরাপত্তায় পালিয়ে থাকতে পারেন না। জীবনের নিরন্তর প্রশ্ন সবেগে সহস্রবার তাঁদের মনে আছড়ে পড়ছে। তাঁরা জীবনের গভীর সমস্যাকে স্বাগত জানানোর দায়িত্বে বদ্ধ। এই বিশেষ সচেতনার ফলে বিশ শতকের সাহিত্য সামাজিক মঙ্গলাশ্রয়ী। এ প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত অভিমত স্মরণযোগ্য :

"আগামী দিনের সাহিত্য সম্পর্কে প্রগতিশীল সমস্ত চিন্তার যোগফল আমি উদ্ধৃত করে দিলাম।

বলাবাহুল্য, এই উনিশশো আটচল্লিশ সালের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রতিক্রিয়াশীলতাকে কেউ চায় না—আপনি নন, আমি নই, কেউ নয়। কিন্তু সজ্ঞানে না হলে আমাদের অবচেতন স্রষ্টা (Creator) এবং বিচারক (critic) সত্তায় কিছুটা পরিমাণে প্রতিক্রিয়ার বীজ রয়েই গেছে। মধ্যবিত্ত তথা বুদ্ধিজীবী মানস থেকে রাতারাতি এদের উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়, প্রস্তুতি চাই তার জন্যে। চাই সামাজিক বিপ্লবের আঘাত। যে আবহাওয়ায় আমাদের মন গড়ে ওঠে, যে শিক্ষা আমাদের রুচি-রীতি চরিত্রের রচনা করে এবং যে পরিবেশ আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে, তার ফলে বিদ্রোহ করতে গিয়ে আমরা হয়ে উঠি এনার্কিষ্ট ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী, 'art for art's sake'—এ আস্থাবান, আর এর পরিণামে আমরা ঘোষণা করি পরাভব ও দুঃখবাদ। জন্ম বিদ্রোহী হয়েও তাই মধ্যবিত্ত অনেক সময়েই এক শোচনীয় ব্যর্থতার পথে পা বাড়িয়ে দেয়; এই কারণেই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বার্ণার্ডশ আমাদের নির্ঠুরভাবে হতাশ করেন, ডি. এইচ্, লরেন্সের মতো শক্তিমান লেখককেও পশ্চাদপসরণ করতে হয় এবং বাংলা সাহিত্য 'কল্লোল গোষ্ঠী' বিপুল বিদ্রোহের প্রতিশ্রুতি এনে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী শিল্প হিসেবে কিছুই আমাদের দিয়ে যেতে পারেন না।" ১

এ ক্রান্তিকালে মধ্যবিত্তই লেখক-শিল্পী। মধ্যবিত্তের কলমে বিপ্লবের চেতনা-চিন্তা। আবার মধ্যবিত্তই, শুধু বিত্ত ব্যাপারে নয়, চিত্ত-ব্যাপারেও মধ্য। শ্রমিক কৃষকের জীবনের শরিক হওয়া এখুনি তার পক্ষে সম্ভব নয়। আত্ম শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান,

১. মার্ক্সবাদী সাহিত্য বিতর্ক | ধনঞ্জয় দাশ | ৩য় খণ্ড নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | পৃঃ ১৫২

আবার সর্বহারার জন্য শুদ্ধ আবেগ—ভিন্ন এই দুই মানসিকতায় অবিরাম দোল খেতে খেতে আর ধনবাদী নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতায় বিক্ষত হতে হতে, রিক্ত হতে হতে মধ্যবিত্ত ক্রমে শ্রেণীহীন হবে। তখন সর্বহারা জীবনের সুফলা সম্ভাবনা একটু একটু ক'রে আরো উপযুক্ত হবে। মধ্যবিত্তই এ চেতনার সচেতক হবে। মধ্যবিত্তের হাতেই গড়ে উঠবে শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামী জনমত।

"সেই সঙ্গে একটা জিজ্ঞাসা জাগে: প্রগতিশীল সাহিত্যকে ধিক্কার দিতে গিয়ে আমরা মুখোশ আঁটা Leftism—এর খপ্পরে গিয়ে পড়ছি না তো? প্রতি বিপ্লবকে ঠেকাতে গিয়ে পা দিচ্ছি না তো অতি-বিপ্লবের চোরাবালিতে? ঐতিহাসিক সত্যের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে বস্তুতান্ত্রিক বৈপ্লবিক অগ্রগমন—এই হলো আজকের সাহিত্যের মূলকথা: ইতিহাসের ধারাকে লক্ষ্য করে, শিল্প নৈপুণ্যের মাধ্যমে কর্মী মানুষের আদর্শগত পরিবর্তণ সাধন করতে হবে। এই সৃষ্টি হবে সত্য এবং বাস্তবাশ্রয়ী-এর পরিণাম হবে সাম্যবাদ।" ১

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথার সূত্র ধরে বলা চলে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে মধ্যবিত্তের জীবন এখনো বিষয়বস্তু হয়ে থাকলেও তা যে ক্রমান্বয়ে সর্বহারা মানুষের জীবন বৃত্তান্তের গা-ঘেঁসা হয়ে মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিক-কৃষকের জীবনকে আলাদা আলাদা না দেখে অঙ্গাঙ্গী করে দেখার সচেতনতা সৃষ্টি করবে, সমাজভাবের সেই পুষ্টির প্রতিশ্রুতি রয়েছে একালের প্রগতি সাহিত্য কর্মে।

"... ...গোর্কী বলেছেন, সাহিত্যিককে শিক্ষক হতে হবে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তা বাস্তবজিত শিল্পহীন নিছক প্রচারণা মাত্র।

... ...বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত চাকরির যে সূক্ষ্ম সূত্রটিতে দোদুল্যমান, সেই সূত্রটি ছিঁড়ে গেলেই দেখি সে কত সহজে তার সামান্য জোত-জমা ক্ষেত-খামারের মধ্য দিয়ে বাঙালী কৃষকের কাছাকাছি পৌঁচেছে। মাও-সে তুংয়ের 'নতুন গণতন্ত্র'-কে যদি আমরা revised out look হিসেবে মেনে নিয়ে থাকি, তবে এই স্বল্পায়ী ভূমি—আশ্রয়ীদের নিশ্চয়ই আমরা 'কুলাক' বলব না। বাঙালী সামান্য বৈতনিক কেরানী, সামান্য ভাড়া দিয়ে অন্ধকার একতলা ঘরে যার বসবাস এবং চাকরি গেলেই যাকে পথে দাঁড়াতে হয়, তাঁর সঙ্গে প্রোলেটারিয়েটের তফাৎ কতখানি? মাসের শেষে যার আপিসের দারোয়ানের কাছে ধার করতে হয়, যার প্রভাতী-বৈতালিক কাবুলীওয়ালা—কী তার শিক্ষা এবং সংস্কৃতিগত আভিজাত্যের মূল্য? দুর্ভিক্ষে যারা মরেছে

১. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক | ৩য় খণ্ড | ধনঞ্জয় দাশ | পৃঃ ১৫৩ | দ্রষ্টব্য প্রতিবিপ্লবী সাহিত্য: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

,যাদের স্ত্রী-কন্যা মিলিটারী আর কালোবাবাজারী দালালের কাছ থেকে এক মুঠো অন্নের জন্য দেহের পণ্য সাজিয়েছে, তাদের মধ্য থেকে মধ্যবিত্ত আর কৃষককে খুব বেশী করে আমরা আলাদা করে নিতে পারি না। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেকে কলকারিখানার মজুর হতে সামান্যই সময় লাগে। .....এ সত্ত্বেও কেন এমন কথা শোনা যায় যে, মধ্যবিত্ত জীবন আর গণসাহিত্যের আশ্রয় নয়? একথা বলার অর্থই বস্তুনিষ্ঠার বিরোধিতা করা-সামন্ততান্ত্রিক বস্তুবাদের একটি প্রধান সত্যকে অস্বীকার করা।"২

মানসিক দোলাচলতা আর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারলে মধ্যবিত্ত সমাজ, শ্রমিক-কৃষকের কাজ থেকে খুব দূরের নয়। বেকারী, ধনীর অবজ্ঞা কিংবা নেতৃবর্গের বিরাট প্রবঞ্চনার আঘাতপিষ্ট হচ্ছে মুমূর্ষু সাধারণের দলে ক্রমশ মিশে যায় এরা। প্রগতিপন্থী কবির রচনায় সেই ব্যবধান-দূর-করা জনমত সংগঠনের বানী। এই চেতন-সম্পদই গণ-সাহিত্যের মূলধন।

"প্রশ্ন জাগে বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের লেখক কারা পাঠকই বা কে? উত্তর অত্যন্ত সহজ। লেখকেরা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত; পাঠকেরাও তাই। .... মধ্যবিত্ত লেখক লেখে, মধ্যবিত্ত পাঠক পড়ে। তাই বলে একথা বলা উদ্দেশ্য নয় যে মজদুর-কিষাণকে বাদ দিয়ে আজ শুধু মধ্যবিত্তদের জন্যই সাহিত্য সৃষ্টি হোক। আমাদের লেখা হয়তো গণমানসের কাছে পৌঁছোয় না, হয়তো আমাদের ভাষা ও প্রকাশ তাদের কাছে দুর্বোধ্য-বিশেষ করে বাংলার অধিকাংশ শ্রমিকই যখন অবাঙ্গালী। তবুও এদের আশ্রয় করে গণসাহিত্য আমাদের রচনা করে যেতেই হবে। সে সাহিত্য যাদের নিয়ে লেখা, তাদের কাছে কতটা পৌঁছবে সেজন্য বিচলিত হয়ে নয় লিখতে হবে দেশের এই বিদ্রোহী সর্বহারা শক্তি সম্পর্কে মধ্যবিত্তকে সচেতন করে তোলার জন্যই।"১

কবি সমালোচক মোহিত লাল মজুমদারের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।

"আজ যখন সমগ্রমানব সমাজে জীবন ধারনের সঙ্কট ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে— তখন ঐ আর্ট-প্রধান সাহিত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনাই স্বাভাবিক— .....আজ এতদিন পরে সাহিত্যের সম্পর্কে ঐযে জীবন কথাটা বারবার উত্থাপিত হয় আগে তাহা হইত না, তার কারণ তখন উহা সাহিত্যে-ভালে বাতাসের মতই ব্যাপ্ত হইয়া থাকিত।"২

প্রকাশক: বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রা: লি: ১২, মহাত্মা গান্ধী রোড—৯।

১* মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক | ৩য় খণ্ড | ধনঞ্জয় দাশ | পৃ: ১৫৫ | দ্রষ্টব্য প্রতি-বিপ্লবী সাহিত্যে-নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

২* মোহিতলাল মজুমদার। সাহিত্য বিচার | পৃ: ১১৮ | ১ম সং ১৩৫৪ |

মন্তব্য থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে বর্তমান কালের প্রয়োজন সাহিত্যে জীবনের প্রকাশ জরুরী হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র নাথ ও এই সব হতভাগ্যদের জন্য ভেবেছেন, সাহিত্যে তার নিদর্শনও রেখেছেন। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিতে কবির অকপট স্বীকারোক্তি ;

ক/১* আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

২* সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয়, নকল সে সৌখিন মজদুরি।
এসো কবি, অখ্যাতজনের/নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার
প্রাণিহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করে দাও তুমি।

৩* তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনার খ্যাতি—
আমি বারংবার/তোমারে করিব নমস্কার।

(ঐকতান : জন্মদিনে)

সাম্রাজ্যবাদীদের নির্যাতন এবং স্বদেশবাসীর আমারণ সত্যাগ্রহ-এ সবই রবীন্দ্রনাথের চোখে দেখা ঘটনা। রাজনৈতিক সংঘর্ষের অপর পিঠে যে সব অখ্যাতজন মাথা কুটে মরে, তাদের জন্য কবির মনোকষ্ট তাঁকে অহরহ পীড়িত করেছিল। কবিমনের সেই ব্যথা ফুটেছিল 'গান্ধী মহারাজ' এ :

খ* গান্ধী মহারাজের শিষ্য/কেউ বা ধনী, কেউবা নিঃস্ব,
এক জায়গায় আছে মোদের মিল/গরিব মেরে ভরাই নে পেট—
ধনীর কাছে হইনে তো হেঁট,/আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।

(গান্ধী মহারাজ : ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪০/ঐ)

রবীন্দ্রনাথের 'মাধো' কবিতাটি তাঁর সংবেদনশীল মনের আর একটি দুর্লভ দৃষ্টান্ত।

অত্যাচারী রায়বাহাদুর কিষণলালের ঘৃণ্য চরিত্রের পরিচয় চিত্রিত হয়েছে। সম্ভ্রান্তের সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও কবি স্বাধীন চিন্তার কথা কবিতায় তুলে ধরতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। পাটকলের সাহেব দ্বিতীয় শ্রেনীর ধনিক শ্রেনীরই প্রতীক। শ্রমিকরা তার হীন—চক্রান্তের শিকার। নির্যাতন মাথায় নিয়ে দারিদ্র্য উপেক্ষা করে আত্মসম্মানবোধে উদ্বুদ্ধ বিদ্রোহি শ্রমিক সর্দ্দার মাধো অপমানের অন্ন গ্রহন করবে না বলে চাকরী পর্যন্ত ছেড়ে দিল। কবির মানব দরদই এই বলিষ্ঠ বৃত্তান্তের উৎস :

১/ক॰ দলের সঙ্গে যোগ দিলে শেষ মরবি-যে মার খেয়ে।"
মাধো বললে, "মরাই ভালো এ বেইমানির চেয়ে।"
খ॰ মাধো বললে, "সাহেব, আমি বিদায় নিলেম কাজে,
অপমানের অন্ন আমার সহ্য হবে না যে।"
(মাধো : ছড়ার ছবি)

মানুষে, মানুষে ব্যবধান, সুকান্তকেও নিয়ত উত্তাক্ত করেছে। এ তাঁর স্বপ্ন দর্শন নয়। 'মৃত্যুকীর্ণ শবে পঞ্চাশ সাল' —কে ভরতে দেখেছেন। 'চারাগাছ' কবিতায় তার সংকেত। ভাঙা কুঁড়ে ঘর থেকে পাশের প্রাসাদের দূরত্ব তা কবি প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত। তাই গণমুক্তির তাগিদ তাঁর অন্তরে। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের চিন্তাধারার আলোকে সুক'ন্তের সৃষ্টি স্পৃহার অন্তরাল :

"..... প্রোলেটারিয়েট সাহিত্যে কেবল বাস্তব ঘটনার চিত্র থাকিবে না। Art for Art's Sake বলিয়া একটি কথার মূল্য নাই, "আর্ট কিছুর জন্য" (Art for something's sake) ইহাই হইতেছে বৈজ্ঞানিক সত্য। এই জন্য প্রোলেটারিয়েট সাহিত্য যখন নূতন জীবনের কথা বলিবে, তখন নূতন শিল্পের রস ও রূপে থাকিবে, রোমান্স ইত্যাদিও থাকিবে, কিন্তু সকল দ্রব্যেরই নূতন মূল্য প্রদত্ত হইবে।"[১০] সেই কারণেই সচকিত কবির দৃষ্টিতে ভেসে উঠে :

পঁয়ত্রিশ* চেয়ে চেয়ে দেখি আর মনে মনে ভাবি—
এ অট্টালিকার প্রতি ইঁটের হৃদয়ে
অনেক কাহিনী আছে অত্যন্ত গোপনে/ঘামের রক্তের আর চোখের জলের।
(চারাগাছ : ছাড়পত্র)

বিশ্বমানব-কর্মীর অপমানিত শ্রমের ইতিহাস-চেতনা কবির মনে। রবীন্দ্রনাথের 'ওরা কাজ করে' কবিতা প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়। 'আরোগ্য' কাব্যের 'দশ সংখ্যক' এই কবিতায় সাধারণ লোকের কর্মে বিপুল গুরুত্ব অনুভব করেছেন কবির ওরা'

১০ মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক | ৩য় খণ্ড | ধনঞ্জয় দাশ | পৃঃ ৩৭ | দ্রঃ

তাঁর পরিচিত শ্রমজীবী মানুষ। এদের নগণ্য পরিচয় হলো, কেউ হাল ধরে থাকে, কেউ মাঠে বীজ বোনে, কেউ ধান কাটে। তুচ্ছ, ক্ষুদ্র হয়েও 'ওরা' সমাজের অগ্রগতিকে অব্যাহত রেখেছে। কবি স্পষ্ট করে চিনিয়ে দিয়েছেন:

ক/১. ওরা কাজ করে / নগরে প্রান্তরে।

২. ওরা কাজ করে / দেশে দেশান্তরে

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে

পঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।

৩. শত শত সাম্রাজের ভগ্নশেষ করে / ওরা কাজ করে।

(ওরা কাজ করে: আরোগ্য)

সমগ্র কবি জীবনের একটা বিরাট চ্যালেঞ্জের ভিতর থেকে মুক্ত আবেদন। আরো একটু এগিয়ে, হৃদয়ের ক্ষোভ-সঞ্জাত ব্যথায় কাতর হয়ে সুকান্ত ভাবে, পদদলিত মানুষগুলোর কথা। দাসত্বের জ্বালার ভিতর এরা কি করে সেলাম জানায়। অধস্তন-মানুষের কবি তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে 'চারাগাছ' কবিতায় বলেন:

ছত্রিশ. আমি তাই এ প্রাসাদে এতকাল ঐশ্বর্য দেখেছি

দেখেছি উদ্ধত এক বনিয়াদী কীর্তির মহিমা।

আবার সেই প্রাসাদের কার্নিশের ধারে অশ্বত্থের চারা। কবির বিশ্বাস, কষ্টে বর্দ্ধিত এই চারাগাছটিই একদিন মহীরুহরূপে চরম প্রতিশোধ নেবে। প্রসঙ্গত বলি, অশ্বত্থের ভিতর দীর্ঘস্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত রূপ, {ন=অ (অবিরোধে)=শ্ব (চিরকাল) স্থা (থাকা) অ (র্তৃ, জ্ঞা)}। অর্থ হল, যে বৃক্ষ বহুকাল অবিরোধে বেঁচে থাকে প্রাসাদের প্রতিস্পর্ধী হয়ে অশ্বত্থ গণ এবং গণজীবনের তোলন শক্তি পরীক্ষার প্রতীকরূপ ধরেছে। কবির চোখে-দেখা ছবিই এখানে বিরুদ্ধ প্রতীক। তথাপি অশ্বত্থে নিহিত সেই বিপুল প্রাণশক্তির প্রসঙ্গও এখানে মনে না পড়ার কথা নয়। *

মানুষের ইতিহাস থেকে পাওয়া কবির সেই মন্ত্রীবাণী:

সাইত্রিশ. মনে হয় এই সব অশ্বত্থ-শিশুর

রক্তের, ঘামের আর চোখের জলের

ধারায় ধারায় জন্ম, / ওরা তাই বিদ্রোহের দূত।

বাক প্রতিমাটি আশ্চর্য সম্ভাবনাময় শুভদিনের বার্ত্তা। গণজীবনের জন্য

---

*. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। বাঙ্গালা ভাষার অভিধান। পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ। দি ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। কলকাতা।

সুকান্তের মনঃকষ্টের জগত ব্যাপী বেদনা। উপশমের একমাত্র উপায় ঐ অশ্বত্থ শিশু। সমগ্র গণজীবন যেখানে লাঞ্ছনায় কাতর সেখানে ব্যষ্টির অহং-এর খেলাঘরে ফাটল ধরবেই। সুগভীর বিশ্বাস থেকে সুকান্তের এই প্রত্যয়ের জন্ম। পুরাতন সম্মোহ সংস্কার নিদারুণ যন্ত্রণার দাতে নিশ্চিহ্ন হতে বাধ্য। তাঁর সাম্যবাদী মনের কথা সত্য হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের স্বীকৃতি তাঁর কবিতায়। জীবনের যে বিশেষ সমস্যা সকলের সমস্যা হয়ে একই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, সেখানেই কবির আত্মীয়বোধের সঠিক পরিচয়। এই বোধ কোন রাজনৈতিক মতবাদ থেকে আমদানী করা হলেও মূলে তা সর্বকালের সর্বজনের মর্মমুকুরে, দেশ, কাল অতিক্রম করা হৃদয় বার্ত্তা। বৈপ্লবিক এই উত্তরাধিকার সুকান্তের জীবন নিষ্ঠ কাব্যের স্বরূপ।

এ আদর্শ সুকান্তের রক্তময় ছড়ানো বলেই নির্ভীক কবি 'খবর' কবিতায় গণজীবনে বুর্জোয়া-বিরোধী সঙ্ঘবদ্ধ জাগরণ অনিবার্য করে তুলতে বদ্ধপরিকর। তিনি খবর পেয়েছেন 'বিনিদ্র চোখ আর উৎকর্ণ কানের'। 'পৃথিবী মুক্ত-জনগণ চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়ী'। স্তালিনগ্রাদের প্রতিরোধ, 'মহাত্মাজীর মুক্তিতে', প্যারিসের অভ্যুত্থানে, খবর আগুনের হল্কার মতো শোকযাত্রার মিছিলে ছড়িয়ে পড়তে দেখেন কবি। মধ্যরাত্রির অন্ধকারে তাঁর কাছে এ খবর নিশ্চিত পৌঁছে যায়। সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ভর করে খবর দেন তিনি:

আটত্রিশ কিন্তু মনে রেখো, তোমাদের আগেই আমরা খবর পাই/
মধ্যরাত্রির অন্ধকারে / তোমাদের তন্দ্রার অগোচরেও।
তাই তোমাদের আগেই খবর-পরীরা এসেছে আমাদের
চেতনার পথ বেয়ে
আমার হৃদ্‌যন্ত্রে ঘা লেগে বেজে উঠেছে কয়েকটি কথা—
পৃথিবী মুক্ত—জনগণ চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়ী। / (খবর ছাড়পত্র)

তন্ময়তায় আবদ্ধ না থেকে শক্তি, সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য সুকান্ত অনন্ত শক্তির আধার 'সূর্যদেবের' কাছে প্রার্থী হয়েছেন। সূর্যের উত্তাপ দরকার, 'সাঁত সেঁতে ভিজে ঘরে, যাদের জীবন কাটে, সেই সব হতভাগ্যদের জন্য। 'সকালের এক টুকরো রোদ্দুর, এক টুকরো সোনার, চেয়েও কবির কাছে 'মনে হয় দামী'। তাই নিঃসঙ্কোচে সুকান্ত উচ্চারণ করলেন, তাঁর নতুন বোধের কথা:

উনচল্লিশ তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জলন্ত অগ্নিপিণ্ডে

পরিণত হব!
তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা
তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারবো
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
আজ কিন্তু আমরা তোমার অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী ॥

(প্রার্থী : ছাড়পত্র)

"একটি মোরগের কাহিনী" কবিতায় কবি সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর সেই আন্তরিকতার পরিচয় দিলেন। সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে এই সহমর্মিতা আশাব্যঞ্জক। অসহায় মোরগের খাবার সংগ্রহের পথে আত্ম-ত্যাগের কথা-রূপক মনুষ্য সমাজের শোচনীয় মৃত্যুর খবরকে স্মরণ কারায়।

'মোরগ' যেমন 'প্রাসাদের ভিতর রাশি রাশি খাবার' খেতে এসে মরণকে বরণ করে নেয়, সুকান্তও তেমনই এই পৃথিবীতে দেখছেন, শোষকশ্রেনীর সুপরিকল্পিত কৌশলের হাড়িকাঠে ছন্নছাড়া অগুণতি জীবন যুগ-যুগ ধরে বলি হচ্ছে। এ মর্মান্তিক উপলব্ধি সুকান্তকে দুঃখ জয়ের রাজনীতি শিখতে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি 'সিঁড়ি'-র সঙ্গে নিজেকেও তুলনা করেছেন, নিছক কৌতূহল বশে নয়। বোবা যন্ত্রণাকে অন্তরে সযত্নে রেখেই বিদ্রোহের তূর্যনাদে তিনি সবার নিদ্রা ভাঙিয়ে দিয়েছেন। মেহনতী জনতাকে সংগ্রামের জোয়ারে জীবনের জয়গানের ইন্ধন যোগান এবং আত্ম প্রতিষ্ঠার মনোবল সৃষ্টি করেন:

চল্লিশ. চিরকাল আর পৃথিবীর কাছে / চাপা থাকবে না
আমাদের দেহে তোমাদের এই পদাঘাত।

(সিঁড়ি : ছাড়পত্র)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সিঁড়ি' এখানে স্মরণ যোগ্য :

কিন্তু তুই অনেক উর্ধ্বে, যেখানে আর নামার সিঁড়ি নেই ....
যে মই বেয়ে উঠেছিলি, এমনই তার কঠিন শত্রুতা।'

(সিঁড়ি : মুখে যদি রক্ত ওঠে)

মূলধনের পাহাড় গড়ে সামন্তবাদ ধ্বংসের প্রয়াস বুর্জোয়াদের উদ্দীপ্ত করুক। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাওয়া মানুষদের গৃহে ফাটল ধরাবেই গজিয়ে-ওঠা অশ্বত্থ-বৃক্ষের সেই চারা। শিকড়ে শিকড়ে ইমারত বিদীর্ণ করার গোপন শক্তি কবির জানা আছে। এই ঐতিহাসিক সত্যের মধ্যেই মানবপ্রেমের মূলতত্ত্ব। তাই কবির-কলম বন্দনা। 'কলম' তুমি কত না যুগ কত না কাল ধরে/অক্ষরে অক্ষরে/গিয়েছ

শুধু ক্লান্তিহীন কাহিনী শুরু করে/.... তুমি চেষ্টা কর, দাঁড়াতে পার কিনা/....তুমি কত ইতিহাস গিয়েছ লিখে/লিখে শুধু ছড়িয়ে দিয়েছ চতুর্দিকে।

নির্ভয় কণ্ঠে কবি তাই সেনাপতির মতো যুদ্ধের নির্দেশ দিচ্ছেন :

একচল্লিশ. কলম! বিদ্রোহ আজ! দল বেঁধে ধর্মঘট করো।
লেখক স্তম্ভিত হোক, কেরানীরা ছেড়ে দিক হাঁফ,
মহাজনী বন্ধ হোক, বন্ধ হোক মজুতের পাপ;
উদ্বেগ—আকুল হোক প্রিয়া যত দূর দূর দেশে,
কলম! বিদ্রোহ আজ, ধর্মঘট হোক অবশেষে;

(কলম : ছাড়পত্র)

যথার্থ গণ-প্রেমিকই গণ-নায়ক। সেই গণ-নায়ক-ঘোষকের সঠিক 'ঠিকানা' নবতকের কাছে, ক্ষুব্ধ স্বদেশে রক্তের অক্ষরে প্রত্যেকের ঘরে গচ্ছিত। সমাজ জীবনের সঙ্গে একাত্ম বলেই জন-সংশ্রব থেকে তাঁকে আলাদা ভাবা যায় না। যাঁরা ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে বিফল মনোরথ, তাঁদের উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন :

বিয়াল্লিশ. ক/১. ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া
রুশ ও চীনের কাছে, / আমার ঠিকানা বহুকাল ধরে
জেনো গচ্ছিত আছে।

২. বন্ধু, তোমার ভুল হয় কেন এত ?
আর কতদিন চক্ষু কচ্লাবে,
জালিয়ানওয়ালায় যে পথের শুরু
যে পথে আমাকে পাবে,
জালালাবাদের পথ ধরে ভাই / ধর্মতলার পরে
দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে
ক্ষুব্ধ এদেশে রক্তের অক্ষরে।

৩. ঠিকানা রইলো,
এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা করো॥

(ঠিকানা : ছাড়পত্র)

বিশ্ব জনস্রোতে 'লেনিন' একদিন অন্যায়ের বাঁধ ভেঙেছেন তাঁর নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে বলশেভিকরা যুদ্ধ-বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। তারা মনে করে ধনতন্ত্রের শেকড় উপড়াতে না পারলে সমাজতন্ত্রের কথা ভাবা দায়। কারণ ধনতন্ত্র প্রেমিকদের সাম্রাজ্য বিস্তার যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করে :

'The slogan down with war ! is, of course, a correct one. .....The war is not a product of the evel will of rapacious capitalists although it is undoubtedly being fought 'only' in their interests and they alone are being enriched by it.

..... It is impossible to escape to achive a democratic, non-oppressive peace without the overthrow of the power capital and the transfer of state power to another class, the poletariet.

.....The Russian revolution of February-March 1917 was the beginning of the transformation of the imperialist war into a civil war ....."1

ভারতেও বিভ্রান্ত জনসাধারণের মাঝে ঐরূপ শক্তিধর পুরুষের বড় প্রয়োজন। লেনিনীয় চেতনা সুকান্তকে অনুপ্রাণিত করে। মানুষকে শোষণ থেকে মুক্ত করার সংগ্রামী মানসিকতা সুকান্তের। তাই তাঁর বিশ্বাস-'লেনিন সমৃদ্ধ হয় সম্ভাবিত উর্বর অর্থরে' সেই কারণেই, 'ইতালি, জার্মান, জাপ, ইংলণ্ড, আমেরিকা চীন/যেখানে মুক্তির যুদ্ধ সেখানেই কমরেড লেনিন'।

সুকান্ত জানেন :

তেতাল্লিশ ক/১* অন্ধকার ভারতবর্ষ : বুভুক্ষায় পথে মৃত দেহ—
অনৈক্যের চোরাবালি ; পরস্পর অযথা সন্দেহ ;
দরজায় চিহ্নিত নিত্য শত্রুর উদ্ধত পদাঘাত
অদৃষ্ট ভর্ৎসনা-ক্লান্ত কাটে দিন, বিমর্ষ রাত
বিদেশী শৃঙ্খলে পিষ্ট, শ্বাস তার ক্রমাগত ক্ষীণ—
এখানেও আয়োজন পূর্ণ করে নিঃশব্দে লেনিন।

২* লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ,
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন।

(লেনিন : ছাড়পত্র)

আত্মার অবমাননায় সুকান্ত বিচলিত। প্রতীকাশ্রয়ী 'সিগারেট' অথবা 'দেশলাই কাঠি' কবিতার মধ্য দিয়ে আগামী কর্মসূচী ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন :

চুয়াল্লিশ* আর কতকাল আমরা নিঃশব্দে ডাকব

1. V. I. Lenin | Selected works—Vol. II | Moscow Progress-Pub Soviet union | P.P. 32-33

আয়ু-হরণকারী তিল তিল অপঘাতকে ?
দিন আর রাত্রি-রাত্রি আর দিন ;
তোমরা আমাদের শোষণ করছ সর্বক্ষণ—
আমাদের বিশ্রাম নেই, মজুরি নেই—
নেই কোনো অল্প-মাত্রার ছুটি। (সিগারেট : ছাড়পত্র)

কিংবা পঁয়তাল্লিশ. আমাদের কী অসীম শক্তি
তা তো অনুভব করেছ বারং বার ; /তবু কেন বোঝ না,
আমরা বন্দী থাকব না তোমাদের পকেটে পকেটে,
আমরা বেরিয়ে পড়ব, আমরা ছড়িয়ে পড়ব
শহরে, গঞ্জে, গ্রামে—দিগন্ত থেকে দিগন্তে।
(দেশলাই কাঠি : ছাড়পত্র)

প্রচারধর্মী কবিরূপে সুকান্তকে কেউ সমালোচনা করতে পারেন, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী বাস্তব বোধ তাঁর শিল্পীমনকে গোটা সমাজব্যবস্থার বিপক্ষে দাঁড়াতে বাধ্য করে। সুন্দরকে বিকৃত করে নয়, জীবন বোধের কড়া তাগিদে তাকে জীবন্ত করে তোলাই শিল্প। এই গণমুখী অনুভব সৌন্দর্যের শত্রু নয়। অন্নদাশংকর রায়ের (লীলাময় রায়' ছদ্মনামে) 'সৈনিক' — কবিতায় সেই সত্য :

ইজমে কী আসে যায়। আমি চাই একান্ত সৈনিক।
লক্ষ্য যদি এক হয় উপলক্ষ্য হোক না শতেক।
একই হৃদয়ে মেলে শিরা আর ধমনী যতেক।
দেশ যদি অন্তরেই দ্বেষ কেন হবে আন্তরিক।
হে অশান্ত, করো মনস্থির। আগে আপনার মনে
জয়ী হও নীতি আর মত্ততার নিত্যতন রণে।

সমকালীন ঘটনা— পরিস্থিতির টানেই সুকান্ত গণ-কবি। তাঁর সেই পরিণতি 'বিবৃতি' কবিতা। সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর .... হিংস্র আক্রমণ', দেশদ্রোহী ঘাতক— প্রভৃতি দর্শন থেকেই গণ জীবনের প্রতি তাঁর নিবিড় আকর্ষন। কবির আত্মপ্রত্যয়— 'আমার বিধ্বস্ত প্রাণে দৃঢ়তার এসেছে নির্দেশ।' তা পালন করার জন্য সুকান্ত বলেন :

'বিপন্ন পৃথ্বীর আজ শুনি শেষ মুহুর্মুহু ডাক'। সেজন্য তিনি সদাজাগ্রত, প্রস্তুত।
'আমাদের দৃপ্ত মুঠি আজ তার উত্তর পাঠক।'

দেশের এই অরাজক অবস্থা দেখে কবি বীরেন্দ্র চ.ট্টোপাধ্যায়ও ক্ষুব্ধ :

'আমার বুকের মধ্যে সে আগুন, ভয়ঙ্কর সে আগুন

রাখতে পারছি না।'

(অক্ষমতা : মুখে যদি রক্ত ওঠে)

সুকান্তের লেনিন হবার বাসনার মতো সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরও সৈনিক হবার সাধ। 'আর্ষ'— কবিতায়

ভিড় গ্রস্ত তরণীতে ভারগ্রস্ত আমি
সংসার সমুদ্রে হালে পাই নাই কোন পানি।
তাই এই কৃষ্ণপক্ষে উপবাসী প্রার্থনা জানাই
আমাকে সৈনিক করো তোমাদের কুরুক্ষেত্রে ভাই।

(আর্ষ : পদাতিক)

১৯৪০—১৯৪৬—এর দেশের পতনোন্মুখ রূপ দেখে বিস্ময়ের সুরে সুকান্ত বলেছেন, 'দেখি এই দেশে অন্ন নেইকো কারো / দেখি এই দেশে মৃত্যুর কারবার / বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে'। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কবির 'অনুভব'—এর দলিল। সুকান্তের বিশ্বাস 'প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত', তাদের তিনি নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন 'সবেগে সমুদ্যত'। কারণ তিনি তো অঙ্গীকার করেছেন,—

ছেচল্লিশ. তাদেরই দলের পেছনে আমিও আছি
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি—বাঁচি।

(অনুভব, ১৯৪৬ : ছাড়পত্র)

সুকান্তের এই গণ-প্রেমের উৎসস্থল স্বদেশ। এর ভূমিতেই তাঁর আবির্ভাব, এর দেহরসেই তার প্রাণের বৃদ্ধি। পূর্বপুরুষের রক্তধারা তাঁর দেহের কানায় কানায়। সেই ঐতিহ্য রক্ষায় দৃঢ়পণ কবির 'মণিপুর' কবিতা :

সাতচল্লিশ. এ আকাশ, এদিগন্ত, এই মাঠ স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়ামাটি,
সহস্র বছর ধ'রে একে আমি জানি পরিপাটি'
জানি এ আমার দেশ, অজস্র ঐতিহ্য দিয়ে ঘেরা,
এখানে আমার রক্তে বেঁচে আছে পূর্বপুরুষেরা।

(মণিপুর : ঘুম নেই)

স্যার ওয়াল্টার স্কটের কবিতায় দেশাত্ম প্রেমের এই উচ্চরব :

1. a) This is my own, my native land!
Whose heart hath ne'er Within him burn'd,
As home his footsteps he hath turn'd,
From wande·ing on a fore'gn strand?

Is such there breathe, go mark him well,
For him no minstrel raptures swell;
b) Living, shall forfeit fair renown,
And, doubly dying, shall go down
Is the vile dust, from whence he sprung,
Unwept, unhonour'd, and unsung."

(Breathes there the man with soul so dead)
: The Lay of the last Minittrel (1805)

মূলত উপন্যাসিক হলেও দেশপ্রেমিক স্কটের প্রাণে ছিল এই কাব্যানুভূতি। তাঁর বিশ্বাস স্বদেশের প্রতি যে প্রেমহীন, তার জীবনে মৃত্যু দু'ভাবে আসে। একটি আত্মিক; অপরটি জৈবিক। দেশের প্রতি উদাসীনতার ফলে ব্যক্তির জীবৎকালেই হৃদয়ের মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যু আত্মিক। আর যেদিন দেহের বিনাশ হবে সেদিন তার জৈবিক মৃত্যু। এইভাবে মৃত্যু জীবনকে ব্যর্থ করে দেয়—দেশবাসী অস্বীকার করে তার অস্তিত্বের মূল্য।

সংসারে স্বার্থ বাদ দিয়ে প্রেমের অস্তিত্ব নেই। তবে স্বার্থ শব্দটির বিকৃত অর্থের সঙ্গেই আমাদের পরিচয়। কিন্তু সুকান্তের মনুষ্য প্রেম সেই কদর্থ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর সমাজ-সচেতন মন নিঃশব্দে দশের কল্যাণের চিন্তায় মগ্ন। ঘরে বৈরী রেখে সুন্দর জীবন গড়ে তোলা কঠিন। তাই স্বার্থপরতার উর্দ্ধে সুকান্তের উত্তেজিত স্বর। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা যেন সুকান্তের মনের কথায় সরব, সাম্রাদের মোকাবিলায় প্রস্তুত :

ক/১. আমাদের চোখে জল ছিল / এখন আগুন।
২. গ্রাম খালি করে আমরা আসছি। / খালি হাতে ফিরব না॥

(আগুনের ফুল : ফুল ফুটুক)

সুকান্তের উপস্থিতি শেষ পর্যন্ত ইতিহাস রচনা করে 'ঐতিহাসিক'—কবিতায়। 'সোভিয়েত পোল্যাণ্ড, যাদ রক্তমূল্যে মুক্তি ক্রয় করেছে। কবি চান সেই সত্য প্রতিষ্ঠিত হক বাংলায় তথা ভারতেও :

আটচল্লিশ. আমি ইতিহাস আমার কথাটা একবার ভেবে দেখো,
মনে রেখো, দেরি হয়ে গেছে, অনেক অনেক দেরি।

(ঐতিহাসিক : ছাড়পত্র)

'বোধন' কবিতায় যাত্রাশুরুর আয়োজন করে বিপ্লবে সামিল হতে ঈশ্‌তেহার

জারি করেন সুকান্ত :

উনপঞ্চাশ* ক/১* হে মহামানব, একবার এসো ফিরে
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরের ভিড়ে
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বারবার
লোক চক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।
২* মারী ও মড়ক, মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যার
আঘাতে আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন ভাঙা নৌকার পাল,
এখানে চরম দুঃখ কেটেছে সর্বনাশের খাল.
ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটিতে জমেছে নির্জনতার কালো
হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।
(বোধন : ছাড়পত্র)

'স্বজনহারানো শ্মশানে,' প্রতিশোধের উন্মত্ত দামামা বাজিয়ে জীবন হননকারীর সর্বনাশকে বাস্তবিক করে তুলতে কবির এই চ্যালেঞ্জ। রেনেসাঁর যুগে মানবতার জয় অবশ্যম্ভাবী। অন্ধকারকে অতিক্রম করেই আলোর রাজ্যে পৌঁছতে হবে। এই শুভবার্তা মেহনতী মানুষের শরিক 'রানার' বয়ে নিয়ে যাবে। প্রগতিধর্মী এ কবিতায় গণমুক্তির আশা ধ্বনিত। মানুষের উত্থান পতনের পূর্বাপর কাহিনীই ইতিহাস। কবির ভাষায় 'রানার' সেই দুর্দম দৃষ্টান্ত। তাই ডাক বিভাগীয় এক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর চলার গতিকে প্রেরণা দিয়ে উত্তাল করে তোলেন কবি :

পঞ্চাশ* রানার ! রানার ! ভোর তো হয়েছে-আকাশ হয়েছে লাল,
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল ?
রানার ! গ্রামের রানার !/সময় হয়েছে নতুন খবর আনার ;
শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ/ভীরুতা পিছনে ফেলে—
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর/অগ্রগতির 'মেলে',
(রানার : ছাড়পত্র)

'মায়াকোভস্কীর, দৃষ্টি জ্বালে একই সত্যের প্রত্যুত্তর :

This is time/humming taut
as a telegraph wire /my heart/
alone/with the truth/
whole and sole,/This happend/
with our fighters/with the land entire,

in the depth too/of my own soul,

(Fine : October poem)

প্রচণ্ড বিবেক বোধ তাই সামাজিক কর্ত্তব্যপালনে কবিকে অধীর করে। জনসমাজের জীবনযাত্রার হালচাল দেখে তিনি বেদনা হত। 'অনন্যোপায়' কবিতায় তারই প্রত্যক্ষ রূপ :

একান্ন ১./ক. অনেক গড়ার চেষ্টা ব্যর্থ হল, ব্যর্থ উদ্যম আমার,
নদীতে জেলেরা ব্যর্থ, তাঁতী ঘরে, নিঃশব্দ কামার,
অর্ধেক প্রাসাদ তৈরী, বন্ধ ছাদ-পেটানোর গান,
চাষীর লাঙল ব্যর্থ, মাঠে নেই পরিপূর্ণ ধান।

(অনন্যোপায় : ঘুম নেই)

শক্তি-প্রার্থী পি, বি শেলীর দুঃসাহসিক আবেদন কত আন্তরিক :

1 a) O, lift me as a way, a leaf, a cloud !
I fall upon the thorns of life ! I bleed !

Ode to the west wind : Alonais 1821)

'অনন্যোপায়'-এ সুকান্ত শব্দমুখর অনভূতির তাপে

খ. নির্বিঘ্ন সৃষ্টিকে চাও ? তবে ভাঙো বিঘ্নের বেদীকে
উদ্দাম ভাঙার অস্ত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাও চারিদিকে ।

মানবতাবাদী কবি শেলীর পুণর্জাগরণের তাগিদ আসে মানস-পীড়ন থেকে। বিদ্রোহী কবির কণ্ঠে তাই সন্ধান মেলে শুভদিনের শঙ্খ ধ্বনির :

b) Scatter, as from an unextinguished hearth
Ashes and sparks, my words among mankind !
Be through my lips to unawakened earth.
The trumpet of a prophecy ! O wind
If winter Comes, can spring be far behind ?

(Do : Do)

উনিশ শতকে ইংলণ্ডের মাটিতে লর্ডদের প্রতাপ শ্রমজীবীদের ত্রাস। এইসব নির্দয় প্রভুদের শোষণ পীড়ণের ইতিহাস কবির মনের গভীরে। তিনি জানেন ভীতি যন্ত্রণার শিকার এই হত দরিদ্রের দল। অলস-ধনীদের মন রক্ষা করতে গিয়ে অগণিত শ্রমজীবীকে জান দিতে হয়েছে। তৎকালীন সামাজিক পৃষ্ঠপট শেলীর কবিতায় যথাযথভাবে রূপাঙ্কিত :

c) Those ungrateful drones who would
Drain your sweat-nay, drink your blood !
(Song to the men of England : Shelly's Poetical works
(1839 1st Ed/written in 1 19)

চিরন্তন সত্যের মুকুরে মানবদরদী কবিমনের প্রকাশ। গীতি কবি হয়েও উপেক্ষিত সাধারণ মানুষের উৎপীড়নের পরিণাম সম্পর্কে নিজেকে তিনি বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেননি সমাজের এই অনিয়মকে প্রশয় দেওয়া উচিত হবে না বলেই লণ্ডনবাসীর উদ্দেশ্যে তার মনোবেদনার কথা ধরে রেখেছে নিম্নলিখিত কবিতাংশ :

d) Men of England, wherefore plough
For the Lord who lay ye low ?
Wherefore weave with toil and care,
The rich robes your tyrant swear ?
(Do ; Do)

ধনী-নির্ধন, প্রভু-দাস, এই বিভেদ বিশশতকেও অপরিবর্তিত। এই বৈষম্য মন-গড়া কিছু নয়, ধনের বৈষম্য থেকে মানসিক সংস্কারে এর পরিণাম। নিষ্প্রাণ মানুষগুলো সামান্য চেয়েও প্রতারিত, লাঞ্ছিত। 'শেলীর'-র বিষয়মুখীনতা তাঁর স্পর্শকাতর মনকে দোলা দেয়। দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বয়ে আনে মানবতাবোধের পরিচ্ছন্ন আদর্শ।

বাস্তবতা সত্ত্বেও মহানুভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ডব্লু, এইচ, ডেভিস-র শ্রেণীচেতনা থেকে সৃষ্ট সময়োচিত একটি কবিতায় :

'I hear leaves drinking rain, /I hear rich leaves on top
Giving the poor beneath /Drop after Drop'
(The Rain : Collected poem's No 32 (1916)

সৌন্দর্য পিপাসু কবির তৃষিত বুকে বস্তু জগতের কলরব। মানুষে মানুষে ব্যবধান বিশ শতকের মানুষকেও ভাবায়, কাঁদায় এবং বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্দীপ্ত করে। অর্থনৈতিক বৈষম্যে অনেক সংসার ভেঙে গেছে, ভাঙছে, ভাঙবে। সর্বদেশেই সভ্যতার চরম বিপর্যয় লক্ষ্য করে গণজীবনের বিদীর্ণ হাহাকারকে কবিরা ধরে রেখেছেন তাঁদের কালি-কলমে। সুকান্তের ঐ একই ব্যথা অসংকোচে বিদেশী কবির হৃদয়-তন্ত্রে ঝংকার তুলেছে।

কবির জাত নেই, দেশ নেই, কাল নেই, তাঁরা নিরুপায় মানুষের স্বাধিকার

রক্ষার্থে একই ভাবনায় ধ্বংসোন্মুখ স্বদেশে জেগে ওঠেন বাঁচার সংগ্রামে।

সুকান্ত মনে করেন আত্মসমালোচনার দিন উপস্থিত। দেশে দেশে সাধারণ মানুষের দুর্গতি বাড়ছে। এর জন্য সকলেই কম বেশী দায়ী। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

'ওরে ভাই কার নিন্দা কর। মাথা করো নত
এ আমার এ তোমার পাপ।

(৩৭ সংখ্যক কবিতা: বলাকা)

এ পাপের ফল ভয়ংকর। তাই যারা এই পাপ করেছে আর যারা তার সুযোগ করে দিয়েছে বিচারে উভয়েই সমান দোষী। এরা সমাজের ধূর্ত মানুষ। সুবিধার আশায় ওত্ পেতে থাকে এবং সামান্যতম আত্মসুখের লোভে চিরকাল নিজেদের ভীরু মনের পরিচয় দেয়। এদের সংঘবদ্ধ শক্তি যে আগ্নেয়—গোলার চেয়েও ভয়ংকর, এই বোধ এদের নেই। থাকতে পারেও না, কেননা অশিক্ষার অন্ধকারে এরা দুরাশা হাতড়িয়ে চলে। মানসিক দিক থেকে এরা রুগ্ন। এদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঝুনো রাজনীতিবেত্তারা মুনাফা লুটে ক্ষমতার চূড়ায় বসে। ব্যষ্টির এই স্ফীত আত্মা প্রসাদ হৃতসর্বস্ব সমষ্টির চিত্ত-দীর্ণ-হাহাকারের কারণ। এই অপচয় থেকে সাবধানতা অবলম্বনের সতর্কবানী সুকান্তের কণ্ঠে বারংবার রণিত। 'প্রস্তুত' কবিতায়:

বারুদ। অস্ত্র ধরেছি এখন সম্মুখে শত্রু চাই,
মহামরণে নিষ্ঠুর ব্রত নিয়েছি তাই;
পৃথিবী জটিল, জটিল মনের সম্ভাষণ
তাদের প্রভাবে রাখিনি মনেতে কোনো আসন,
ভুল হবে জানি তাদের আজকে মনে করাই॥ /(প্রস্তুত: ছাড়পত্র)

খাদ্যশস্য 'আঁকড়ে-ধরা-জনতা'-র মৃত্যুঞ্জয়ী গান শুনে নির্ভীক কবি কাস্তে চান। একদিন নবান্ন উজাড় করে সেবার বিনিময়ে নির্ভাবনার হাসি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজ এই দুর্দিনে কবি মানুষের প্রাণ, মান-সম্মান রক্ষার প্রতিজ্ঞায় কাস্তে হাতে সেই 'দেশ প্রেমের' প্রগাঢ় চিহ্ন রাখতে আকাঙ্ক্ষী।

তিপ্পান্ন। নিয়ত আমার কানে গুঞ্জরিত ক্ষুধার যন্ত্রণা,
উদ্বেলিত হাওয়া আনে মাঠের সে উচ্ছ্বসিত ডাক,
সুস্পষ্ট আমার কাছে জীবনের সুতীব্র সংকেত:
তাই আজ একবার কাস্তে দাও আমার এ হাতে॥
(ফসলের ডাক, ১৩৫১: ছাড়পত্র)

এই কাস্তে দিয়ে 'দুর্ভিক্ষের অন্তিম কবর'- রচনা করবেন কবি। 'কৃষকের গান' কবিতায় মানুষের ইতিহাসে, সভ্যতা সংস্কৃতির বিবর্তনে চোখ রেখে সুকান্ত মানব-জীবনের যথার্থ শ্রেয়: সমুদ্ধার করতে ব্রতী। তারই শুভবার্ত্তা :

চুয়ান্ন. আমার প্রতিজ্ঞা গড়ে তোলে
ক্ষুধিত সহস্র হাতখানি। /দুয়ারে শত্রুর হানা
মুষ্টিতে আমার দু:সাহস। / কর্ষিত মাটির পথে পথে
নতুন সভ্যতা গড়ে পথ ॥
(কৃষকের গান : ছাড়পত্র)

এই ফসল মেহনতী—জনতার মুখের গ্রাস। নবান্নে-র দিনে 'প্রতারিতদের হবে না নিমন্ত্রণ'? এমন নির্মমবাক্য ক্ষয়ে ক্ষয়েই শাণিত হয়। কবির এই উচ্চারণ প্রতিশোধের ভাষায় ধারালো। কবি তাই — 'আঠারো বছর বয়স'— এর উদ্ধত পদচিহ্ন এই অনিয়মের বুকে আঁকতে চান। 'আঠারো মন্বন্তোয়ানের প্রতীক। এদের সর্বাগ্রগণ্য ভূমিকা যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের পরিবর্ত্তন সাধণ করে। প্রতিশ্রুতি এবং প্রতিজ্ঞার ক্ষেত্রে এরা আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। তরুণের সজীবতা প্রবীণের অগ্রপশ্চাৎ ভাবনার মাঝে কুসংস্কার এবং সংকীর্ণতা কাটিয়ে উঠবার শক্তি সঞ্চার করুক স্বদেশ প্রেমিক কবির সেকারণেই প্রতীকের আবিস্কার। দেশও
জাতির জীবনে এই বয়সের অদম্য প্রাণবেগ বিপদ জয়ের নির্দিষ্ট লক্ষণে সজাগ। কবি সেই প্রত্যয়েই উপসংহারে তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করেছেন :

পঞ্চান্ন. এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোন সংশয় —
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে ॥
(আঠারোবছর বয়স : ছাড়পত্র)

স্নিগ্ধতায় রঙিন-করা কবিতা চাননি সুকান্ত। পদের লালিত্য শব্দের শ্রুতিসুখ মুছে দিয়ে গদ্যের কাঠিন্যকে কাজে লাগিয়েছেন তিনি। পেটে ক্ষুধা নিয়ে পূর্ণিমা চাঁদের মিথ্যাছলনায় ভুলবার কবি সুকান্ত নন। মার্কসীয় দর্শনের শ্রেনী-সংগ্রাম-তত্ত্বে শ্রদ্ধাবান কবির জীবন-বোধের অপূর্ব স্বাক্ষর —

ছাপ্পান্ন. প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা —
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় ;/পূর্নিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি ॥

(হে মহাজীবন : ছাড়পত্র)

সুকান্তের চোখে ঘুম নেই। সত্যের খাঁটি মূল্য দিতে কবি বলেন : 'হে স্বদেশ, ফের সেই কথা জানালাম।' কবির অমরত্বে বিশ্বাস নেই কিন্তু সত্যের প্রতি আছে অসীম শ্রদ্ধা :

সাতান্ন॰ ক/১॰ দৃঢ় সত্যের দিতে হবে খাঁটি দাম,
হে স্বদেশ, ফের সেই কথা জানালাম।
২॰ কুয়াশা কাটছে, কাটবে আজ কি কাল
ধুয়ে ধুয়ে যাবে কুৎসার জঞ্জাল,/ততদিন প্রাণ দেব শত্রুর হাতে,
মুক্তির ফুল ফুটবে সে সংঘাতে/ইতিহাস ! নেই অমরত্বের লোভ
আজ রেখে যাই আজকের বিক্ষোভ। (বিক্ষোভ : ঘুম নেই)

এই বিক্ষোভ থেকেই 'জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী'— কবিতায় অত্যাচারীর উদ্দেশ্যে বেদনার অগ্নুৎদ্গীরণ। সাহসী ভাবনা মানুষের মতো বাঁচার আনন্দে ব্যগ্র :

আটান্ন॰ ক/১ প্রতিশোধ,'প্রতিশোধ !/হাজার হাজার শহীদ ও বীর
স্বপ্নে নিবিড় স্মরণে গভীর/ভুলিনি তাদের আত্ম বিসর্জন।
২॰ হে খাতক নির্ব্বোধ/রক্ত দিয়ে সব ঋণ করো শোধ।
(জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী : ঘুম নেই)

'আমরা এসেছি'— কবিতায় :

উনষাট॰ ক/১॰ ফিরে তাকানোর নেই ভীরু মোহ, কী গতিশীল !
সবাই এসেছে, তুমি আসোনিকো, ডাকে মিছিল ॥
২॰ সামনে মৃত্যু কবলিত দ্বার/থাক অরণ্য, থাক না পাহাড়,
ব্যর্থ নোঙর, নদী হব পার, খুঁটি শিথিল।
আমরা এসেছি মিছিলে, গর্জে ওঠে মিছিল ॥
(আমরা এসেছি : ঘুম নেই)

নির্যাতনের ঘায়ে ঘায়ে গণজীবন গর্জমান। তাদের শান্তির জন্য সুকান্তের মতো সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় শোনা যায় :

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আমি আনছি/দুরন্ত দুর্নিবার শান্তি।
(আমি আসছি : ফুল ফুটুক)

'প্রিয়তমাসু' কবিতায় রোমান্টিকতা, ইমেশন্ সত্ত্বেও বড়ো হয়ে আছে কবির যন্ত্রণা-দীর্ণ বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতা। 'যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে আর এক যুদ্ধ ক্ষেত্রে' ছুটতে ছুটতে প্রিয়তমাকে

জানাতে ভুল হয় না একই কথা, 'প্রশ্ন করো যদি এত যুদ্ধ করে পেলাম কী ? 'উত্তর তার'—

যাট০ তিউনিসিয়ায় পেয়েছি জয়, ইতালীতে জনগণের বন্ধুত্ব
ফ্রান্সে পেয়েছি মুক্তির মন্ত্র।
আর নিষ্কণ্টক বার্মায় পেলাম ঘরে ফেরার তাগাদা।
(প্রিয়তমাসু : ঘুম নেই)

'Death is at any time blessed, but it is twice blessed for a warrior who dies for his cause, that is truth..... .....'

(Mahatma, Vol-II. Page 237. New Edition March 1961 The Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting. Govt. of India.

জয়, বন্ধুত্ব এবং মুক্তির মন্ত্র নিয়ে ঘরে ফেরার মাহেন্দ্র ক্ষণে গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথের সন্ধান সুকান্ত পান। গান্ধীজীও মনে করতেন জনসাধারণের মধ্যে দেশের প্রকৃত শক্তি নিহিত আছে। সংগ্রামী কবি মহাত্মাজীর মধ্যে গণদেবতার জাগ্রত সত্তা লক্ষ্য করেছিলেন :

একষট্টি. ক/১. এখানে আমরা লড়েছি, মরেছি, করেছি অঙ্গীকার
এ মৃতদেহের বাধা ঠেলে হব অজেয় রাজ্যে পার।
২. তাইতো এখানে আজ ঘনিষ্ঠ স্বপ্নের কাছাকাছি,
মনে হয় শুধু তোমারই মধ্যে আমরা যে বেঁচে আছি—
তোমাকে পেয়েছি অনেক মৃত্যু-উত্তরণের শেষে,
তোমাকে গড়ব প্রাচীর, ধ্বংস-বিকীর্ণ এই দেশে।
(মহাত্মাজীর প্রতি : ঘুম নেই)

সুকান্তের সান্ত্বনা :

বাষট্টি. সাবাস, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী /অবাক তাকিয়ে রয় ;
জলে-পুড়ে-মরে ছারখার /তবু মাথা নোয়াবার নয়।
(দুর্মর : পূর্বাভাস)

'দুর্মর' কবিতায় সুকান্তের কাব্য সাধনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে হতাশা, ব্যর্থতা, অতিক্রম করার সংকল্প। 'জাগবার দিন আজ' কবিতার সতেজ বাক্যে কবির নির্দেশ :

তেষট্টি. আজকে শপথ করো সকলে
বাঁচাব আমার দেশ, যাবে না তা শত্রুর দখলে ;

তাই আজ ফেলে দিয়ে তুলি আর লেখনি,
একতাবদ্ধ হও এখনি ॥

(জাগবার দিন আজ : পূর্বাভাস)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় :

আমি যেন আমার কলমটা /ট্র্যাক্টরের পাশে
নামিয়ে রেখে বলতে পারি— /এই আমার ছুটি
ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও।

(আমার কাজ : কাল মধুমাস)

তুলনীয় 'সমর সেনের' কবিতা :

তবু জানি, কালের গলির গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী
যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে, /তবু জানি,
জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
আকাশ গঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে।

(ঘরে বাইরে : সমর সেনের কবিতা /১৯৩৭-৪০)

বিষ্ণু দে-ও ভেবেছেন সংঘবদ্ধতার কথা। এই মিলনের মধ্যে সর্বাত্মক সমৃদ্ধি সম্ভব। সেখানেই নির্মল আনন্দ, আর সে আনন্দই বাঁচার :

আসুক জীবনে রঙে মানবিক আমি চাই আমরা সবাই
সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ইন্দ্রধনু ভেঙ্গে দিই জীবনে ছড়াই
হে সুন্দর বাঁচার বিস্ময়ে বিষাদে সম্ভ্রমে জীবনে আকাশ
অবকাশ বাঁচার আনন্দ চাই।

(অদ্বিষ্ট : অদ্বিষ্ট)

সমাজতন্ত্রে আস্থাশীল সুকান্ত বুর্জোয়াপনা থেকে দূরে থাকতে চান। তাঁর প্রবাদপ্রতিম প্রতিশ্রুতিবাক্য জীবনাশ্রয়ী প্রতীকরূপে কবিত্বের যাথার্থ্যে শিল্পিত। সমাজবিচ্ছিন্ন নন বলেই নির্দ্বিতায় বঞ্চিত মানুষের ইতিহাসকে কাব্যে মুখ্য করে তুলেছেন। ফলে আত্মসচেতনতার মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবনাভিজ্ঞতার উপহার দিয়েছেন 'আমার মৃত্যুর পর' কবিতায় :

চৌষট্টি. আমার মৃত্যুর পর, জীবনের যত অনাদর
লাঞ্ছনার বেদনায়, স্পষ্ট হবে প্রত্যেক অন্তর ॥

(আমার মৃত্যুর পর : পূর্বাভাস)

আত্ম-প্রসাদ-বিমুখ কবির এই মনোভাব কাব্যের ধ্বনি ও অর্থের সহিতত্বকে

যেমন অসামান্য দায়-দায়িত্বের মূল্যে মণ্ডিত করেছে, তেমনই হৃদয়াবেগের মূল কথাও সহজেই উন্মোচিত। চিন্তার ভাষায় তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়টি আন্তরিক। এখন বলা যাবে, সাম্যকামী মানুষের পাশে সংগ্রামী কবির মানসিকতা শিল্প সৃষ্টির অভিমুখে যাত্রা করতে অপারগ নয়। তৈরী-করা নির্যাতনের ইতিহাস-পথ পেরিয়ে জীবনের শৌর্য ও সৌন্দর্য গণমানুষের মুক্তি তীর্থ চিনিয়ে দিয়েছে সুকান্তের কবিতায়।

কবিতার শব্দ-গাঁথুনি :

গণজীবনের প্রয়োজনে রাজনীতি করতে করতেই কবিতা সৃজন করেছিলেন সুকান্ত। তাঁর কবিতার শব্দরাজি 'অদৃশ্য কথার সমুদ্র' থেকে 'উঠে আসে'। শব্দানুষঙ্গ চিত্রকল্প সৃষ্টিতে বাধা পায়নি। কবিতার আবেদন জাগানে যোগ্য শব্দের প্রয়োগে সুকান্ত ছিলেন শক্তিধর কবি।

রঙ/ঋতু/ইংরেজি-বাংলামাস/ভৌগোলিক-পরিচয়বাহী স্থান/কাল/শ্রেণী/ব্যক্তি-বোধক শব্দের সঙ্গে বিদেশী শব্দ দিয়ে যে রূপলোক নির্মিত, সেখানে সুকান্তের কবিমন শুচিবায়ু গ্রস্ত নয়।

ক. রঙ বোধক শব্দ :

রঙের বৈচিত্র্য বিভিন্ন মেজাজের অবস্থার অর্থ নির্ণয় করে। কবি তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে সেইভাবে, প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখেই, কবিতাংশ গেঁথেছেন।

১/ কালো মৃত্যুরা ডেকেছে আজকে স্বয়ম্বরায়,
নানাদিকে নানা হাতছানি দেখি বিপুল ধরায়।
(প্রস্তুত : ছাড়পত্র)

২/ ভারতবর্ষের 'পরে গলিত সূর্য ঝরে আজ
দিগ্বিদিকে উঠেছে আগুয়াজ/রক্তে আনো লাল,
রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।
(বিবৃতি : ঐ)

৩/ গলে গলে পড়ছে বরফ—/ঝরে ঝরে পড়ছে জীবনের স্পন্দন :
শ্যামল আর সমতল মাটির/স্পর্শ লেগেছে ওর মুখে
(কাশ্মীর : ঐ)

সুকান্ত 'কালো'-রঙের মধ্য দিয়ে নিসঙ্গতার মতো নিশ্চল দুর্ভাবনাকে প্রকট করেছেন। 'লাল' তাঁর দৃষ্টিতে সূর্যের মতো ভয়ংকর তেজদীপ্ত অথচ দুর্দিনে আশার প্রতীক। আর 'শ্যামল' রঙে রয়েছে জীবনের সন্ধান এবং তার পূর্বভাস। এ সকলই তার প্রার্থীত ঈপ্সার দ্যোতক। 'লাল' রঙের গুরুত্বই সুকান্তের কাব্যে বেশি। তিনি

কমিউনিস্ট। জনস্বার্থে রাত্রির বুক চিঁড়ে উঁকিদিতে আগ্রহী হওয়াই শেষ কথা নয়, শপথকে বন্ধুর পথ ধরেই সংগ্রামের হাতিয়ারে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সজাগ জীবন শিল্পী বলেই সাম্রাজ্যবাদীর বিপক্ষে গণঅভ্যুত্থানের জন্য কবিতায় ভাবাদর্শের সেই প্রতিফলন। সর্বহারার পাশে সাম্যবাদীর চরম প্রতিজ্ঞার কথা 'লাল' রঙে বিধৃত।

খ. ঋতুবোধের শব্দ : ঋতুর বিচিত্র খেলা কবিতার বিশিষ্ট প্রাধান্য রেখেই কবি ভাবনাকে পরিস্থিতি অনুযায়ী যথার্থতা দান করেছে।

গ. ইংরেজি-বাংলা মাস : কবিতায় ব্যবহৃত মাসগুলি কবি খেয়ালের সামগ্রী নয়। প্রযুক্ত প্রতিটি মাস শীর্ষক কবিতাই ঐতিহাসিক গুরুত্ব বজায় রেখে কবির অভিজ্ঞতার ভূমিকাকে সত্য করে তুলেছে।

১/ কলিকাতায় শান্তি নেই। / রক্তের কলঙ্ক ডাকে মধ্যরাত্রে
প্রতিটি সন্ধ্যায়। /(সেপ্টেম্বর' ৪৬ : ছাড়পত্র)

২/ লাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে,
কী হবে আর কুকুরের মতো বেঁচে থাকায় ?
(১লা মে-র ৪৬ : ঘুম নেই)

৩/ এবারে নতুন রূপে দেখা দিক রবীন্দ্র ঠাকুর
বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণ-সংগীতের সুর ;
জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে
চলুক নিন্দাকে ঠেলে, গ্লানি মুছে আঘাতে আঘাতে।
(পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে : ঐ)

'সেপ্টেম্বর' ৪৬ অবিভক্ত বাংলার বুকে আচরিত ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা স্মরণ করায়। ১৮৯০ ১লা মে' সারাবিশ্বের মুনাফালোভী ধনিক শ্রেনীর বিরুদ্ধে, শোষিত শ্রমজীবী মানুষের সুদৃঢ় ঐক্যে অর্জিত জয়ের কথা বিঘোষিত। 'পঁচিশে বৈশাখ' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম দিন। এই মানব-প্রেমিক কবি সাহিত্য ও সমাজ সংস্কারক এবং নবজীবনের বার্ত্তা এনে সত্য ও সুন্দরের দীক্ষা দেন। এই মাসগুলির ঐতিহ্য কবিপ্রাণের প্রেরণা।

ঘ. ভৌগোলিক পরিচয়বাহী স্থান :

কবিতায় স্থানো ল্লেখ বাস্তবধর্মী আধুনিকতার লক্ষণ। স্থানগুলি তাদের নিজস্ব কীর্তিতে সমৃদ্ধ, জাতিরে জীবনে অনুপ্রেরণার কারণ। নিষ্ঠা আর দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় কবি পরাধীন দেশবাসীর সামনে বিপ্লবী আন্দোলনের সমর্থণ পেতে কবিতায়,

প্রয়োগ করেছিলেন। অনেক সময়েই সুকান্তের কবিতায় বিপ্লবের স্মৃতি-প্রতীকরূপে ব্যবহৃত

১/ জ্বলে ওঠে কি স্তালিনগ্রাদের প্রতিরোধে, মহাত্মাজীর মুক্তিতে,
প্যারিসের অভ্যুত্থানে ? / (খবর : ছাড়পত্র)

২/ ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া / রুশ ও চীনের কাছে
আমার ঠিকানা বহুকাল ধরে / জেনো গচ্ছিত আছে।
(ঠিকানা : ছাড়পত্র)

ভৌগোলিক স্থানগুলি ইতিহাসের আদর্শে কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

ঙ. কালবোধক শব্দ : কাল কোন ঘটনাকে অস্বীকার করে না। কবিতায় তার একটা নিজস্ব তাৎপর্য আছে। কর্ম প্রতিনিয়ত ঐতিহ্য সৃষ্টি করে চলেছে, আর কাল তার মুহূর্ত—গুচ্ছে সব জমা করছে। কাল—সচেতন কবি তাকে উপেক্ষা করতে পারেন না।

১/ দিগ্বিজয়ী দুঃশাসন ! / বহু দীর্ঘ দীর্ঘতর দিন
তুমি আছ দৃঢ় সিংহাসনে সমাসীন, / হাতে হিসেবের খাতা
উন্মুখর এ পৃথিবী : / আজ তার শোধ করো ঋণ।
(দিনবদলের পালা : ঘুম নেই)

২/ পথিক-বিরল রাজপথে সূর্যের / প্রতিনিধি হাঁকে আসন্ন কলরব,
মধ্যাহ্নের কঠোর ধ্যানের শেষে / জানি আছে এক নির্ভয় উৎসব।
(বোদ্রের গান : ঘুম নেই)

৩/ সন্ধ্যার আর শতলে পীড়িত নিঃশ্বাসে
বিশীর্ণ পাণ্ডুর চাঁদ ম্লান হয়ে আসে।
(পূর্বাভাস : পূর্বাভাস)

চ. শ্রেনী বোধক শব্দ : অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক সমাজনৈতিক কারণে 'শ্রেনী' একটা বিশেষ চিন্তায় চিহ্নিত। শ্রেনীমুক্ত সমাজ গঠন যার সংকল্প, আগামী দিনের মুখ চেয়ে চলতি দিনের ছবি আঁকতে তার রচনায় শ্রেনীর সর্বনাশা রূপ ফুটে ওঠে।

হাজার বছর ধরে দাসত্ব বেঁধেছে বাসা রোমের দেউলে
দিয়েছে অনেক রক্ত রোমের শ্রমিক —
তাদের শক্তির হাওয়া মুক্তির দুয়ার দিল খুলে,
আজকে রক্তাক্ত পথ ; উদ্ভাসিত দিক।
শিল্পী আর মজুরের বহু পরিশ্রম

একদিন গড়েছিল রোম
তারা আজ একে একে ভেঙে দেয় রোমের সে সৌন্দর্য লতার
ভগ্ন স্তূপে ভবিষ্যৎ মুক্তির প্রচার।

(রোম : ১৯৪০ : ঘুম নেই)

এই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেনী দুর্বল বলে উপেক্ষিত ন'য় সকল সৃষ্টির মূলে এদের অসামান্য শ্রমের কথা ইতিহাস মেনে নিয়েছে। কবিও অনুপ্রাণিত। ছ* ব্যক্তি বোধক শব্দ : কাছের দূরের ইতিহাস থেকে, পুরাণ থেকে পাঁওয়া এ সব মানুষ সামাজিক নিন্দা-প্রশংসার এক একটি ব্যক্তি প্রতিমা। প্রগতিবাদী কবি প্রতিক্রিয়াশীলদের থেকে সতর্ক থাকার জন্যই তাঁরা কবিতায় এ সব ব্যক্তির সংকেত দিয়েছেন।

১/ লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ।

(লেনিন : ছাড়পত্র)

২/ এখানে রক্তের দাগ রেখে গেছে চেঙ্গিস, তৈমুর,
সে চিহ্নও মুছে দিল কত উচ্চৈঃশ্রবাদের খুর।

(মণিপুর : ঘুম নেই)

৩/ চল্লিশ কোটি জনতার জানি আমিও যে একজন,
হঠাৎ ঘোষণা শুনেছি : আমার জীবনে শুভক্ষণ
এসেছে ; তখনি মুছে গেছে ভীরু চিন্তার গিজিবিজি।
রক্তে বেজেছে উৎসব, আজ হাত ধরো গান্ধীজী।

(মহাত্মাজীর প্রতি : ঘুম নেই)

৪/ অহল্যা, আজ কাঁপে কী পাষাণকায়!
রোমাঞ্চ লাগে পাথরের প্রত্যঙ্গে ;
রামের পাদস্পর্শে কি লাগে গায়?
অহল্যা, জেনো আমরা তোমার সঙ্গে।

(সূচনা : ঘুম নেই)

'লেনিন' রাশিয়ার গণমুক্তিত্রাতা। সমরকন্দের অধিপতি 'তৈমুর'। ভারতবর্ষ আক্রমণ করে হত্যা লুণ্ঠন-ই করেন, স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা তাঁর ছিল না। অনুরূপ মোঙ্গল বীর দিগ্বিজয়ী চিঙ্গিজ খাঁ। 'গান্ধীজী' অহিংসা পরমধর্ম বিশ্বাসী ; বঞ্চিত মানুষের পাশে থেকে সঠিক আলোর পথের সন্ধান দেন।

পুরাণ বর্ণিত 'অহল্যা' বৃদ্ধাশ্বের কন্যা এবং গৌতম মুনির স্ত্রী। অতুল রূপ গুণযুক্তা অহল্যার পবিত্রতা হননকারী ইন্দ্রের ছলনায় দুষ্কার্যে লিপ্ত হওয়ায় অভিশাপে পাষাণ হন এবং গুরুপত্নী হরণ পাপে ইন্দ্রও সহস্রাক্ষ হন। শ্রীরামচন্দ্রের পদস্পর্শে মুনির ইচ্ছানুক্রমে অবশেষে অহল্যার শাপমোচন হয়।

জ. বিদেশী শব্দ ভাণ্ডার : উচ্চ শিক্ষার সুযোগ-বঞ্চিত কবির শব্দ ভাণ্ডার তবু শূন্য ছিল না। অনুশীলন এবং পাঠোভ্যাসে তাঁর জ্ঞানের কুটির পরিপূর্ণ। আর এরকম অসংখ্য বিদেশী শব্দ ব্যবহারে তাঁর কবিতার বক্তব্য স্বকালের পাঠক মনে সহজ ধারণার খোলা পথটা পেয়ে গেছিল।

১। যেখানে মুক্তির যুদ্ধ সেখানেই কমরেড লেনিন।

(লেনিন : ছাড়পত্র)

২। একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেল
বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে,
ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায়—
আরো দু'তিনটি মুরগীর সঙ্গে।

(একটি মোরগের কাহিনী : ছাড়পত্র)

৩। হঠাৎ ধুলো উড়িয়ে ছুটে-গেল
যুদ্ধ ফেরত এক কনভয় : /ক্ষেপে-ওঠা পঙ্গপালের মতো
রাজপথ সচকিত করে।
আগে আগে কামান উঁচিয়ে,
পেছনে নিয়ে খাদ্য আর রসদের ভাণ্ডার।

(কনভয় : ছাড়পত্র)

সুকান্তের কবিতার শব্দ-সজ্জা জটিলতা মুক্ত, অকৃত্রিম এবং দীপ্তিধর্মী (intellectual) তার বিশ্বাসী কবিমন কবিতায় অজস্র 'অব্যয়' ব্যবহার করে আমাদের বোধ-বুদ্ধির দরজায় সজোরে কড়া নেড়েছে।

১। ছাড়পত্র : তবু/তাই/কিন্তু/তো/যদিও/যত/অথবা/প্রতি/হে/কত

২। ঘুম নেই : যখন/তখন/আর/মতো/শুধু/কী/ও/কেমন/এবং/এ

৩। পূর্বাভাস : কোনো/সুতরাং/অথচ/তাইতো/অতএব/আহা/মতন/কে/হায়/আরো/এখন/তাও

সুকান্তের কবিতার জগতে দৃষ্টিভঙ্গির একটি অনন্যমন পরিচ্ছন্নতা চোখে পড়ে। কাব্য শরীরে প্রগতিচেতনার সারবান সুষমা তাঁর আধুনিক মনের লক্ষনীয় অবদান।